প্রথম প্রকাশ : ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৭

প্রকাশক : শ্রীস্বপন কুমার সেন
'মাতৃসংঘ'
ভাটরাপল্লী, বারাসাত (২৪ পরগণা)

মুদ্রণে : শ্রীচৈতন্য আশ্রম প্রেস
ছোট-ট্যাংরা, খড়্গপুর
মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান :
প্রতিভা মন্দির
৩০/১ বি, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

আমাদের কথা

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—না এ কোন তত্ত্বকথা নয়, আত্মচেতন মনের গভীর উপলব্ধি। অলৌকিক স্বর্গের পৌরাণিক কল্পনা নয়, কিন্তু মহীয়সী জন্মভূমিতে সার্বজনিক স্বর্গরচনার ঐকান্তিক প্রয়াস, আর এই মানস উপলব্ধি শক্তি এনে দিল জনে জনে মাতৃবন্দনার অভিনব তন্ত্রে,—সংহত হল নির্যাসিত বস্তুসার নবযুগ-ঋষির আনব মন্ত্রে—'বন্দেমাতরম্'।

উদ্বুদ্ধ হৃদয়ে অভূতপূর্ব আলোড়ন। ভারতে যুবরক্তে মাতৃপূজার মহালগ্ন সমাসন্ন। কিন্তু চাই বীরের রক্ত—মাতৃপূজায় কাপুরুষ স্বার্থগন্ধীদের কোন অধিকার নেই। মাতৃরক্তপিপাসু অসুরনাশনের জন্য তথাকথিত পূজা, পূজা ভড়ং নয়, আপনবক্ষের তপ্ত শোণিতে দেশমাতৃকার মুক্তিবোধন। কিন্তু কোথায় তারা—মাতৃমন্ত্রের অমর সাধক ক্ষাত্রবীর্যের ভাস্বর প্রতীক—সর্বত্যাগী বীরসন্তান? কে জানে রজনীর গোপন গর্ভে সেদিন আগামী প্রভাতে উদীয়মান এক সূর্যের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তপ্রায়! তপঃপূত প্রভাতের নবসূর্যোদয়ের দিকে দিকে কত শত রক্ত শতদল হল বিকশিত।

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্য সেন—তাঁর সূর্য্যমুখী আকর্ষণে দেশপ্রেমিক যুবকদের বুকে ত্যাগ ও সেবার পদ্ম ফুটল অজস্র। হৃদয়বত্তা, পথনির্দেশ ও প্রাণপণ অধ্যবসায়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বেচ্ছাসৈনিক তিনিই ছিলেন Friend. philosopher and guide. স্বাধীনতার সূর্য্যসাধনার ইতিহাসে শুরু হল বিপ্লবী পথপরিক্রমা। বিপ্লবের মহাতীর্থ অতন্দ্রিত চট্টগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম আর চট্টগ্রাম—অবিচ্ছেদ্য এবং এই ভাবের বিধায়ক মহামতি মাষ্টারদা। স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে সাগরোপম গাম্ভীর্য, বজ্রদৃঢ় হৃদয়ে সর্বংসহ ধৈর্য, দুইচোখে সবুজ স্বপ্ন, মুখমণ্ডলে চিরজাগরূক আত্মপ্রত্যয়,—"মাষ্টারদা" কালজয়ী মহানাম।

মহাবিপ্লবী মাষ্টারদার জীবনচরিত অনুধ্যান আজকের যুগে অত্যাবশ্যক ভেষজস্বরূপ। দিকে দিকে যখন চরম ক্লীবতা, স্বার্থপরতা, শুদ্ধরক্ত শহীদদের রক্তে লেখা স্বাধীনতার সত্য ইতিহাস যেখানে ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের ক্লেদাক্ত হস্তে সত্যপ্রকাশের পূর্বেই সমাহিত হয়, একনিষ্ঠ দেশসেবাব্রতীরা যেখানে ব্রাত্যপংক্তিভুক্ত এবং যে কোন মুহূর্তে স্বাধীন গণতান্ত্রিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, সেখানে এই উজ্জ্বল অতীতের আদর্শে বর্তমানের মুখচ্ছবিটাকে প্রত্যক্ষ করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার অধিকারী। সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করে সকল সংশয়কে ছিন্ন করে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষায় চট্টগ্রাম বিপ্লবের পটভূমি, প্রস্তুতি এবং মহাযাজ্ঞিক মাষ্টারদার বৈপ্লবিক ভূমিকার সুনিপুণ ও সাবলীল উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। জন্মসূত্রে চট্টগ্রাম বিপ্লববাদে অনুরক্ত আমাদের এই অর্ঘ্য-দীপের উত্তাপ গ্রহণে সহৃদয় সুধী পাঠকবর্গ যদি অধিকতর আগ্রহী হন, তবেই গ্রন্থপ্রণয়ণের প্রতুল সার্থকতা।

এই গ্রন্থখানি রচনায় প্রথম প্রেরণালাভ করি শ্রীমনোরঞ্জন সেন ও শ্রীযুক্তা বাসন্তী সেনের কাছ থেকে। তাঁরা শুধু উৎসাহদানই করেননি, এই গ্রন্থরচনায় আমাদের অক্ষমতা ও কাজের জটিলতাকে সহজতর করে দিয়েছেন নানাভাবে। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শরণাপন্ন হ'লাম গণেশদার। চট্টগ্রাম বিপ্লবের সেই ঐতিহাসিক চরিত্র। অতি ব্যস্ত মানুষ। তবুও তাঁর অতি মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটিয়ে আমাদের অনুরোধ রাখলেন, অক্ষরে অক্ষরে পড়লেন সমস্ত পাণ্ডুলিপি, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে গ্রন্থের সমৃদ্ধি-সাধন করে দিলেন। অতি স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আমাদের গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার দুঃসাহস আমাদের নেই—তাঁর প্রতি শুধু অসীম কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়ে রাখলাম।

সর্বশ্রী শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, গণপতি জানা, তরুণ কান্তি দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্র নাথ দেব, অসীম কুমার ভৌমিক, বিষ্ণু দে এবং শ্রীযুক্তা শঙ্করী

হাজরা, শ্রীমতী অলকা সেন ও শ্রীমতী সুজাতা হালদার—যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সহানুভূতির কথা শুধু কয়েক কলমে শেষ করা যায় না তাঁদের কোন্ ভাষায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাব জানিনা। তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী রইলাম।

সর্বশ্রী প্রদীপ সেন, অরূপ কুমার সাহা, অমিতাভ বোস, ভবতোষ ব্রহ্ম, দেবশঙ্কর দত্ত (পশুপতি দত্ত এণ্ড সন্স)-কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের মধ্যেও শ্রীচৈতন্য আশ্রম প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসাগর মহারাজ মুদ্রণ কার্য্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও আমাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ সে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আশীর্ব্বাদ, তাঁর আশ্বাস, তাঁর পরিশ্রম ব্যতীত এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এত দ্রুত এই দূরূহ কাজ সম্পন্ন হতো না। তাঁকে আমরা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীচৈতন্য আশ্রমের কর্মীবৃন্দকেও তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীরাম প্রসাদ কানুনগোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। তার অসীম ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তার যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছে, তার কোন তুলনা খুঁজে পাই না। রাম প্রসাদের অবদান অনস্বীকার্য্য, তার ঋণ অপরিশোধ্য।

বিষয়বস্তুর জন্য আমরা 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (১ম)', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী'—এই মূল্যবান গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। তাই আমরা এই গ্রন্থসমূহের বিখ্যাত বিপ্লবী লেখকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

তুষার কান্তি দাশগুপ্ত
ও
দিলীপ কুমার সেন

ভূমিকা

বিপ্লবী মহানায়ক মাষ্টারদা সূর্য্য সেন সম্পর্কে লেখা এই বইখানি পড়ে বড় আনন্দ পেলাম। লেখক শ্রীতুষার কান্তি দাশগুপ্ত ও শ্রীদিলীপ কুমার সেন আমার বিশেষ পরিচিত ও স্নেহভাজন। শ্রীমান দিলীপ মাষ্টারদার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অপুত্রক মাষ্টারদার বিশেষ স্নেহের ও আদরের পাত্র ছিলেন। শ্রীমান তুষার ও শ্রীমান দিলীপ মাষ্টারদা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য সর্বপ্রকারে, সর্বতোভাবে এবং সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেছেন। মাষ্টারদার অনেক সহকর্মী যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁদের কাছে বার বার বহুবার গিয়ে এবং তাঁদের কাছে নিরন্তর জিজ্ঞাসা করে করে ওঁরা তাঁদের কাছ থেকে মাষ্টারদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাষ্টারদার বিভিন্ন সময়ের সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের পরিবারের ভিতরে যাঁরা মাষ্টারদাকে ছোট বয়েস থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাঁদের কাছ থেকেও প্রশ্ন করে করে ওঁরা মাষ্টারদার ব্যক্তিগত মনোভাব, রুচি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কেও জেনে নেবার চেষ্টা করেছেন। তা'ছাড়াও মাষ্টারদা সম্পর্কে, চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে যত কিছু লেখা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তা' প্রায় সবই শ্রীমান তুষার ও শ্রীমান দিলীপ অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে পড়ে মাষ্টারদা সম্পর্কে আরও জানবার চেষ্টা করেছেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে নিশ্চয়ই বলা যায় যে মাষ্টারদা সূর্য্য সেন সম্পর্কে লিখবার অধিকার ও সামর্থ্য এঁদের আছে।

মাস্টারদার রাজনৈতিক জীবন প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি কাল থেকে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। এবং এই সময়ের ভিতর কয়েকবারই মাষ্টারদাকে খুব জটিল রাজনৈতিক পথের

সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রায় এককভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে এবং তৎকালীন পরিস্থিতিতে ঐ সকল প্রতিটি সিদ্ধান্তই ছিল অত্যন্ত গুরুতর। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষকালে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল একটি অত্যন্ত গুরুতর পথের সন্ধিতে এসে দাঁড়াল এবং সেই অবস্থায় মাষ্টারদাকে একটি স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তার পরিণতি হোল সুদূরপ্রসারী,—চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠন চিরতরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তার একবার ১৯২২/২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনের অবসানের পর মাষ্টারদাকে আর একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল,—বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী পুনরায় অবিলম্বে অনুসরণ করা হবে কি, না? মাষ্টারদার এই সিদ্ধান্তের পরিণতিও সেদিন হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

ঠিক অনুরূপভাবেই ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালেও মাষ্টারদাকে কয়েকবার কয়েকটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

এই সকল সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়েই মাষ্টারদার অনন্যসাধারণ আদর্শনিষ্ঠা ও অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমদিকে বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং জটিলতা সম্পর্কে মাস্টারদার বাস্তব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব কম ছিল এবং হয়ত কিছুই ছিলনা; কিন্তু তাঁর এই অভাব তিনি নিজস্ব সূক্ষ্মবুদ্ধির সাহায্যেই পূরণ করে নিয়েছিলেন।

মাষ্টারদা ছিলেন একজন খর্বকায় দুর্বল ব্যক্তি। কিন্তু মাষ্টারদার চেহারাই মাষ্টারদার যথার্থ পরিচয় ছিলনা। মাষ্টারদা সূর্য্য সেন ছিলেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ সেনানী। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ভারতকে মুক্ত করতে পারেনি সত্য; কিন্তু চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর নিষ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা, বর্বর অত্যাচার ও সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে বর্তমান কালে একমাত্র একটি সফল সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ। এই সশস্ত্র বিদ্রোহ সুনিপুণভাবে সংগঠিত

হয়েছিল মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে এবং এই বিদ্রোহ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে অপ্রত্যাশিত একটি কঠিন আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে বৃটিশ অধিকৃত ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশকে সাময়িকভাবে, স্বল্প কিছু সময়ের জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পেরেছিল। এবং শুধু তাই নয়, সেই বিদ্রোহ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলুষস্পর্শমুক্ত ভারতের সেই ক্ষুদ্র একটি অংশে একটি মুক্ত স্বাধীন বিপ্লবী সাময়িক সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় জাগরণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে অতি সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলে হোলেও এবং খুব সাময়িক কালের জন্য হোলেও বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছিল। চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের এই সাফল্যই চট্টগ্রাম বিদ্রোহের এবং সেই বিদ্রোহের মহানায়ক মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের একটি কৃতিত্ব ও একটি পরিচয় মাত্র।

কিন্তু ১৯৩০ সালের একটি সন্ধ্যায় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটি কঠিন আঘাতে সাম্রাজ্যবাদের একটি আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার মধ্যেই মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। এই বিদ্রোহের পর চতুর্থ দিনে যখন বিপুল সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ জালালাবাদ পাহাড়ে সমগ্র দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী সেনাবাহিনীকে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড আক্রমণে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল তখনও মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে সেই স্বল্পসংখ্যক মুক্তি ফৌজের বেপরোয়া প্রতি আক্রমণে সেই বিরাট সাম্রাজ্যবাদী ফৌজকেই পলায়ন করে চলে যেতে হয়েছিল।

তারপর সীমাবদ্ধ একটি অঞ্চলের মধ্যে অর্থাৎ অল্প কয়েকটি গ্রামের মধ্যে বাস করে তিন বৎসরকাল মাষ্টারদা যেভাবে নিরন্তর সাম্রাজ্যবাদকে বার বার কঠিন আঘাতে জর্জরিত ও হতমান করেছেন তা' প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনী বলেই মনে হয়। পুলিশ, ফৌজ ও সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই এই গ্রামগুলির কথা জানতো এবং এ কথাও জানতো যে, মাষ্টারদা সূর্য্য সেন নিজে ও তাঁর বহুসংখ্যক বিপ্লবী কর্মী আত্মগোপন করে ঐ গ্রামগুলির মধ্যেই

প্রায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন। ঐ সকল গ্রামের রাস্তায় সর্বক্ষণ সশস্ত্র পুলিশ ও ফৌজের টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ঐ সব অঞ্চলে যখন তখন খুশীমত সান্ধ্য আইন জারী করে সতর্ক তল্লাসী হয়েছে; বহুবার সমগ্র গ্রাম ফৌজী প্রহরায় নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে ফেলে বাড়ী বাড়ী পুংখানুপুংখরূপে খুঁজে দেখা হয়েছে তবুও সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। বরং ঐ সব অঞ্চলে ভিতর থেকে অতি সুকৌশলে মাঝে মাঝেই বিপ্লবী কর্মীরা মাষ্টারদার নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী বাইরে বের হয়ে এসে অসমসাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে কঠিন আঘাত হেনে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সাথে সংশ্লিষ্ট এই সব ঘটনাই আমাদের জাতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উজ্জ্বল ও গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু আমাদের দেশবাসী এবং বিশেষ করে আমাদের দেশের আজকের তরুণেরা আমাদের দেশের এইসব অতীত গৌরবের কাহিনী কতটুকু জানেন? শ্রীমান তুষার ও দিলীপের লেখা এই সব ঘটনার কাহিনী একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর শেষ না করে রাখা যায় না। শুধু একবার নয়, অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে কয়েকবার আমি এঁদের লেখা 'বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্য সেন' পড়েছি।

মাষ্টারদা সূর্য্য সেন সম্পর্কে আরও সামান্য কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীদের লেখা বইতে যা স্বাভাবিকভাবেই নেই এই বইতে তা আছে। এই বইখানিতে মাষ্টারদার জীবনের রাজনৈতিক দিকটা যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি একজন মানুষ হিসেবে মাষ্টারদা কেমন ছিলেন, সেদিকটিও ভালভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

যাঁরা, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সম্পর্কে জানতে উৎসুক আমি অকুণ্ঠ মনে তাঁদের এই বইখানি পড়তে অনুরোধ করি।

গণেশ ঘোষ

'বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্য সেন' গ্রন্থখানি পড়ে সত্যি সত্যিই খুব আনন্দ পেলাম। লেখকদ্বয়ের বক্তব্যের ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে এমনই মাদকতা আছে যে, সাহিত্য বিচারে ইহাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা ইতিহাসকে আশ্রয় করেই গ্রন্থখানি রচিত। ইতিহাস তো শুধুই অতীতের কাহিনী নয় বা শুধুই ঘটনাপঞ্জী নয়। ইতিহাস আমাদের আত্মিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধারাবাহিক বিবরণও বটে। এই গ্রন্থখানিও সেই জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে বলে মনে করি।

১৯৪৪ সাল এবং ১৯৪৬ সালের 'নৌ-বিদ্রোহের' একজন অখ্যাত বিদ্রোহী হিসাবে বলতে পারি, আমরা প্রতিপদক্ষেপে অমর বীর বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের অমর বাণীকে অনুসরণ করে পথ চলার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলাম এগিয়ে যাওয়ার. যেমনভাবে পেয়েছিলেন নৌবিদ্রোহের পূর্বসূরী মহান্ নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

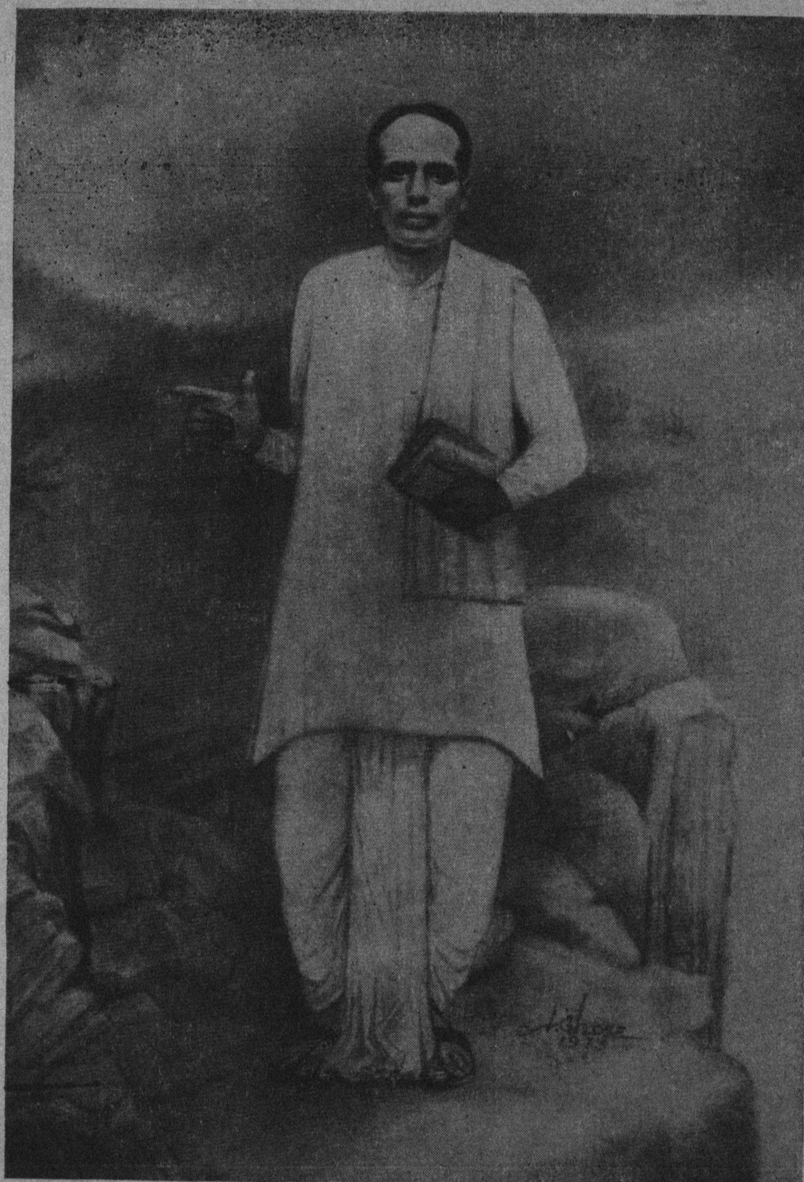
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মাষ্টারদার চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য লেখকরা তাঁদের সুনিপুণ তুলির টানে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন। জীবনের ছোট-খাটো ঘটনাও যেমন লেখকদের লেখনীতে ধরা পড়েছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত জিঘাংসার প্রতিশোধে কঠিন সংকল্পে দণ্ডায়মান মহানায়কের মূর্তিটিও অত্যন্ত স্পষ্ট। মাষ্টারদাকে জানতে হলে, তাঁকে চিনতে হলে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি পাঠ করতেই হবে। পরিশেষে যুব সম্প্রদায়ের কাছে মাষ্টারদার মহান আদর্শ, সুকঠিন শৃংখলাবোধ ও মহান ত্যাগের ব্রতকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতের চলার পথের রূপরেখাকে টেনে নিয়ে যেতে আহ্বান জানাই। এই গ্রন্থখানির সুপ্রচার কামনা করি দেশের স্বার্থেই।

শ্রীফণি ভূষণ ভট্টাচার্য্য

যেদিন শুনলাম শ্রীমান তুষার ও শ্রীমান দিলীপ মাষ্টারদার জীবনের ইতিবৃত্ত রচনার মহান দায়িত্ব নিয়েছে, সেদিন তাদের শুধু উৎসাহিতই করিনি, মনে মনে আশীর্ব্বাদও করেছিলাম। কারণ বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অবক্ষয় বোধ করতে হলে এই বিপ্লবী মহানায়কের জীবন-আলেখ্য রচনা একান্ত প্রয়োজন।

বিপ্লবী সূর্য্য সেনের জীবন আদর্শ ত্যাগ নিষ্ঠা আর জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 'বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্য সেন' গ্রন্থখানি পাঠ করেছি। দেশপ্রেমিক নীহারিকা মণ্ডলীর অন্যতম চিরভাস্বর নক্ষত্র মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের জীবন-ইতিহাসকে এমন নিখুঁতভাবে অন্য কোন গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাই এই গ্রন্থ পাঠ করে কোন যুবক যাতে মাষ্টারদার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এই আশায় এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার অন্তর দিয়ে কামনা করি।

শ্রীবিনয় ভূষণ মুখোপাধ্যায়



জন্ম : ১৪ই মার্চ, ১৮৯৪ মৃত্যু : ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

CHITTAGONG

Censored

PRISONER'S LETTER

Chittagong Jail

Contents admissible under the rules.

Passed may be posted.

Jailor.

Superintendent.

চট্টগ্রাম জেল থেকে লেখা মাষ্টারদার চিঠি

CHITTAGONG

Censored & Passed

Jail.

PRISONER'S LETTER.

Chittagong.

[illegible]

Contents admissible under the rules.

Passed may be posted.

Jailor.

Superintendent.

A.C.J.R. [illegible]

ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘকালের ইংরেজ শাসন ইতিহাসের এক গ্লানিময় অধ্যায়। এক সর্ব্বগ্রাসী আতংক, বীভৎস বিভীষিকার বাঁধন জনজীবনকে অক্টোপাসের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে ছিল। দু'শো বছরের বিদেশী শাসনের নির্মম নির্যাতনের যে বিরাট শোষণের জগদ্দল পাথর ভারতমাতার বুকে চাপানো হয়েছিল তা থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের বিক্ষুব্ধ মনে উগ্র জাতীয়তা বোধের সংকল্প দানা বাঁধছিল। জীবনের প্রতিটি পর্ব্বে শাসনের নামে যে শোষণ ও দমননীতির চাবুক মারা হচ্ছিল তা'তে জর্জরিত হয়ে দেশপ্রেম স্বাধীনচেতা মানুষের বুকে বিস্ফোরণের এক তীব্র জ্বালায় ছট্ ফট্ করে মরছিল। আত্মসম্মান, অধিকার ও স্বাতন্ত্র বোধহীন রুগ্ন সমাজের স্বাভাবিক দান তো দুর্বল পঙ্গু এক অচল সমাজ ব্যবস্থা—যা' সমগ্রজাতীকে ক্ষয়রোগের মত তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কোন জাগ্রত তরুণ প্রাণ জাতির এই অসহায় মুমূর্ষু অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হ'তে দিতে পাবে না। তাই তারা জাতির লাঞ্ছনা বোধে অভিশপ্ত জীবনের দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণায় এক নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখলো—যে জীবনে ভীরুতার গ্লানি নেই, পরাধীনতার অভিশাপ নেই—শুধু মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন একান্ত নিজস্ব জীবনে এক অনাবিল অফুরন্ত মুক্তির আস্বাদ। তাই সে দিন যুব সমাজ আত্মত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জন্মভূমিকে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য মৃত্যুপণ সংকল্পে ব্রতী হয়েছিল। রক্তের লেখায় যে অমরত্বের ইতিহাস বীর বিপ্লবী সেনানীরা রচনা করে গেছেন, তা' শুধু বিপ্লবের ইতিহাসই নয়— ভাবীযুগের যুবশক্তির উদ্দীপ্ত চেতনা, প্রেরনা ও স্বাধীনতাকামীর জীবনবেদ। দুর্যোগের ঘনান্ধকারে, যখনই যুবশক্তি

তুলেছিল। শুধু তাই নয়—ঈশ্বরে ছিল তাঁর অখণ্ডবিশ্বাস ও ভক্তি।

১৯০২ খৃঃ কালুর পাঠ্যজীবন শুরু হয় গ্রামের 'দয়াময়ী উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে'। দ্বিতীয় শ্রেণীতেই তার হাতে-খড়ি। ছাত্রজীবনের অধিকাংশ তার কাটতো লেখা-পড়ায়। পড়াশুনায় ছিল তার গভীর মনোযোগ জ্ঞান আহরণে ছিল তীব্র আকাঙ্খা। পড়াশুনার বাইরে খেলাধূলার যে জগৎ তা'তে তার খুব আগ্রহ ছিল না। এজন্য তার রুগ্ন দুর্বল শরীরই দায়ী—মনের ইচ্ছা সেখানেই বাধা পেতো।

এই প্রাইমারী স্কুলটি ক্রমে নোয়াপাড়া এইচ, ই, স্কুলের সংগে সংযুক্ত হয়। কালু এই স্কুলে অষ্টম মান পর্য্যন্ত পড়েছিল। সে ছিল প্রতিটি ক্লাসেই 'ফাস্টবয়' এবং সত্যবাদীতা ও সদ্ব্যবহারের জন্য সে প্রতিবছর স্কুল থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করতো। তারপর সে অষ্টমশ্রেণী থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকাননে হরিশচন্দ্র দত্তের ন্যাশনাল হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়। তখন ১৯১৩ খৃঃ এখান থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে এফ এ,-তে ভর্ত্তি হয়। কিশোর কালু এখন যৌবনের সূর্যসেন।

এফ এ—পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

তারপর তিনি পড়তে যান বহরমপুর কলেজে।

এই সময় থেকেই তাঁর জীবনে রাজনীতির ছোঁয়াচ লাগে। সহপাঠীদের সঙ্গে কখনও কখনও তাঁর নিভৃতে বৈঠক হতো—রাজনীতির নানা দিক নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলতো। বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন কালেই বিপ্লবীর ভাবাদর্শের তিনি পরিপোষক হয়ে ওঠেন। এখানে তিনি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সংস্পর্শে এসে শিক্ষাগুরুর বৈপ্লবিক ভাবধারায় অংশ গ্রহণ করেন।

সূর্যসেনের শৈশব অতিবাহিত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংকট এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ঔপনিবেশিক ঘাঁটিগুলিতে অকথ্য নারকীয় অত্যাচারের মধ্যে। তাঁর প্রখর রাজনৈতিক চেতনার কারণ এই বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বলা চলে।

কলেজের পরীক্ষার সময় এক অঘটন ঘটে। পরীক্ষা শুরু হবার কিছু আগে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে এক গোপন বৈঠক বসে যখন তিনি পরীক্ষার হলে এসে উপস্থিত হ'লেন তখন পরীক্ষা শুরু হয়ে আধঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কলেজের ইউরোপীয়ান অধ্যক্ষ তাঁকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি না দেওয়ায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি ফিরে গেলেন। তিনি বাড়ীতে এসে সমস্ত ঘটনা অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর অমার্জ্জনীয় অপরাধকে গোপন করবার জন্য মিথ্যাব আশ্রয় নেননি। বরং তাঁর সত্য ভাষণের মধ্যে যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ঘটনা থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কিছু আভাস আত্মীয় পরিজনবর্গের কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। যাই হোক, পরেব বছরেই তিনি পুনরায় পরীক্ষায় বসে বহরমপুব কলেজ থেকেই বি, এ, পাশ করেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেন ও অজিতকুমার সেন এবং সূর্যসেন ও কমল সেনের পড়া ও দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর উপর। প্রথম দু'জন ৺গৌরমণি সেনের পুত্র। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মশাই ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী সদালাপী কিন্তু কঠোর এবং শৃংখলা পরায়ণ।

সূর্যসেনের স্কুল জীবনের এক মজার ঘটনা উল্লেখ করছি। একদিন তাঁদের বাড়ীর পিছনে পুকুর পাড়ের এক নির্জন জায়গায়

বসে তাঁরা দু'ভাই মিলে তামাক টানছিলেন। এই নেশায় তাঁরা মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না—সখ করে টেনে দেখছিলেন ঐ বস্তুটিতে কি আছে। বড়রা কোন আকর্ষণে তামাকের এত ভক্ত! কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁদের গৃহশিক্ষক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন এবং সেজন্য তাঁদের উত্তম-মধ্যম শাস্তিও ভোগ করতে হয়। এই ঘটনার পর আর কখনও জীবনে তিনি কোন নেশায় আসক্ত হননি।

তিনি খুব ভাল সাঁতারু ছিলেন। কর্ণফুলী নদীতে প্রায়ই সাঁতার কাটতেন। কখনও কখনও এই মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় একান্ত নির্জনে কর্ণফুলীর তীরে বসে কিসের ভাবনায় যেন ডুবে থাকতেন। হয়ত স্বাধীনতার স্বপ্নে বিপ্লবী চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। কৈশোরের বিপ্লবী মনের সেই ক্ষুদ্র চারাগাছটি উত্তর-কালে আমরা দেখেছি বিরাট এক মহীরূপে পরিণত হ'তে।

সূর্যসেন কালীর ভক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি এক মহা-সাধকের সান্নিধ্যলাভ করেন—তিনি হ'লেন ধলঘাট বুড়াকালী মন্দিরের পূজারী সাধক শ্রীতারাচরণ সাধু। দীর্ঘদিন তিনি ধলঘাটে সাধনা করার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর আসেন তিনি নোয়াপাড়ায়। সূর্যসেন প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন।

বি, এ, পাশ করেই তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এলেন এবং চট্টগ্রাম উমাতারা হাইস্কুলের অংকের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর বিপ্লবী ভাবাদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণে সহজ ও সুগম হ'বে ভেবেই তিনি এই বৃত্তিকে বেছে নিয়েছিলেন।

স্বল্পভাষী ও স্বভাবলাজুক এই মানুষটিকে দেখে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও অসাধারণ প্রতিভাকে আবিষ্কার করা যেতো না। পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাধারণ—আচার-ব্যবহারে ছিল না আত্ম প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা কোন অহমিকা। কৃশ খর্বকায় শান্তশিষ্ট

একটি মানুষ। বাক-সংযমী নিরীহ এই মানুষটিকে দেখলে কেউ ভুলে ও অনুমান করতে পারতো না যে,- বিপ্লবী চেতনার কী এক অসাধারণ অগ্নিগর্ভ প্রতিভা তাঁর অন্তরে প্রজ্বলিত ছিল।

আচরণে সাধারণ এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ।

নিজ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অন্যের মন জয় করবার শক্তি ছিল তাঁর অপরিসীম।

তাঁর অতুলনীয় কল্যানবোধ ও আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শে ছাত্ররা মুগ্ধ—বিস্ময়ে তাদের প্রিয় শিক্ষককে ভক্তি ভালবাসায় খুব কাছে টেনে নিল। সূর্য্য সেন হ'লেন 'মাষ্টার দা'।

বাইরের উত্তাপহীন শান্ত আবরণের মধ্যে পরাধীনতার কাল-বহ্নির জ্বালা অনির্বাণ জ্বলতে থাকে। ছাত্রদের মধ্যেও তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্পর্শ লাগে। এইভাবেই ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যত অগ্ন্যুৎপাতের বীজ উপ্ত হোল।

জন্ম-মৃত্যুর মত অনিবার্যভাবেই বাঙালী জীবনে বিবাহ একটি কর্ত্তব্যের বাঁধন। কিন্তু তখনকার দিনের বিপ্লবীরা ধর্মভাব দ্বারাই বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল এবং দেশের মুক্তির জন্য আত্ম-ত্যাগ একটি কঠোর তপস্যা বলে গ্রহণ করতো। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিপ্লবীদের বিবাহিত জীবনের কথা তারা ভাবতেই পারতো না। বাংলার বহু বিপ্লবীনেতা চিরকুমার থেকে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, আজও অনেকে তাই অবিবাহিত বার্ধক্য জীবন যাপন করছেন।

বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষিত মাষ্টারদা' ও বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ বাড়িতে কোন আমল পায়নি। ৺চন্দ্রকুমার সেন ও অন্যান্য গুরু স্থানীয়

আত্মীয়-পরিজনবর্গের বিশেষ অনুরোধকে পরিশেষে তাঁকে আদেশ বলে মেনে নিতে হয়েছিলো।

১৯১৯ খৃঃ তিনি কানুনগো পাড়ার ৺নগেন্দ্রনাথ দত্তের পরমাসুন্দরী কন্যা পুষ্পকুন্তলা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই পরিণয় তাঁর জীবনের একটি ঘটনা মাত্র, কারণ পরবর্তী জীবনে আমরা এই পরিণয়ের কোন প্রভাব প্রত্যক্ষ করিনি। বরং বলতে পারি, এই ঘটনার পর তাঁর সংগ্রামী জীবন এক দুর্বার গতিতে ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটলো—এখানে ও তাঁর চরিত্রের অসাধারণত্ব।

কিশোরী বধূ অনুপম রূপের সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি নিয়ে পাল্কী থেকে নামলেন। বিপ্লবীর ঝঞ্ঝা-সংকুল জীবনে ফুলের মত সুন্দর এ নারীর কি প্রয়োজন? শতধা ফেটে পড়তে চাইলো আজন্ম—বিপ্লবীর হৃদয়।

এ কি বিপ্লবীর চরণে কুসুম-শৃংখল হ'বে? না,—তা কখনই হ'তে পারে না।

আজীবন কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি সেই মুহূর্তেই। তিনি যে দেশ-জননীর পায়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

ধর্মের পথে সন্ন্যাস গ্রহণের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। জীবনের অফুরন্ত প্রাচুর্য্য লালসা মাধুর্য্য থেকে মধুরতম অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে দীন ভিক্ষুকের রিক্ত নিঃস্ব জীবনকে অবলম্বন করে মহাস্থবিরের পথে ছুটে যেতে দেখেছি অনেক ত্যাগীপুরুষকে কিন্তু ভোগের দ্বারপ্রান্ত থেকে মুহূর্তে ত্যাগের অঞ্চল নিরুদ্দেশ পদক্ষেপ বড় দুর্লভ। কর্মযোগী সূর্য্য সেন মহা-বিপ্লবী সন্ন্যাসী, দেশপ্রেমিক —ভীষ্মের মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, স্থির অটল। 'সমাজ সংসার মিছে

সব, মিছে জীবনের এই কলরব'—এই জীবনবাণী তাঁর অন্তরেব বিদ্যুৎপ্রভাকে আরও তীব্রভাবে জাগিয়ে তুললো। সংসারের স্নেহ-মমতার সমস্ত বাঁধন, প্রিয়ার অন্তরের সমস্ত উদ্বেল আকুলতা উপেক্ষা করে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মসমর্পণ করলেন।

নারী জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে নিমেষে বিসর্জন দিয়ে পুষ্পকুন্তলা দেবী নিঃসঙ্গ-জীবনে যে দুঃখ যে মানষিক যন্ত্রণা আত্মিক নিষ্ঠা ও সহনশীলতার মধ্যে হাসিমুখে বরণ করে গেছেন, তা' শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কবি। সংসাবের একান্ত নিভৃতে তিনিও যেন ত্যাগের মহান্ ব্রতে স্বামীর সহযোগী সহমর্মী ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিকদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে স্মরণ কবি, আজ যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠাতা সেই সব অমর বীর শহীদদের। গুলীব মুখে, ফাঁসির দড়িতে, গোয়েন্দা পুলিশেব গোপন কুঠুরিব মধ্যে নির্মম অত্যাচারে একদিন এদের জীবনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। সমষ্টিগত স্বার্থেব কাছে ব্যক্তিগত সুখ শান্তি নিমেষে বিসর্জন দিয়ে দেওয়ার এই অসাধারণ শক্তি ও ত্যাগ শ্রদ্ধাব সঙ্গে আমাদেব আজ স্মরণ করতে হ'বে।

প্রকৃতির লীলানিকেতন সাগর মেখলা চট্টলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন সূর্যসেন। বাংলাদেশের সীমান্তে এই জেলার অধিবাসীবা পাহাড়-নদী-সমুদ্রের প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ বলে স্বভাবতঃই স্বভাব-কবি, অনুভূতিপরায়ণ ও জন-দরদী। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে চট্টগ্রামের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বাধীনতার যে জ্বলন্ত স্পৃহা চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের দুরূহ পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তা' অবিস্মরণীয়।

এই ঐতিহ্যকে যদি ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয়, সুখ, সমৃদ্ধি ও মুক্তির উচ্চতম শিখরে যদি দেশকে উন্নীত করতে হয়,

তা'হলে যাঁরা ঐ শিখরে আরোহণের জন্য এক একটি ঐতিহাসিক ধাপ সৃষ্টি করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে মহৎ মরণ দিয়ে— তাঁদের কথা আমাদের অবশ্যই জানতে হ'বে। তাঁদের আত্মদানকে যথোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অর্পণ করার মতন মানসিক প্রস্তুতি আমাদের থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেবল রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনার জন্য নয়, সেই সব অমর শহীদদের জীবনাদর্শ থেকে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে তা' আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে হ'বে।

শিক্ষক জীবন থেকেই শুরু হয় মাস্টারদা'র আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের মরণপণ প্রত্যক্ষ অভিযান। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার প্রতিফলন ঘটতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। তাদের ও চট্টগ্রামের আরো অনেক বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন যুবকদের নিয়ে তিনি সংগঠন রচনায় হাত দিলেন। জেলার কয়েকটি শিক্ষায়তনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের একনিষ্ঠ অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে জাতির ইতিহাস এক নূতন অধ্যায়ে মোড় নিল। পরে নানা বাঁকে ঘুরে, বহু আবর্তে পড়ে, নানা পরীক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতেব কঠিন স্তর অতিক্রম করে 'চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের' মধ্যেই তা' চরম রূপ নেয়।

এ প্রেরণা, এ প্রচেষ্টা হঠাৎ কোন জাগ্রত চেতনা থেকে উদ্বুদ্ধ নয়—বিস্ফোরণ আকস্মিক, কিন্তু মানসিক সর্বাত্মক প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের।

বাংলাব শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাকতায় পরাজিত করা ও গুপ্তহত্যার পর থেকেই বিদেশী জাত-বেনিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ বাঙালীর মনে দানা বাঁধতে থাকে। পলাশীর আম্রকাননে গঙ্গাবক্ষে যে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়, মুক্তিপাগল বাংলার মানুষ তার পরবর্তী

অন্ধকারময় যুগে ইংরেজ শাসনের পরাধীনতার বন্ধন-শৃঙ্খল মোচনের চিন্তায় সংকল্পে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হ'তে থাকে।

সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লব-সাধনা বিশাল ভারতের রঙ্গমঞ্চে জাগ্রতগণ-চেতনার একটি সক্রিয় প্রতিফলন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানই স্বাধীনতা-লাভের একমাত্র উপায় বলে অনেকের মনে হয়। পাঞ্জাবেব 'গদব পাটির' আন্দোলন, অরবিন্দ—বারীন্দ্রের বিপ্লব প্রচেষ্টা, বাঘা যতীনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা—এ সমস্তই যে সংকল্পের কথাই বার বার প্রকট করে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের আপোষপন্থী কার্য্যক্রম নূতন শিল্প-বিকাশেব উদ্যোগীদের সাহায্য করলেও অগনিত আর্থিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন উপকাবেই আসেনি।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহেব মধ্যদিয়ে জনগণের চেতনা স্পর্শ করার পথ বেছে নিয়েছিলো বিপ্লবীরা। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতেব কর্মপন্থায় অগ্রসব হ'তে হ'লে তথা সংগঠনকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করতে হ'লে এবং সর্বোপরি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পরিকল্পনাকে সার্থক ও সফলতার সঙ্গে রূপায়িত করতে হ'লে উপযুক্ত অস্ত্র ও আরও ব্যয়বহুল সরঞ্জাম প্রয়োজন এবং সেইজন্য চাই বিপুল পরিমাণ অর্থ। বিনা অর্থে এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে কিছুতেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

কোন কোন সংগ্রামী সৈনিক শুরুতেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য 'স্বদেশী ডাকাতি'-র পথ বেছে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও নেতৃবৃন্দ পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ ও নৈতিক কারণে প্রথমেই তা' যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।

তাই তাঁরা নির্দ্দেশ দিলেন—"প্রত্যেকেই নিজেদের আত্মীয়-পরিজনবর্গের কাছ থেকে সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন

কর। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি ত্যাগের বোঝা নিজেদের কাঁধে না চাপিয়ে ডাকাতির মাধ্যমে অন্যের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করা হয়, তা'হলে বুঝতে হ'বে, তা' স্বার্থত্যাগের দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রয়াস যা' কোন মতেই নৈতিক কারণে সমর্থন যোগ্য নয়— ।" কর্ম্মীরা এই নির্দ্দেশ মাথা পেতে নিল।

অসহযোগে বিশ্বাসী না হ'লেও সাধারণ মানুষের শিশু-রাজনৈতিক চেতনা যে পথে স্বতঃই উৎসারিত হয়েছিল, তার পুরোধাতে থাকাই সূর্যসেনের অভিপ্রায় ছিল। অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনে বিপ্লবী সৈনিকরা যোগদানে পক্ষপাতী ছিলো না। কিন্তু আন্দোলনের দুর্বার গতিবেগে নির্বিকার থাকা ও সমীচীন মনে করলেন না।

তাই দলের অন্যতম নেতা অনুরূপ চন্দ্র সেনের অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে যোগদানের প্রস্তাবকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে মাস্টারদা' বললেন—

—"আমাদের বিপ্লব প্রচেষ্টা আজ সসীম ক্ষেত্রে নিবদ্ধ, কিন্তু যে জনসাধারণের জন্য আমরা স্বাধীনতা চাই সেই জনসাধারণ যদি তা'র ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠে একবারও শিকল-ভাঙ্গার চেষ্টা করে, তা'হলে আমাদের কর্তব্য তা'তে শক্তির যোগান দেওয়া। আমরা তাদের পুরোভাগেই থাকবো এবং এতে বৃহত্তর কর্ম্ম-সাধনার ও সংঘ-গঠনের সুযোগ আমরাই বেশী পাব— ।"

যেভাবেই হোক, জনগণের ক্ষুব্ধচেতনার আগুনকে বিপ্লবের পথে চালিত করাই প্রকৃত বিপ্লবীর কাজ। মাস্টারদা' এই কাজকে যোগ্য নেতৃত্বেই গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিজাশংকর চৌধুরীকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হ'লো— 'স্বরাজ সংঘ'। কংগ্রেসের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে দিনের পর দিন পুষ্ট হ'তে থাকলো এক সুশৃঙ্খল দুঃসাহসী বিপ্লবী-বাহিনী।

এই বিপ্লবী-বাহিনীর প্রাথমিক কর্তব্য ছিল অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহ করা। কারন আগামী দিনের স্বপ্ন সফল করতে হ'লে চাই অর্থ, জনবল আর চাই বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র—।

বিপ্লবীদলের সদস্যদের আত্মীয়-স্বজনদের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ অপহৃত হয়ে বিপ্লবী সংস্থায় জমা পড়তে লাগলো। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে তা' পর্য্যাপ্ত ছিলো না। তাই ক্রমে ক্রমে ডাকঘর লুঠ, রেল কোম্পানীর তহবিল লুঠ এবং আরও কয়েকটি ডাকাতি ছাড়া ব্যক্তিগত দানের মধ্যদিয়ে অর্থ সংগৃহীত হ'তে লাগলো। এই অর্থ সংগ্রহেও একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ বরাবরই স্বদেশীদের স্বপক্ষে ছিল। 'স্বদেশী ডাকাত' আমাদের ছেলেরা 'স্বদেশী বাবু' নামে তখন পরিচিত। বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে থাকতো সাধারণ মানুষের মধ্যেই।

সাম্পানের (নৌকার) মাঝি, কামার, তাঁতি, চাষী, মধ্যবিত্ত মানুষ, হাটবাজারের ব্যাপারীরা এমনকি পল্লীর নারীরা পর্য্যন্ত বিপ্লবী ভাইদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতো। এদের অতন্দ্র প্রহরার জন্যই স্বৈরাচারী বৃটিশের তাণ্ডবের মধ্যেও বিপ্লবীরা তাদের বৈপ্লবিক কর্ম্মতৎপরতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলো।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই বিপ্লবীনেতারা কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। তাঁরা পরিস্কার বুঝেছিলেন, চণ্ডনীতির পোষক অত্যাচারী বৃটিশের বিরুদ্ধে অহিংসনীতিতে আন্দোলন অর্থহীন। তারা সীমাহীন স্পর্দ্ধা ও বর্বরতা নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দেবে এবং ক্রমে ক্রমে সংগ্রামকে দুর্বল করে সমগ্র দেশকে পঙ্গু করে দেবে। দেশের সর্বত্র বিপ্লবীদের সামনে এই সমস্যা এক বিরাট প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়ালো।

তাই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে কংগ্রেস

থেকে দূরেও সরে দাঁড়ালেন না অথচ আপোষহীন সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত করবার জন্য হতচেতন—যুবশক্তিকে নূতন করে প্রেরণা জুগিয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা। কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার করেছিলেন—একথা আগেও বলেছি। তাই দেখেছি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় পদে সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে।

মাস্টারদা—'জেলা কংগ্রেসের' সম্পাদক ছিলেন। অম্বিকা চক্রবর্তী সহ-সভাপতি, গণেশ ঘোষ "ইয়ুথ্‌ অ্যাশোসিয়েশনের সম্পাদক এবং 'ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে ছিলেন লোকনাথ বল।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার দু'টি প্রধান বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন'—এর কোনটির সংগেই একেবারে মিশে যাওয়ার কোন সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল গ্রহণ করেনি। বরং চট্টগ্রামের দল স্বতন্ত্র বিপ্লবীদল হিসাবে কাজ ক'রে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পরে অবশ্য দু'য়েকজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীব দলত্যাগের ফলে চট্টগ্রামেও দু'টি বিপ্লবীদল গড়ে উঠে। এই দুই দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও সম্প্রদায়গত ও গোষ্ঠীগত কারণে সংঘর্ষ লেগে থাকতো প্রায়ই।

বিপ্লবীদলের সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ও পরীক্ষা—নিরীক্ষা অবলম্বন করা হ'তো।

দু'দলে ভাগ হ'য়ে যাওয়ার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলন ও কলকাতার 'যুগান্তর'—দলের সঙ্গে সহযোগীতা রক্ষা করে চলতে লাগলো।

একদিকে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলা ও অন্যদিকে কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠান গত দায়িত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করার দুরূহ কর্তব্য তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। সাংগাঠনিক দায়িত্বভার

বুঝে নেবার কিছুদিন পরেই পাকাপাকি 'স্বদেশী ডাকাত্তি'-র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সরকারী তহবিল লুণ্ঠনের প্রতিই তাঁদের বিশেষ নজর ছিল।

১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রামে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি হয় আনোয়ারা থানার পড়ৈকোড়া গ্রামে এক হিন্দু মহাজনের বাড়ীতে। এই ডাকাতি সম্পর্কে নানা গুজব গ্রাম শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এত বড় ডাকাতির কথা শুনে সাধারণ লোকে বলতে থাকে যে, এ চট্টগ্রামের লোকের কর্ম নয়। নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে পাকা ডাকাত এসেছিল। পুলিশ ও এই ডাকাতিকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। কিন্তু এই ডাকাতিতে চট্টগ্রামের বাইরের কোন লোক ছিলো না। বিপ্লবীনেতা নির্মল সেনের নেতৃত্বে, জুলু সেন, উপেন ভট্টাচার্য্য ও আরও কয়েকজন এই দুর্ধর্ষ ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন।

এই চাঞ্চল্যকর ডাকাতির সাফল্যে বিপ্লবীদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ঠিক হয় শহরের বুকের উপর দিনের বেলায় এক ডাকাতি করতে হ'বে।

পাহাড়তলীতে ছিল—'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের' বড় কারখানা। এই কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের মাসিক বেতন নিয়ে যেতো রেলের খাজাঞ্চি বাবু ঘোড়ার গাড়ীতে করে। সঙ্গে থাকতো দু'জন সশস্ত্র পুলিশ। সেই সময় মোটর গাড়ীর খুব প্রচলন হয়নি—বড় বড় ইংরেজ রাজকর্মচারী ও কয়েকজন ধনীর মাত্র মোটব গাড়ী ছিলো। ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন ছিল বেশী।

শ্রমিক-কর্মচারীদের খুচরা দিতে হো'ত বলে বিভিন্ন মুদ্রায় বড় বড় ব্যাগ ভর্ত্তি করে নেওয়া হোত। চট্টগ্রামের ট্রেজারী থেকে টাকা নিয়ে গাড়ী জামাল খাঁ দিয়ে পল্টনের পূর্বদিকের

বাস্তা ধরে রেলওয়ের সুন্দর ছায়া-ঘেরা পিচ্ঢালা পথ ধরে গাড়ী চলতো। বেলা সাড়ে-দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে পাহাড়তলী কারখানায় সে গাড়ী এসে পৌঁছাত। পথটি ছিল খুব নির্জন। এই নির্জন পথই ডাকাতির উপযুক্ত স্থান বলে স্থিরীকৃত হ'লো।

এই সময় কলকাতার বিখ্যাত বিপ্লবীনেতা বিপিন গাঙ্গুলীর দলের অন্যতম সদস্য দেবেন দে গোপনে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি বিভিন্ন ডাকাতি ও অন্যান্য মামলার ফেরারী আসামী হয়েই চট্টগ্রামে আত্মগোপনের জন্য চলে এসেছিলেন। মাস্টারদাকে এই বিপ্লবীনেতা খুব ভালবাসতেন এবং বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যে মাস্টারদা ও বিপিন গাঙ্গুলীর মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তাই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের বন্ধুদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার জন্য তাঁরাও সচেষ্ট ছিলেন। স্থির হয়, চট্টগ্রামের তিনজন বিপ্লবী উপেন ভট্টাচার্য্য, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস ও কলকাতার এই দেবেন দে রেলওয়ে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করবেন।

১৯২৩ সাল, ১৩ই ডিসেম্বর। সকাল দশটা। উঁচু পাহাড়ের মাথায় সুসজ্জিত সুদৃশ্য ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলো। ঠিক হয়, অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে 'টাইগার পাসের' মোড়ে পাহাড়ের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। উপেন ভট্টাচার্য্য ও নির্বিরোধী ভাল মানুষটির মত ঐ পথে চলতে থাকবেন ধীরে ধীরে। আর ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে সাইকেল চড়ে আসবেন রাজেন দাস। বলা বাহুল্য, রিভলবার ও পিস্তল তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল।

সতের হাজার টাকার বস্তা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী এগিয়ে আসছে। চারজনেই এবার আরও সতর্ক, প্রস্তুত। গাড়ী কাছে এসে গেছে। আর দেরী নয়। এক-দুই-তিন—আচম্‌কা পিস্তল

হাতে লাফিয়ে প'ড়ে গাড়ি থামিয়ে ওঁরা উঠে পড়লেন। বিদ্যুৎগতি এই ঘটনার আকস্মিকতায় খাজাঞ্চিবাবু ও সশস্ত্র পুলিশ দু'জন এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে প্রতি-আক্রমণের অবকাশই পায়নি।

দেবেন দে গাড়োয়ানের পোষাক সংগেই এনেছিলেন। তাড়াতাড়ি তা' পরে নিয়ে গাড়োয়ানকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর রশি ও চাবুক হাতে নিয়ে নিলেন। অন্য দিকে উপেন ভট্টাচার্য্য, দেবেন দে ও রাজেন দাস বুকের উপর পিস্তল ধরে সশস্ত্র পুলিশদের নিরস্ত্র করে গাড়ী থেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলেন। খাজাঞ্চিবাবু আগেই নেবে পড়ে নীচে ততক্ষণে ভয়ে ঠক্, ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করেছে। গাড়োয়ান-বেশী দেবেন দে গাড়ী ছুটিয়ে দিলেন।

ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে গাড়ি আবার শহরের পথে ছুটিয়ে দেওয়া হ'লো।

মাত্র ২।৩ মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ। বিভ্রান্ত সিপাইরা খাজাঞ্চিবাবুকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো। পরে বিকেল সাড়ে চারটেয় পুলিশ দেখলো, 'চট্টগ্রাম ইস্‌লামিক ইন্টারমিডিয়েট্ কলেজ' যে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে, সেই পাহাড়ে উঠবার যে রাস্তা পাহাড়ের গা'বেয়ে উত্তরদিকের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেখানে একটা পরিত্যক্ত ঘোড়াব গাড়ী। ঐ গাড়ীর গাড়োয়ান এসে তার গাড়ী সনাক্ত করলো এবং তা' নিয়ে যাওয়া হ'লো কোতোয়ালী থানায়।

এই ডাকাতির পর শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সশস্ত্র সিপাহীদের পাহারায় নিয়ে যাওয়া টাকা-গাড়ী সমেত হাওয়া! এত দুঃসাহস !!

অফিস—আদালত, স্কুল-কলেজ, চায়ের দোকান সর্বত্র উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে—অসাধারণ মানুষ এরা!

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শহরে বড় বড় প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই দুর্ধর্ষ ডাকাতদের ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে ১০০০৲ টাকা ঘোষণা করলো।

চট্টগ্রাম পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ এই ডাকাতির কোন কিনারা করতে না পেরে কলকাতা থেকে অভিজ্ঞ গোয়েন্দাদের তদন্তের কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়ে আসা হ'লো। কিন্তু কোন কিনারা তারাও করতে পারেনি। দেশের মানুষ অনেকে তাদের ঘরোয়া আলাপের সময় ইংরেজের এত টাকা লুণ্ঠনে দারুণ উল্লাস প্রকাশ করে এবং বিশেষভাবে প্রার্থনা জানায়—এই স্বদেশী ডাকাতেরা যেন ধরা না পড়ে।

এই ডাকাতির পর অনন্ত সিংহ, দেবেন দে, রাজেন দাস, উপেন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শহরের উপকণ্ঠে এক পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ডাকাতির প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ঐ গোপন আস্তানায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হ'তে মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীও গিয়ে উপস্থিত হ'ন।

চারদিকে মুসলমান পাড়া—তার মধ্যে কয়েকজন হিন্দু যুবকের অবস্থান অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করলো। মাস্টারদারা অবস্থা নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় স্থানীয় থানার দারোগা আব্দুল মজিদ্ কয়েকজন মাত্র অনুচর নিয়ে হাজির হ'লো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ও করলো কিন্তু বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে তখনই কিছু না বলে এবং পাড়া প্রতিবেশীদের সতর্ক করে দিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতির জন্য থানায় ফিরে গেল।

আর মোটেই দেরী করা উচিত হ'বে না বুঝে মাস্টারদারা খোলাহাতে রিভলবার নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামবাসীরা কিছু তাড়া করতে করতে পিছু নিল। ইতিমধ্যে ডি. এস. পি.

ব্রজবিহারীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে পড়লো। পশ্চাদ্‌ধাবমান্ জনতা-পুলিশ ও মাস্টারদাদের মধ্যে বেশ কিছুটা পথের ব্যবধান ছিল। তাঁরা ইতস্ততঃ গুলী ছুঁড়তে লাগলেন জনতার মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবার জন্য। তা'তে সাময়িক কাজ হ'লেও পুলিশের সহায়তায় তাদের সাহস আরও বেড়ে গেল। তাছাড়া যখন তারা দেখলো যে, গুলি তাদের হত্যা করবার জন্য ছোঁড়া হচ্ছে না তখন তাদের মন থেকে ভয় দূর হ'য়ে গেল। লক্ষ্য করবার বিষয়, জনতাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে কাপুরুষ পুলিশের দল সেকেণ্ড লাইনে গা বাঁচিয়ে রেখেছে।

ইট-পাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে জনতা ছুটলো এভাবে ছুটতে ছুটতে প্রায় দেড় মাইল দূরে বহর্দ্দার হাটে তারা উপস্থিত হ'লো। পাছে হাটের নিরীহ লোকেরা প্রাণ হারায় এই আশংকায় বিপ্লবীরা গুলী ছোড়া বন্ধ করলেন, কিন্তু রিভলভার উঁচিয়ে হাটের মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁরা ছুটতে লাগলেন। জনতার পিছন পিছন পুলিশও আসছে। ডি, এস, পি,-র সঙ্গে ইনস্পেক্টর শচীন ভৌমিক ও সার্জেণ্ট ব্লেচারও আছে, কিন্তু কাপুরুষের দল বিপ্লবীদের গতিরোধ করার দুঃসাহস রাখে না।

পুলিশের এই কাপুরুষতাকে ঢাকবাব জন্য পরে মামলায় শেষোক্ত দু'জন পদস্থ কর্মচারী সাক্ষী দিতে উঠে বলেছিল, 'যেহেতু তাদের সাইকেল বিকল হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু তারা পিছনে পড়ে গিয়েছিল এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিল।'

তাই মামলার সওয়াল জবাবের সময় বিপ্লবীপক্ষের আইনজীবি দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—"এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে দু'জন গোয়েন্দা কর্মচারীর দু'খানা সাইকেলই বিকল হয়ে গেল"!

জনতা মরিয়া হয়ে ছুটছে। বিপ্লবীরা প্রমাদ গুণলেন। শেষপর্য্যন্ত তাঁরা সঙ্গের প্রায় দু'হাজার টাকা ছড়াতে ছড়াতে

ছুটতে লাগলেন। সাময়িক ফল ভালই হ'ল। জনতা টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় পিছিয়ে পড়লো।

কিন্তু টাকা এক সময় শেষ হয়ে গেল। জনতা অর্থের লোভে দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটতে শুরু করেছে। এসে দেখি হিতে বিপরীত অবস্থা! বিপদ বুঝে তাঁরা জনতাকে নিরস্ত করার জন্য বোমা ফাটাতে শুরু করলেন।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। তারই সুযোগে মাস্টারদারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আত্মরক্ষার পথ করে নিলেন। বেলা একটার সময় তাঁরা 'সুলতান বায়েজিদ্ রোস্তামির মাজার' কাছে 'নাগড়খানা' পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এখানে পরে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদলের এক সংঘর্ষ হয়—এই সংঘর্ষকে আমরা বলবো 'নাগড়খানা পাহাড় খণ্ড-যুদ্ধ'। এখানে পুলিশ পক্ষে একজন হাবিলদার নিহত ও কয়েকজন পুলিশ গুরুতররূপে আহত হয়। মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

মাস্টারদার জীবনে কারাবাস এই প্রথম। পরে অনন্ত সিংহও ধরা পড়েন।

'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ডাকাতি'-র অভিযোগে এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কলকাতা থেকে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এলেন মাস্টারদাদের পক্ষাবলম্বন করতে। অপূর্ব দক্ষতায় তিনি সরকার পক্ষের সমস্ত যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে আসামীদের নির্দোষ প্রমাণিত করলেন। মাস্টারদারা বেকসুর খালাস পেলেন।

বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরাজ সরকার 'বেঙ্গল-অর্ডিন্যান্স' পাশ করে অনেক নেতৃ-স্থানীয় বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৪ খৃঃ ২৫শে অক্টোবর অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, যশোদা চক্রবর্তী, অনিল গুহ, রাজেন দে, নির্ম্মল সেন, প্রবীণ বড়ুয়া প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাস্টারদা যে বাসায় আত্মগোপন করেছিলেন, তার ঠিক পিছন দিকে মিউনিসিপ্যালিটির বড় নর্দমা ছিল। শীতের দিন, নর্দমা শুকনো। পুলিশ তাঁকে ধরবে বলে রাত থাকতেই বাড়ির তিনদিক ঘিরে বসে রইল। মাস্টারদা টের পেয়ে মুসলমানের ছদ্মবেশে ছেঁড়া-ময়লা লুঙ্গী পরে দোতলা থেকে কাপড় বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে বেয়ে বেয়ে নেমে এলেন।

সিপাহীরা সব রাইফেল কাঁধে বসে বসে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল। সেই অবকাশে তিনি পিছন দিকের নর্দমার ভিতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিতে দিতে পালিয়ে গেলেন।

ভোর হ'তেই পুলিশ মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বাড়ীর প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন তল্লাসী করে দেখলো কিন্তু চিড়িয়া তো ততক্ষণে বহুদূর চলে গেছে। অপদার্থ পুলিশ বাহিনীকে বোকা বানিয়ে মাস্টারদা তখন অর্ধেন্দু দস্তিদারের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন।

সহকর্মীরা প্রায় সব জেলে। তিনিও আর চট্টগ্রামে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। চলে এলেন কলকাতায়।

কলকাতাতেও স্বস্তি ছিল না—।

সেখানেও একদিন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। শোভাবাজারে এক বাড়ীতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। থাকতেন তে-তলার একটি ঘরে। একদিন পুলিশ সন্দেহবশে সে বাড়ীতে এসে কড়া নাড়লো। তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে দ্রুত পাইপ বেয়ে তে-তলা থেকে নীচে নেমে চম্পট দিলেন। নামার সময় তিনি পায়ে বেশ চোট পেয়েছিলেন।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি গেলেন শ্যামবাজারে এক আত্মীয়ের বাসায় কিন্তু পুলিশের ভয়ে তারা এমন কি ঘণ্টা খানেকের জন্যও তাঁকে আশ্রয় দিলোনা—অন্ততঃ মানবতার খাতিরেও আহত মাস্টারদাকে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দেবার বিবেকের তাগিদে

পর্য্যন্ত তাঁর আত্মীয়রা সেদিন অনুভব করেনি। দেশের মুক্তি আন্দোলনে যিনি সর্বস্ব দিয়েছেন, যাঁর নির্দেশে শত শত তাজা রক্তের তরুণ প্রাণ নিমেষে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত, সুপ্ত বাঙ্গালীর প্রায় লুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করার কঠোর সাধনায় যিনি আত্মাহুতির ব্রত নিয়েছেন—সেই জীবন-সংগ্রামের মহান্ পথিক সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্য আহত দেহে পথে পথে, দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরে বেড়াচ্ছেন।

শেষে মানিকতলায় এক বন্ধুর বাড়ীতে তিনি তখনকার মত আশ্রয় পেলেন। পরে তিনি ধরা পড়লেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজবন্দী হিসেবে বিভিন্ন জেলে কাটিয়েছেন।

মাস্টারদা যখন জেলে তখন তাঁর স্ত্রী 'টাইফয়েড্' রোগে আক্রান্তা হ'ন। স্বামীর সাহচর্য তিনি বিবাহিত জীবনে কোনদিনই পান্‌নি। মহাসাধক মাস্টারদা ঘর ছেড়েছেন দেশের জন্য। স্বামীর সঙ্গ-বিহীন দুঃসহ জীবন তাঁকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল। পাড়া-পড়শীদের কয়েকজনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাঁকে আরও অতীষ্ঠ করে তোলে। ক্রমশঃই মানষিক পীড়ায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে লাগলেন। জীবনের উপর জাগে তীব্র বিতৃষ্ণা।

বিষাদ জীবনে তিনি মৃত্যুকেই কামনা করেছিলেন। তাঁর সে আশা বুঝি পূর্ণ হ'লো। মৃত্যু তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গুরুতররূপে পীড়িতা পুষ্পকুন্তলা দেবী তাঁর অন্তিম ইচ্ছা জানালেন—মাস্টারদাকে তিনি শেষবারের মত একবার চোখের দেখা দেখতে চাইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যথারীতি আবেদন জানানো হ'লো। মাস্টারদা জারবেদা জেল থেকে 'প্যারোলে' ছাড়া পেলেন একমাসের জন্য। প্রহরাধীন মাস্টারদা বাড়ী এলেন। এই সময় ডি, আই, জি, ও অন্যান্য অফিসাররা তাঁকে সংগ্রামের পথ ত্যাগ করবার জন্য

নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে কিন্তু কাকে তারা প্রলোভন দেখাচ্ছে ?

মাস্টারদা অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধের সঙ্গে তাদের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন।

তিনি যেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী এলেন তার পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর উরুর উপর মাথা রেখে স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দেবী মৃত্যুর পরপারে যাত্রা করলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই মাস্টারদাও প্যারা-টাইফয়েডে আক্রান্ত হ'ন। একেই তো রুগ্ন চেহারা! সুস্থ হ'য়ে উঠলে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পুষ্পকুন্তলা দেবীর মৃত্যুতে শোকাহত হ'য়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা যে কবিতাটি রচনা করে স্মরণ সভায় তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, তা' এখানে তুলে দিলাম—।

অমরার পুষ্প তুমি অমরা ছাড়িয়া
এসেছিলে ধরা-ধামে ক্ষীণ পুণ্যফলে,
কঠোর জীবন-ব্রত নীরবে সাধিয়া
ফিরিলে আজি হে পুষ্পকুন্তলে।
মর্তের লীলা তব থাকিবে স্মরণে
যতদিন থাকি মোরা এই ভব-ভবনে।

* * * *

মাস্টারদা যখন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে গণেশ ঘোষ, নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার ঘটে। এই জেলে মাস্টারদা সম্পর্কে অন্যান্য বন্দীদের কৌতূহল ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। অবাক বিস্ময়ে ও গভীর শ্রদ্ধায় তারা এই মানুষটিকে দেখতো।

বিপ্লবী যুবনেতা নিরঞ্জন সেন তখন তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—।

"মেদিনীপুরে সেণ্ট্রাল জেলে গণেশ সূর্যবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। খুব অমায়িক গণেশের এই মাস্টারদা। তাদের চাঁটগা দলের নেতা অথচ বুঝবার কারুর সাধ্যি নেই। কথায় কোন ঝঙ্কার নেই, কোন ব্যাপারেই যেন নিজেকে জাহির করতে চান না। তাঁর চালচলন দেখে একদিন গণেশকে বললাম —তোমাদের নেতা যে মাস্টারদা এ বোঝার কারু সাধ্যি নেই। নিজেকে একটি বাবের জন্যও সামনে আনতে চান না। গণেশ বলেছিলো—মাস্টারদা ঐ ধরণেরই। আমাদের সব সময় প্রকাশ হওয়ায় পথ করে দেন। কোন কাজে নিজের নাম ছড়িয়ে পড়ুক, এ তিনি চান না"।

এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতেই মাস্টারদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

১৯২৮ সালের একবারে শেষ ভাগে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সকল নেতা ও কর্ম্মীরা কারাগার থেকে মুক্তি পান। সেই সাথে এবং সেই সময়েই মাস্টারদা সূর্যসেন ও চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল বিপ্লবীনেতা ও কর্ম্মীরাও জেল খানা ও আন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। মুক্তির প্রায় সাথে সাথেই মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সিদ্ধান্ত নেন, অবিলম্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদলকে নূতন করে এবং শক্তিশালী করে গ'ড়ে তুলতে হ'বে এবং তার জন্য যত বেশী সংখ্যক সম্ভব যুবক ও ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হ'বে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে মিশতে হ'বে।

এই উদ্দেশ্যে অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে এবং প্রায় তাঁরই একক উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহরে এবং সমগ্র জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু-সংখ্যক ব্যায়ামের আখড়া (ক্লাব) স্থাপন করা হয় এবং স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের স্বাস্থ্য চর্চ্চা ও শরীর গঠণের জন্য ঐ সকল ক্লাবে

আকর্ষণ করা হয়। ঐ সকল ক্লাব থেকেই বিপ্লবীদলের কর্ম্মী ও পরবর্ত্তী সময়ে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর গ্রাম শাখার সৈন্যদের সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এবং শুধু ছাত্র ও যুবক নয়, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ও কার্য্যকরীতার কথা চিন্তা করে বিপ্লবী-নেতৃত্ব স্থির করেন চট্টগ্রামের ব্যাপকতর জনগণের সাথে গভীর এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চট্টগ্রামের কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করতেই হ'বে এবং সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করে—চট্টগ্রাম জেলার কংগ্রেস সংগঠন করায়ত্ত করতে হ'বে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারাগার থেকে মুক্তির পরেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয়—প্রায় সকলেই কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দেন এবং অচিরে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে কার্য্যকরী সমিতিতে প্রবেশ করেন।

বাংলার কংগ্রেস তখন নরমপন্থী ও চরমপন্থী দু'দলে বিভক্ত। ১৯২৮ সালের শেষে কলকাতার পার্কসার্কাসে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। মতিলাল নেহেরু অধিবেশনে সভাপতি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সাবালকত্ব পরীক্ষা করবার, জন্য 'সাইমন্ কমিশন' বসায়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় অপমান কর ঐ সাইমন্ কমিশন বর্জ্জন ও বয়কট করবার জন্য দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানায় এবং ভারতের জাতীয় দাবী স্থির করবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ডাঃ আনসারী, ডাঃ আলম, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

এই কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন তার ভিতর ভারতের আশু জাতীয় দাবী হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতাব

কথা ছিল না, ছিল 'ওয়েস্টমিনিস্টার ধরণের ডোমিনিয়ান স্টেটাসের' কথা অর্থাৎ সীমাবদ্ধ স্বায়ত্বশাসনের কথা।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে পূর্ণ অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনে মতিলাল নেহেরু কমিটির ঐ রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল। ঐ অধিবেশনে গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ নেহেরু কমিটির ঐ রিপোর্ট পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবী (ডোমিনিয়ান স্টেটাস্) গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিবর্গের নিকট আবেদন করেন। সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু নিজের পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করে ঐ রিপোর্টের বিরোধীতা করেন এবং ভারতের আশু দাবী হিসাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গ্রহণের জন্য এক সংশোধনী ঐ অধিবেশনে পেশ করেন। এই বিষয়ে মন স্থির করতে না পেরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ওই রিপোর্ট যেদিন আলোচিত এবং গৃহীত হয় সেইদিন অধিবেশনে আসেন নি।

সামান্য ভোটের ব্যবধানে যেদিন কলিকাতা অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্ট এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবী (ডোমিনিয়ান স্টেটাস্) গৃহীত হয়েছিল কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল করবাব জন্য সেই রাত্রিতে নেতৃবর্গ যে পন্থা এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা' লজ্জার এবং ধিক্কারেব।

যাই হোক, প্রায় অর্দ্ধসংখ্যক প্রতিনিধির দৃঢ় প্রতিরোধ এবং দেশের ব্যাপকতম মানুষের মনোভাব লক্ষ্য করে গান্ধীজী ঐ প্রস্তাবের কার্য্যকারীতা কেবলমাত্র এক বছরের জন্য বলে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে চট্টগ্রাম থেকে অন্যান্যদের সাথে সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং বাংলার সকল বিপ্লবীদলের প্রতিনিধিদের সাথে নেহেরু রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করে

সুভাষ বসুর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

এই কলিকাতা অধিবেশনের পরবর্ত্তীকালে চট্টগ্রামে কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা' খুবই দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের পরে বাংলাদেশের 'যুগান্তর' বিপ্লবীদল সুভাষবাবুকে পরিপূর্ণভাবে এবং সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করে এবং সুভাষ বাবুকেই বিপ্লবী আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। অপর পক্ষে বাংলার 'অনুশীলন' বিপ্লবীদল ঠিক সেই সময়েই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাদের মুখপাত্র হিসাবে দাঁড় করান।

সেই সময়ে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ-নেতৃত্বের একজন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন দক্ষিণ-পন্থী; এবং সুভাষবাবু ছিলেন ঐ নেতৃত্বের বিরোধী এবং সর্ব্বতোভাবে বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক এবং প্রবক্তা এবং এই দু'জন সর্ব্বোচ্চ নেতাকে ভিত্তি করে বাংলার প্রায় সকল রাজনৈতিক কর্ম্মীই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এর প্রভাব চট্টগ্রামে গিয়েও পৌঁছায় এবং এই দু'জন নেতাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের দু'টি বিপ্লবীদলের মধ্যেও কলহ, রেষারেষি, এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে যায়। সেই সময়ে মাস্টারদা সূর্যসেন ও তাঁর বিপ্লবীদল কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষবাবুকে সমর্থন করেছেন এবং চট্টগ্রামের অনুশীলনদল যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করেছে।

১৯২৯ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সংগঠনের এক নির্ব্বাচনী সভায় মাস্টারদার বিপ্লবীদলের সাথে অনুশীলন দলের কর্ম্মীদের প্রথমে কলহ ও পরে প্রচণ্ড মারামারি আরম্ভ হয়ে যায় এবং সেই সংঘর্ষে বিপ্লবীদলের সুখেন্দু দত্ত নামে অষ্টম শ্রেণী একটি ১৪ বছর বয়স্ক বালক গুরুতরভাবে ছুরিকাহত হয় এবং মাস্টারদা স্বয়ং আহত হন।

সুখেন্দুর অবস্থার অবনতি হবার পর সুখেন্দুকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরে সুখেন্দু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে।

সুখেন্দুর শবদেহ নগ্নপদে বহন করে সেদিন সুভাষচন্দ্রও শ্মশান-ঘাটে গিয়েছিলেন।

সূর্যসেন চট্টগ্রামের বিবদমান দু'টি ছাত্র-সংগঠনের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হ'ন। সূর্যসেনের সহজ সরল মধুর ব্যবহার, হৃদয়বত্তা ও দক্ষ সংগঠন ক্ষমতা এক আশ্চর্য্য তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভণ্ডামির মুখোশ পরিধান করে ক্ষমতা গ্রহণের নির্লজ্জ অভীপ্সা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন সৎ একনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্ম্মী। তাঁর এই দুর্লভ গুণাবলী বার বার তাঁকে নেতৃত্বের ডাক দিয়েছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্মতৎপরতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর উদার ও মহানুভবতার পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ—সকলের মধ্যে তাই তিনি নিজের নেতৃত্বকে সুদৃঢ়—আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

স্বাধীনতাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন-সংগ্রামই ছিল তাঁর মতে একমাত্র পথ। এই চলার পথে বার বার বাধা এসেছে, নানা বিঘ্ন ঘটেছে কিন্তু তিনি ত'াতে কিছুমাত্র বিচলিত হননি। বাধাকে বাধা মানেননি—কোন প্রতিবন্ধকতায় তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর এই চলার পথে তিনি কখনও পথভ্রষ্ট হননি—তিনি হননি আদর্শচ্যুত—ধৈর্য্যে স্থৈর্য্যে অটল এই মানুষ ছিলেন বিপ্লবের মহাসাধক।

১৯২৯ খৃঃ মে মাসে চট্টগ্রামে সূর্যসেনের উদ্যোগে চারটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। জিলা কংগ্রেস সম্পাদক সূর্যসেন 'রাজনৈতিক সম্মেলন' আহ্বান করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেন। দু'টি ছাত্র-সংগঠনের যুক্ত উদ্যোগে 'জিলা

ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন' আহ্বান করা হ'লো। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক নৃপেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে চাকরী ছেড়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 'জিলা যুব সম্মেলন'-এ সভাপতিত্ব করেন বহু লাঞ্ছিত বিপ্লবীনেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। লেডি ডাক্তাব সুশীতলবালা মুখার্জীর আহ্বানে ডাকা হ'লো 'জিলা নারী সম্মেলন'। তা'তে সভানেত্রী হয়ে আসেন তখনকার নারী আন্দোলনের বিশিষ্টা নেত্রী লতিকা বসু। চট্টগ্রামের এই চারটি সম্মেলনই সূর্যসেন ও তাঁর অনুবর্তীরা পরিচালনা করেন।

এ সব সম্মেলনের আয়োজন ও পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীর সর্বাধিকনায়ক ছিলেন গণেশ ঘোষ ও তাঁর সহকর্ম্মী ছিলেন অনন্ত সিংহ।

১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসাবে স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালন করার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সম্পাদক সূর্যসেন 'স্বাধীনতা দিবসে' পতাকা উত্তোলন এবং অন্যান্য কর্মসূচী পালনের আয়োজন কবেন। এই তারিখে বৃটিশ সবকার সারা ভারতে স্বাধীনতা-সঙ্কল্প পাঠরত অগণিত নিরস্ত্র নিরীহ মানুষেব উপর অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্য্যাতন শুরু করে—।

গভীর চিন্তা, গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা ও দীর্ঘ আলোচনার পর মাস্টারদা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কয়েকটি কুখ্যাত অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসককে হত্যা করলে কিম্বা তাদের কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন কোন স্থানে সাম্রাজ্যবাদের শাসন ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত করা অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে একটি

জেলায়, চট্টগ্রামে, সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম জেলাকে সাময়িকভাবে, অল্প কিছুদিনের জন্য হ'লেও যদি সাম্রাজ্যবাদের শাসনমুক্ত, স্বাধীনমুক্ত অঞ্চলে পরিণত করা যায়, তা'হলেও সেই সামান্য সাফল্যই সংগ্রামোন্মুখ জাতিকে প্রচণ্ড উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে এবং মুক্তিকামী ভারতবাসীর নিকট তাই হ'বে একটি অনুকরণীয় বাস্তব আদর্শ।

এই সিদ্ধান্তের ফলে কিন্তু সূর্যসেন, নির্মলসেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ নেতারা কখনও ভাবেননি যে, নিজেদের শক্তিবলে চট্টগ্রামকে বৃটিশ কবলমুক্ত-করার দ্বারা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'বে—। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের বজ্রকঠিন সংগ্রামের পথে এক প্রেরণাদায়ক দেশ-প্রেমের নজির সৃষ্টির জন্যই চট্টগ্রামের বিপ্লবী মুক্তিসেনারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সুপরিকল্পিত এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

১৯২৯ সালের শেষ ভাগে কংগ্রেস অধিবেশন 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর দাবী জানিয়েছে। কিন্তু সেই স্বরাজ লাভের জন্য দুঃসাহসিক যে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সে গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নেবার মত দুর্ব্বার তরুণশক্তি কোথায়?

অধীর জনতা বিচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় গণ-সংগ্রামের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত।

নেতা সর্ব্বাধিনায়ক সূর্যসেনের নির্দেশনায় জাগ্রত যুবশক্তি "ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান আর্মি-"র অধীনে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। সূর্যসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন নির্মলসেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, এবং অনন্ত সিংহ। আর তাঁদের সাথে ছিলেন মৃত্যুপণ করা তরুণদল যাদের মধ্যে 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান তারই লাগি কাড়াকাড়ি'।

স্বাধীনতার স্বপ্নে মুক্তি নেশায় উন্মত্ত এই মুক্তিসেনার দল।

প্রাণের বিনিময়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা যে কোন সময় প্রস্তুত। যারা আঘাত হানবার জন্য দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধেছে, শৃঙ্খল ভাঙ্গবার উন্মাদনায় যারা অধীর—তারা কংগ্রেসের নৈতিক চেতনা বা অহিংসা নীতির চুলচেরা বিচারে আগ্রহী নয়, পরাজয়ের গ্লানিকে তারা কিছুতেই মানতে পারে না।

"দেশের মুক্তিযজ্ঞের যূপকাষ্ঠে আত্মোৎসর্গের গৌরব ঘোষণা করেই হ'বে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। পরাধীনতার লৌহ কারায় অবরুদ্ধ সঙ্কুচিত ভীত জীবনে মরণের মহাশঙ্খধ্বণিতে ঘোষিত হ'বে জাগরণের এবং জীবনের জয়গান—শৃঙ্খলমুক্ত জীবনে লাগবে জীবনের দীপ্ত পরশ, মুক্ত দীপ্ত প্রাণ ছুটে যাবে মরণকে আলিঙ্গন দিতে—এ জীবন-মরণের মোহনা থেকে শুরু হ'বে আমাদের জীবনেব জয়যাত্রা।"—সংগ্রামেব দুর্গম-পথে, যাত্রার পূর্বে মুক্তিসেনারা এই সঙ্কল্পে নিজেদের দীক্ষিত কবলো। ভেতো বাঙালী বলে যাদেব অপবাদ আছে, ভীরু বাঙালী বলে, কাপুরুষ বলে যাদের তীব্র উপহাস কবা হয়, সেই বাঙালী তরুণদল দুঃখ-দহন পায়ে মৃত্যুকে ভ্রূকুটী করে মরণ-মারণের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে চলেছে বিপদসঙ্কুল ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে। ভাবতেও অবাক লাগে, ভাবতেও আনন্দে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। ধূসর পথের যাত্রী এরা—

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,—
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

বিপ্লবীদলের পক্ষে এসময় কঠিন অগ্নিপরীক্ষার কাল। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের হিসেবী কার্য্যক্রমে কোন কোন প্রদেশে, দলের নেতাদের মধ্যে নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবের নীতি

সম্পর্কে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাছাড়া পর পর কয়েকটি ব্যর্থতার পর সমস্ত প্রদেশে একযোগে বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কেও সন্দেহ স্বাভাবিক কারণেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এমতাবস্থায় সীমাবদ্ধ এলাকায় অস্ত্রাগার, ট্রেজারী আক্রমণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করা এবং শাসনযন্ত্র "ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি"-র দ্বারা অধিকার করার কার্য্যক্রম গ্রহণ করাই অধিকতর কার্য্যকরী বলে মনে হয়েছিল।

অসহযোগের শুরুতে গান্ধীজী চট্টগ্রামের আন্দোলনকে প্রশংসা করে বলেছিলেন—"Chittagang to the fore"—আবার সেই বাণী সার্থক করার দিন এলো। ১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল মহিমচন্দ্র দাসের সমর্থক কংগ্রেস কর্মীরা কুমিরা সমুদ্র তীরে লবন তৈরী আন্দোলন শুরু করলো।

এই সময়ে দেশের সর্ব্বত্র লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, ও কলিকাতায় রাজদ্রোহ আইন অমান্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চট্টগ্রামের কিছু মানুষ চাইলেন চট্টগ্রামেও অবিলম্বে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হোক্। জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ না করলে সন্দেহ সৃষ্টি হ'তে পারে মনে করে মাস্টারদা ও আরও কয়েকজন একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন ঃ—

"দেশের দিকে দিকে তূর্য্যধ্বনি শোনা যাইতেছে, সর্ব্বত্রই আইন অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যে চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরোভাগে, আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। এই জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য এক সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি কি করে তাহা দেখিবার জন্য আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিব। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবণ আইন ছাড়া অন্য আইন যেমন রাজদ্রোহ আইন

অমান্য আরম্ভ হইয়াছে। কাল-বিলম্ব না করিয়াই আমরা আগামী ২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য আন্দোলন করিব স্থির করিয়াছি। ইহার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই, লোক ও টাকা চাই।"

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ,
লোকনাথ বল প্রমুখ—সদস্য।
"চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি"।

এই ইস্তাহার প্রকাশের ফলে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের উপর থেকে স্বভাবতঃই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের নজর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। তারা পূর্ব্বের ঘাঁটিগুলোর কার্য্যকলাপ ও পাহারার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা দেখালো। এই শৈথিল্যের ফলে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতায় আরও সুবিধা হোল।

চট্টগ্রামের জিলা কংগ্রেস অফিস। নেতা সূর্যসেনের আমন্ত্রণে বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মীরা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হ'য়েছেন। অনতিবিলম্বে এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে ইংরেজের শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হ'বে—এই ছিল সেদিনের আলোচনার মুখ্যবিষয়।

সংগ্রামের জন্য চাই গণ-সমর্থন ও স্বদেশ-প্রেম।

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সংগ্রামী মন ও সংগঠন।

যারা চলে তাদেরই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ।

বিপ্লবীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, গণবিক্ষোভের স্রোতধারায় বিপ্লবকে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে। জীবনের সর্বস্ব এই যাত্রাপথে নিঃশেষ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে বাংলার বিপ্লবী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করে রাখবে—এই ছিল বিপ্লবীদের মত ও পথ।

সেদিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ভারতের স্বাধীনতা-স্বপ্নে বিভোর একদল যুবকের মিলন ঘটেছিল এক নির্জন কক্ষে। অতি

সাধারণ বলে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু ইহা স্ফুলিঙ্গের মত ক্ষুদ্রাকৃতি হ'লেও তার অন্তরে যে তীব্র বহ্নির দাহিকা-শক্তি ছিল তা'কে কি অস্বীকার করা যায়? ঈশান কোণে যে মেঘ ক্ষুদ্র কলেবর নিয়ে জমে ওঠে প্রকৃতির এক অলিখিত নির্দেশে তাই ক্ষণিকের মধ্যেই প্রকাণ্ড দৈত্যের চেহারা নিয়ে সারা আকাশ সীমানায় যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে কী প্রচণ্ড দাপা দাপিই না শুরু করে!

সেদিনের বৈঠকে নেতা সূর্যসেন, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, ও অনন্ত সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

নেতা সূর্যসেন তাঁর সংক্ষিপ্ত সরল যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মীদের বুঝিয়ে দিলেন যে, কংগ্রেসের সংগ্রামের আহ্বানের মধ্যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রকৃষ্ট নয়। কংগ্রেসের সংগ্রামের পরিকল্পনায় বিপ্লবীদের সমর্থনও ভাবগত যোগাযোগ থাকলেও কর্মসূচীর পটভূমিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান এবং তা থাকবেও। ক্ষেত্রবিশেষে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন কখনও দুর্বার গতি ধারণ করতে পারে আবার কখনও বা আপোষের শ্লথ-গতিতে শম্বুকের মত চলতে পারে—ইহা স্বাভাবিক, ইহা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়।

কিন্তু তিনি বললেন—"বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান লক্ষ্য প্রাণের চির নিবেদনেও সামাহারের স্তরে পৌঁছায় না, সেখানে শত্রুর সঙ্গে আপোষের কোন পথ খোলা থাকেনা—সেখানে একমাত্র সমাধানের পথ—সংগ্রাম। শত্রুর সঙ্গে একমাত্র আপোষ মৃত্যুতে, বেঁচে থাকতে নয়। শোনিত-লেখায় একদল ইতিহাস সৃষ্টি করে যায়। অন্যদল পথ বেঁধে যায়, উত্তরসূরীরা সেই পথে রক্তের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলে, একই পথের উপর কখনও ঘুরে-ফিরে পাক খায়না—পাঁয়তারা কষে না। বিপ্লবী ঐতিহ্য যাদের হাতছানি দিয়ে ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট কাঁটা-পথে টেনে নিয়ে যায়,

যারা আদর্শের হোমাগ্নিশিখায় যাত্রাপথকে আলোকিত করে, তাদের উত্তর সাধকেরা যাত্রার শেষ কোথায় না জানলেও কখন মধ্য অঙ্কে অভিনয় শেষ করে না। ইহা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিপন্থী।"

মাস্টারদার এই অগ্নিময় বাণী তরুণ দেশপ্রেমিকদের মধ্যে প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চার করে এবং প্রাণ-প্রবাহের সেই উত্তাল তরঙ্গ বৃটিশ শাসকদের সিংহাসনের তট-ভূমিতে বার বার আঘাত হানবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

প্রকৃতিগতভাবে দুঃসাহসী ও দুর্দ্দান্ত এই যুবকদল অসাধ্য সাধন করতে পারে। 'সুইসাইড্ স্কোয়াডের' মত যেকোন সময় মৃত্যুর করাল মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—নেতারা তা' ভালভাবেই জানতেন।

গভীর ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অসীম আত্মশক্তির উপর দৃঢ়-প্রত্যয় নিয়ে মাস্টারদা চট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্রে 'সশস্ত্র বিপ্লবের' প্রস্তুতি গোপনে পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সঙ্ঘ-গঠন, ইহার প্রসার ও অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন—একথা আগেও বলেছি। এবং আরও বলেছি যে, বাধ্য হ'য়েই বিপ্লবী ভাইয়েরা স্বদেশী ডাকাতিতে নেমেছিল।

তবে মাস্টারদা স্বদেশী ডাকাতি শুরু করবার আগে তাঁর দলের কর্মীদের স্বার্থত্যাগের নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রথমে নিজের পরিবারবর্গের অর্থের উপর হস্তক্ষেপ করতে বলেন—নতুবা অন্যের সঞ্চিত অর্থের উপর হস্তক্ষেপ করবে কোন্ নৈতিক অধিকারে?

এই ব্যক্তিগত চেষ্টায় সঞ্চয়ের কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

দলের বিশিষ্ট নেতা অনন্ত সিংহ একদিন তাঁদের লোহার সিন্দুক থেকে কয়েক হাজার টাকা এনে মাস্টারদার হাতে তুলে দিয়ে শুধু মাস্টারদার নির্দেশই পালন করলেন না বরং এ ব্যাপারে

দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে অন্যান্য সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করলেন। ক্রমে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নির্মল সেন, লোকনথ বল প্রমুখ নিজের সাধ্যমত পারিবারিক সঞ্চয় দলের ধনভাণ্ডারে অর্পণ করে অনুবর্ত্তী কর্মীদের মধ্যে ত্যাগের বাস্তব নজির দেখালেন। ফলে শহরে-মফঃস্বলে কর্মীদের মধ্যে গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের প্রবণতা দেখা দিল।

শ্রীপতি চৌধুরী দলের একজন কর্মী। জমিদারের ছেলে। চট্টগ্রামের কক্সবাজারে তাদের জমিদারী আছে। একদিনের একটি ঘটনা। সেদিন একটা টেলিগ্রামে খবর এলো যে, তাদের কক্সবাজারের জনৈক কর্মচারী ১৮ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে আসছে। এমনই ভগবানের ইচ্ছা যে, ভাগ্যক্রমে ঐ টেলিগ্রাম শ্রীপতির হাতে পড়ে। টেলিগ্রাম পড়েই সে সাইকেল নিয়ে ষ্টীমারঘাটের দিকে রওনা হয়।

ষ্টীমার ঘাটে ভিড়লে কর্মচারীটি ষ্টীমার হ'তে নেমে স্বয়ং জমিদার পুত্রকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। জমিদারের পুত্র ইতিপূর্বে তা'কে নিতে কখনও তো আসেনি! তাছাড়া এত কর্মচারী থাকতে জমিদারবাবু তাঁর ছেলেকেই বা পাঠাবেন কেন? শ্রীপতি আর দেরী না ক'রে কর্মচারীটির বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই টাকার থলিটি নিয়ে সাইকেলে উঠে চম্পট—সোজা দলের আস্তানায় এসে উপস্থিত।

কর্মচারীর মুখে পরে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে জমিদরবাবু যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন তা' সহজেই অনুমেয়।

মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী মহেন্দ্র চৌধুরী। শহরে এদের বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। ছাত্র-সমাজে অত্যন্ত প্রিয় বুদ্ধিমান সাহসী এই ছেলেটি বার বার সংগঠনের প্রয়োজনে নিজেদের অর্থের সঞ্চয় দলের নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দিয়েছে। এই ঐকান্তিকতা, এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত আজকের দিনে

শুধু দুর্লভই নয়—চিন্তারও বাইরে।

একদিনের ঘটনা বলি। মহেন্দ্র চৌধুরী দলের কর্মীদের সঙ্গে বন্দুক চালনা অভ্যাস করছিল। এমন সময় নেতা নির্মল সেন দ্রুত ঘরে ঢুকে মহেন্দ্রকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন। মহেন্দ্র অনেকটা এই ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়।

নির্মল সেন নির্দেশ দিলেন—'পরশু সকালের মধ্যে আমাদের অন্ততঃ এক হাজার টাকা দরকার, অন্যথায় আমাদের খুবই অসুবিধা ও ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। তুমি যেখান থেকে যেভাবে পারো এই সংগ্রহ করে আনো।'

সৈনিকের কাছে এ-যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির নির্দেশ।

সেখানে সৈনিকের মনে বিচার বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নেই, কোন তর্ক কোন অক্ষমতা বা দ্বিধার স্থান সেখানে নেই—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের একমাত্র কর্ত্তব্য সেনাপতির আদেশ পালন আর প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুবরণ। যুদ্ধের তাই নীতি—

'There's not to make reply,
There's not to reason why,
There's but to do and die.'

মহেন্দ্রের অন্তরের সর্বত্র এই মহামন্ত্র অনুরণিত হ'তে লাগলো। হাজার টাকার অভাবে মাস্টারদার স্বপ্নের সাধনার বিপ্লবের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি হবে? না—তা' সে কিছুতেই হ'তে দেবে না। গভীর সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মহেন্দ্র গ্রামের পথে একাকী পা বাড়ালো।

মাথার মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে নানান চিন্তা যেন হাতুড়ী পিটছে।

সেখানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিন্তার ছড়াছড়ি। সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে সে রাত ন'টার পর বাড়ী ঢুকলো এসে।

পারিবারিক সঞ্চয় আছে ব্যাঙ্কে, ব্যবসায়ে আর মেয়েদের গহনাদিতে। নাগালের বাইরে আছে বলে কৈফিয়ত দিয়ে নেতার কাছে আত্মিক দুর্বলতাকে ঢাকা যায় কিন্তু নিজের বিপ্লবী-মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি? নিজের অক্ষমতা কর্ত্তব্যে অবহেলা বার বার বিবেককে দংশন করবে না কি? উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপরিহার্য্য আবশ্যকতাকে সার্থক করার চেষ্টার জন্যই তো আজ সে সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য্য বিবেচনাকে পিছনে ঠেলে ফেলে রেখে এসেছে।

সেদিন সংক্রান্তি—পরদিন শুভ নববর্ষ। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনের মধ্যে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে। মহেন্দ্রের এই আনন্দোৎসবে চরম নিষ্ক্রিয়তা তার মায়ের চোখে ধরা পড়ে। ছেলের হাব-ভাব দেখে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন।

কি যেন চাই-চাই, কি যেন নাই-নাই—এমন একটি উন্মনা ভাব মহেন্দ্রের মধ্যে। এ আনন্দের জোয়ারে তাই সে স্তিমিত চিন্তিত।

পরদিন। গত রজনী বিনিদ্র কেটেছে। চোখে-মুখে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। তারপর রাত। এই সুযোগে মহেন্দ্র তার বড়দার টাকা-ভর্তি স্যুটকেশটি হাতে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে চাদরে গা-ঢাকা দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এক নির্জন জায়গায় স্যুটকেশটি ভাঙলো। গুণে দেখলো তা'তে ১৭শ' টাকা আছে।

এত টাকা হাতে পেয়ে তখন তার কী সে আনন্দ!

কর্ত্তব্য-কর্মের সফলতায় কী সে তৃপ্তি!

সেই রাত্রেই সেই টাকা কর্ত্তব্যপরায়ণ মহেন্দ্র নেতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে। মহেন্দ্রের উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা নেতৃবৃন্দের ছিল। মহেন্দ্রের সেই টাকায় দলের জন্য নূতন শেভ্রোলেট্ গাড়ীখানি ক্রয় করা হয়।

জীবন ঘোষালের টাকা সংগ্রহের ঘটনাটি রীতিমত রোমাঞ্চকর।

জীবন চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। দলের বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে তার সুনাম আছে। ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র জীবন 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের' কাউন্টারে একদিন ৫ হাজার টাকার একটি বেয়ারার চেক নিয়ে হাজির। যথারীতি চেক জমা পড়লো। ক্যাশিয়ার চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা গুণছে। গুণতে গুণতে ১৬০০৲ পর্যান্ত গুণেছে এমন সময় বেয়ারার চেকে এত টাকা তোলায় তার মনে সন্দেহ জাগে এবং সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য জীবনের বাবার কাছে ফোন করতে কাছের টেলিফোনটি তুলে ধরে।

জীবন প্রমাদ গুণলো।

আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করে সে ঐ ১৬০০৲ টাকাই কাউন্টার থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বাইরে অপেক্ষমান গাড়ীতে চেপে উধাও হ'য়ে গেলো।

যাই হোক, পরে জীবনের বাবা যশোদা ঘোষাল মশাই পুত্রের—এই অর্থ-অপহরণের দায় নিজে গ্রহণ করেছিলেন।

অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে দরিদ্রতম কর্মীটিরও নিঃস্বার্থ দান শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, নিঃসন্দেহে স্মরণীয়ও বটে! মনোরঞ্জন সেন ও বীরেন দের নাম এখানে উল্লেখ করতেই হয়।

এই বীরেনের মহান্ হৃদয়বৃত্তির কথা মাস্টারদা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতেন।

বীরেন ছিল চট্টগ্রামের শহরের জে, এম, সেন স্কুলের ছাত্র। তার বাবা পেশায় একজন ঘরামী অর্থাৎ খড়ের বা শণের ঘর-ছাউনির কাজ করতেন। দিন মজুরীর সামান্য আয়ে অত্যন্ত কায়ক্লেশে তিনি সংসার প্রতিপালন করতেন। অতি কষ্টে থেকেও তিনি বীরেনের লেখাপড়া বন্ধ করেননি। তবে নিয়মিত বেতনদান ও পাঠ্যবই কিনে দিতে পারতেন না।

দারিদ্র্য বীরেনের প্রাণের উচ্ছলতায় বালুচর সৃষ্টি করতে

পারেনি বরং জীবন-সংগ্রামে প্রাণান্তকর ক্লেশভোগের মধ্যে তার মন ও দেহ যে কোন ক্লেশ-স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিল।

অফুরন্ত প্রাণের অধিকারী সহজ সরল অথচ তেজোদীপ্ত এই বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান কর্মীটি অনায়াসেই দলের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল।

অর্থ সংগ্রহের বিরাট প্রচেষ্টা চলছে প্রতিটি সহকর্মীর মধ্যে—সে দরিদ্র বলে অক্ষম বলে একেবারে নির্বিকার হ'য়ে বসে থাকবে? মনটা তার দারিদ্রেব যন্ত্রণায় গুমরে উঠলো। দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনকে বার বার ধিক্কাব দিল, অভিসম্পাত দিল। সে জানে তাদের সংসারে সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই শুধুমাত্র সদ্য বন্ধক থেকে মুক্ত করে আনা তার মায়ের ক' গাছি রৌপ্যালঙ্কার ছাড়া। চিন্তাক্লিষ্ট বীরেন কিছুটা আশান্বিত হ'লো।

এখন কর্মক্লান্ত তার পিতা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। এই তো সুবর্ণ সুযোগ! বীরেন অতি সন্তর্পণে তার মায়ের ঐ ক' গাছি রৌপ্যালঙ্কার ভাঙ্গা বাক্স থেকে অপহরণ করে সদর রাস্তায় এসে নামলো।

কাক-আঁধারি অন্ধকার। ভোরের এখনও দেবী। বাস্তা নির্জন। ফুটফুটে সকালের আলোর অপেক্ষা না করেই সে ছুটে উপস্থিত হ'লো এসে মাস্টাদার ঘরে। অফুরন্ত উৎসাহ ও আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়াবেগে সে মাস্টারদার হাতে তার পরিবারের শেষ সম্বলটুকু তুলে দিলো।

মাস্টারদা নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। আনন্দে ভালবাসায় বীরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তিনি সেই অলংকারগুলো সযত্নে গ্রহণ কবে বীরেনকে বললেন—"বাজারে ইহার পণ্যমূল্য হয়ত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু যে অমূল্য মহাপ্রাণতায় তোমার দান সমৃদ্ধ তার সঙ্গে আর কারও দানের তুলনা হয়না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার আদর্শ সাধনে

সফলকাম হও।”

মাস্টারদার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে এই অতি দরিদ্র কর্মীটির মুখের দিকে তাকিয়ে। তিনি সস্নেহে বীরেনের হাতে সেই অলঙ্কারগুলো তুলে দিয়ে আবার বললেন—

“দুঃখ পেয়োনা ভাই। মায়ের এই শেষ সম্বল কেড়ে নিতে নেই—এতে আমাদের অকল্যাণ হ'বে। রিক্তা জননীর আশীর্ব্বাদ আমাদের যাত্রাপথের অমূল্য পাথেয় বলে জেনো।”

মাস্টারদা যে কত মহানুভব, কত দরদী মনের ছিলেন তার পরিচয় আবারও আমরা এই ছোট ঘটনাটি থেকে লাভ করি। এ রকম অসংখ্য ঘটনা তাঁর কর্মময় জীবনে ছড়িয়ে আছে।

আরেক দিনের ঘটনা বলি।

মাস্টারদা বসে আছেন দেওয়ান বাজারে একটি ঘরে। তাঁর দলের বিশিষ্ট কর্মীরাই শুধু আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ-পরামর্শাদি করতে।

একদিন সন্ধ্যের সময় সহনেতা গণেশ ঘোষ এসে উপস্থিত। মাস্টারদা ভগ্ন-কুটীরের মলিন শয্যায় যেন ধ্যান-গম্ভীর ঋষির মত বসে আছেন। শ্রীঘোষকে দেখেই তিনি একটু মিষ্টি হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাছে ডাকলেন। মাস্টারদার শুকনো মুখ দেখে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হ'লো।

গণেশ ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন—মাস্টারদা! আপনার ঘরে আজ রান্নার কোন লক্ষণই দেখছি না। আপনি কি তা'হ'লে আজ উপোস ক'রে আছেন?

মাস্টারদা হেসে বললেন—মুখ শুকনো না-খাওয়ার জন্য নয়, তবে তোমার অনুমান ঠিকই। আজ আমার কিছু খাওয়া হয়নি। ঘরে চাল-ডাল বলতে কিছু নেই। যা' ছিল সকালে ভিখারীদের দিয়ে দিয়েছি। ওরা তবু দুটি খেয়ে বাঁচুক।

গণেশ ঘোষ তখন নিজে ভাত-তরকারী এনে মাস্টারদাকে

সে রাতে খাওয়ান। তিনি যদি ভাগ্যক্রমে না আসতেন তা'হ'লে তো মাস্টারদার সারাটা দিনই উপোসে কাটতো!

নিজের সব কিছু নিঃশেষ করে দিয়েও যেন ওঁর শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। পরের জন্য নিজের সবকিছু অকাতরে বিলিয়ে দেবার মহান্ ব্রতে তিনি ব্রতী। এই সাধক বিপ্লবী-বীরের মহাপ্রাণতার তুলনা নেই।

নেতা সূর্যসেন শুধু কংগ্রেসের আন্দোলনের উপর নির্ভর করে কখনও বসে থাকেননি। কংগ্রেসকে সামনে রেখে বরাবরই তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে এসেছেন।

কর্মীদের মধ্যে আসন্ন অভ্যুত্থানের জোর প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হ'লো।

একদল চললো দলের জন্য সং বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্মী সংগ্রহের জন্য, একদল দায়িত্ব নিল বৃটিশের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটির গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের, অন্য আরেক দল অস্ত্রাদি সংগ্রহ ও বোমা তৈরীর কাজে মনোযোগ দিল। তা'ছাড়াও মাস্টারদার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় একদল বিশ্বস্ত অনুগামী অস্ত্রাগার সমূহের অবস্থা, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয়, অস্ত্রাদি-গোলাবারুদের পরিমাণ, ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর ভিতরের সংবাদ, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রক্ষাদির গোপন তথ্য সংগ্রহ করে চললো। অত্যন্ত সর্তকতা ও নিপুণতার সঙ্গে এই প্রশংসনীয় উদ্যম চললো সরকারী চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

পুলিশ লাইন অস্ত্রাগার ও অক্সিলিয়ারী অস্ত্রাগারের খবর সংগ্রহের গুরু-দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। পুলিশ লাইনের কাছের পাহাড় থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন স্থান হ'তে দূরবীণ দিয়ে দেখতেন প্রহরীদের অবস্থান ও অন্যান্য

খুঁটিনাটি বিষয়। পরে তাঁরা ছদ্মবেশে পুলিশ-লাইনের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরিচয় জমাতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুদিনের যাতায়াতের দ্বারা কৌশলে ভিতরের সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেন।

অক্সিলিয়ারী অস্ত্রাগারের খবর সংগ্রহের জন্য তাঁরা দিন সাতেক ঘোরা-ফেরা করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রাগারেব প্রয়োজনীয় যাবতীয় খবর হস্তগত করেন। শুধু তাই নয়, তাঁবা অস্ত্রাগাবের দরজার ও তালার ফটো পর্য্যন্ত তুলে নিয়ে এলেন গোপনে।

শহরের বাইরে দূর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে, নির্জন নদীর তীরে, পাহাড়ের ঢালু জায়গায় অনন্ত সিংহের পরিচালনায় বিপ্লবী শিক্ষার্থীদেব সমরাস্ত্র ব্যবহারের পুরোদমে শিক্ষা চলতে লাগলো। ইংরেজেব 'অস্ত্র-আইন' ভারতবাসীকে শুধুমাত্র নিরস্ত্রই করেনি, তাদের সম্পূর্ণভাবে অক্ষম ও অসহায় করে বেখেছিল। এই ভীতিপ্রদ অবস্থার মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ যেখানে অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার ছিল, সেখানে সেইসব অস্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষাদান নিতান্তই দুরূহ কাজ ছিল। এই ব্যাপারে শুধু পুলিশই ভয়ের কারণ ছিলনা, প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এই প্রস্তুতি চালাতে হ'য়েছিল। কাবণ সামান্যতম বিচ্যুতি বিশ্বাসঘাতকতা যেকোন সময়েই চবম বিপর্যায় ডেকে আনতে পারে।

গণেশ ঘোষের তত্ত্বাবধানে গোপন কেন্দ্রগুলোতে বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা তৈরীর কাজ সুষ্ঠভাবে চলতে লাগলো। এ কাজে তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের অবদান অনস্বীকার্য।

বোমা তৈরী করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ গুরুতররূপে আহত হয়। তা'কে সঙ্গে সঙ্গে গোপন আস্তানায় স্থানান্তরিত করা হোল।

পুলিশের কাছে এই ঘটনার বিবরণ পাড়ার কয়েকজন পুলিশের দালালের মারফত পৌঁছে যায়। তারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে

এই একটিমাত্র ঘটনাতেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ শাসকের পুলিশ বাহিনী কত ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল তা' নিম্নোদ্ধৃত তাদের গোপন সার্কুলারের মধ্যেই প্রমান পাওয়া যায়।

"Confidential"

Mobilisation of all forces to combat the present movement.

"I want all officers to realise that the present political agitation is fast becoming of a nature where secret organisation are gaining a considerable following. In fact, the position in Chittagong has reached the stage where the District Intelligence Branch Staff however it might be augmented are unable to cope with the activities of certain secret organisations.

There is evidence on record that the secret organisation has been extended throughout the District. From a total lack of information received from uninformed branch of the force, I am compelled to have come to the conclusion that the opinion widely exists that this branch of the force appear to hold that discovery or check of secret organisation is not within their duties.

I wish to state most explicitly that this is a totally wrong idea and should say that should this idea be allowed to continue there will come a time when even the constable will find himself the

recipient of most horrible awakening at the hands of some misguided youth of the party in the shape of outrage.

It is upto all ranks down to constable to have his eyes and ears open and to know who are the persons concerned in this agitation. They should make it their duty to be able to know them by sight, know their houses, haunts and associates, so that when occasion arises they can identify them and report their movements.

As far as the town of Chittagong is concerned all ranks of the uninformed force should immediately be helped to get to know the leading political suspects and the specially active persons. This will be done by all Officers, botaining their names from Dy. S. P. Officers and with them arrange to get to know there persons, appearances, their; present houses and the houses of those with whom they are seen to associate. After this all constables and head constables will be made to get to know them and the instruction will be given to constables on beat, patrol and the traffic duty to invariably note the time, direction they take should they pass their posts These reports will be handed over to D. S. P. Special note should be made of the facts if they are seen meeting in any particular place, passing

the particular road, loitering or examining any particular place. Their movements and meetings or those of strangers should be particularly watched. If they are found meeting any person and after conversation separatin, names of the persons met with should be ascertained. In this way much useful information will be collected. The names of constables who put in particular intelligent report will be recorded and useful information attained will be rewarded. Plain clothes work amongst constables of a purely volunteer nature will be specially recognised.

The D. I. B. will supply the names of known organisers and the local police officer should interest their constables to work in the same lines as the town police.

In conclusion I wish to inform all officers and men that in their own interest and safety they should use their eyes and ears and brain and supply all informations that they possibly can obtain so that in the event of any outbreak of any terrorist activity all ranks will be prepared to help in taking immediate action.

To have a complete list of the suspects marked and to have all their homes and haunts marked down will prove of great advantage in the case of round-up. I trust therefore that in

their own safety all ranks of uniformed branch will in future look upon the detection of political activities as one of their most important duty. Good and intelligent work will be noticed and when possible rewarded.

J. R. Johnson
S. P. 10/2/30

এস্, পি, জনসন্ সাহেবের এই সার্কুলার পাবার পর পুলিশ মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সমগ্র পুলিশ দপ্তর অত্যন্ত তৎপর ও সক্রিয় হ'য়ে উঠলো। পুলিশ গুপ্তচরে সারা চট্টগ্রাম ছেয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্রগুলোতে হানা ও খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ এত পরিশ্রম করেও সন্দেহজনক কোন প্রমান পেলনা। তাদের তল্লাসী শুরু হবার আগেই বিপ্লবীরা সতর্ক হ'য়ে যায় এবং প্রমানপত্রাদি অন্যত্র সরিয়ে ফেলে।

ইতিমধ্যে আরেক দুর্ঘটনা ঘটে।

তারকেশ্বর দস্তিদার ও অর্ধেন্দু দস্তিদার বোমা তৈরী করতে গিয়ে গুরুতররূপে আহত হ'য়ে পড়ে। নেতারা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি চালিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। পুলিশের তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য তাঁরা আরও বেশী সতর্ক হ'লেন—আরও গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করে রইলেন।

প্রায় উর্দ্ধশ্বাসেই সবরকম অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রাদি সংগ্রহ ও সরঞ্জামাদির প্রস্তুতি চলতে লাগলো। যে কোন সময় সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরুর জন্য প্রস্তুত থাকতে নেতারা কর্মীদের কাছে নির্দ্দেশ পাঠালেন।

সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে যে ইস্তাহার ছাপা হ'য়েছিল সেই

ইস্তাহার ছাপানোর ব্যাপারেও বিপ্লবী নেতৃত্বকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। কোন ছাপাখানার মালিকই বৃটিশ শাসকের নিদারুণ নির্যাতনের আতঙ্কে এই ইস্তাহার ছাপাতে সম্মত হয়নি। নেতা গণেশ ঘোষ কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তিনি টাইপ্ প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য কয়েকজন কর্মীকে নিয়োগ করলেন।

তারপর নানা কলা-কৌশলে টাইপ্ ইত্যাদি সংগৃহীত হ'লে তাঁর নির্দেশনায় এক গুপ্ত প্রেসে কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ছাপার কাজ শুরু হ'য়ে গেল। একদিন অগ্নি সাক্ষরে ইস্তাহার ঘোষিত হ'লো!

"The right of ownership of India and the control of her destinies belong to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and their Government has not extinguished that right nor it ever CAN. The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus put into actual practice the idea of India Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of everyone of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations." (ইস্তাহারটির পূর্ণাবয়ব পরে উদ্ধৃত করছি।)

এই ইস্তাহারের উপর প্রাথমিকভাবে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ যে করেনি তা' নয়। তবু বিপ্লবীদের গোপনে শক্তিবৃদ্ধির পথে তেমন কোন অন্তরায় সৃষ্টি হোলনা।

প্রধান নেতা সূর্যসেন বিশেষভাবে পরীক্ষার পর নির্বাচিত তরুণদের নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর একান্ত প্রিয় সহনেতা গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহের সঙ্গে নিভৃতে গভীর পরামর্শ করেন। তাঁদের সর্ব-সম্মতিতেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'য়েছিল।

আক্রমণের কর্মসূচী রচনা করা হোল এই ছকে:

১) টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করতে হবে সর্বপ্রথম। কারণ সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ধ্বংস না করলে শত্রুরা বাধাসৃষ্টি করবে অতি সহজেই। শত্রুরা যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে তাদের খুব সহজেই কাবু করা যাবে।

২) পাহাড়তলী অস্ত্রাগার আক্রমণ দ্বিতীয় পর্য্যায় হিসাবে গৃহীত হবে। কারণ এখানে সরকারী ও রেলওয়ের রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল, মেসিনগান, লুইস্‌গান ও অন্যান্য আগ্নেয়-অস্ত্রের উপযোগী গুলী-গোলা-বারুদ মজুদ ছিল।

৩) ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। এই ক্লাবের বর্ত্তমান নাম 'চট্টগ্রাম ক্লাব।'

৪) প্রথমে রিজার্ভড্ পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ—এবং প্রয়োজন হ'লে সম্মুখ সমর এবং ওদের পরাজিত করে পুলিশ ঘাঁটির রাইফেল, রিভলভার, গুলী-বারুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করা।

৫) অতঃপর স্থির হ'লো, উপরোক্ত কাজগুলো সুসম্পন্ন হ'লে চট্টগ্রাম শহরকে 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হ'বে এবং প্রধান নেতা সূর্যসেন হবেন সেই স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট্।

৬) চট্টগ্রাম থেকে বেশ কিছুদূরে রেল লাইন তুলে দেওয়া হ'বে এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হ'বে যা'তে সামরিক বাহিনী সহজে এসে আক্রমণ করতে না পারে।

৭) শহরের সব বন্দুকের দোকান ও সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দখল করা হবে এবং সেই অস্ত্র ও অর্থ বৈপ্লবিক কার্য্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হ'বে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো।

৮) চট্টগ্রাম শহর দখল করে, কাছারী পাহাড়ে বিপ্লবীদের 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান্ আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা'-র পতাকা উত্তোলন, প্রজাতান্ত্রিক সবকার প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্য বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্যে বিচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো।

এতাবৎকাল কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা চোখের সম্মুখে না থাকায় কর্মীমহলে অসন্তোষ ছিল—তাদের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সুসংবদ্ধ পথে চলার সুযোগ পায়নি। তবে একেবারেই কোন চিন্তিত পরিকল্পনা ছিলনা বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে। বালেশ্বরেব বেলাভূমিতে বিপ্লবের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সমগ্র ভারতের সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন ভূমিকায় সেই পরিকল্পনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অর্থবহ।

চট্টলাব বেলাভূমিতে বিপ্লবের যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছে তার পশ্চাতেও সীমিত পরিল্পনা ও সংগঠনিক দায়িত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই—এর ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

বিপ্লবী নেতাদের অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা এবং তা'দের চলাফেরা ও হাবভাব লক্ষ্য করে বিপ্লবীদলের তরুণদের মনে হ'য়েছিল হয়ত একটি সংগ্রাম আসন্ন হ'য়ে এসেছে; হয়ত সাংগ্রামে ঝাঁপিয়ে প'ড়বার জন্য তা'দের কাছে যেকোন দিন যেকোন মুহূর্ত্তে ডাক আসবে। এই আসন্ন সম্ভাবনায় বিপ্লবী যুবকেরাও মনে মনে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। বৃটিশের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যকে নিমেষে বুদ্‌বুদের মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা অধীর, তারা উত্তেজিত। তা'দের জোড়া জোড়া চোখে জ্বলছে ধ্বংসের নির্ম্মম প্রতিজ্ঞা। কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হ'লো ঃ

"মোরা রণ চাই রণ চাই,
তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়।
মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গায়।

● ● ● ● ●

মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি হাসিমুখে মরি জয়—
স্বাধীনতা গাই।"

গম্ভীর আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহসে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে—প্রতিহিংসা প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ একদিন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ধ্বংসের বাড়বানলে পরিণত হ'তে পারে।

শান্ত ধীর গম্ভীর মাস্টারদা।
ভিতরে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের স্থানীয় শাসনেব বনিয়াদকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে চুবমার করে দেওয়াব সঙ্কল্পেব আগুন জ্বলছে।

কিন্তু বাইরটা দেখে বুঝবার উপায় নেই মহাসাধক বিপ্লবেব উল্কাপিণ্ড তিনি। মাস্টারদা ধীরে ধীরে তাঁর অতিঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে বললেন :—

"সুদীর্ঘ বৎসর ধরে শুধু পথ চেয়ে আর কাল গুণে এই পবম মুহূর্ত্তের জন্যই আমরা অপেক্ষা করেছি। এই যাত্রা পথে যে বিপুল লোকসঞ্চয় আমরা কবেছি, আজ অভ্যুত্থানের প্রথম স্তবকে আমরা তাদের মধ্য থেকে মাত্র কতিপয় বিশ্বস্ততম ও যোগ্যতম কর্মীকেই তালিকাভুক্ত করলাম। আমরা জানি, আমাদের প্রোগ্রামকে সাফল্যপূর্ণ করতে নানাভাবে নানাসময়ে নানা জনের সাহায্য আবশ্যক হ'বে। এমনকি আমাদের অবলম্বিত কর্মতালিকায় প্রত্যেকটি সম্পাদন করবার সুযোগ আমরা না-ও পেতে পারি। যে কর্মতালিকা আমরা আজ গ্রহণ

করেছি, এর পূর্ণ সাফল্যের দায়িত্ব আমাদের যেমন, এই তালিকার বাইরের অগনিত বন্ধু-সমাজেরও ঠিক ততটুকুই আছে ও থাকবে।

প্রথম দিনের আঘাতের জন্যই এই তালিকা। পরবর্তীদিনের কর্মোদ্যমে আত্মনিয়োগ করার জন্য এই তালিকার বাইরেও আমাদের প্রতিটি অনুবর্তী কর্মীকে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হ'বে। চলার পথে আমাদের সাফল্যই ঘটুক আর বিফলতাই আসুক, আমাদের সহকর্মী ও অনুবর্তী চট্টলার বিপ্লবী সমাজ এবং আমাদের সঙ্গে ভাবে ও আদর্শে ঐক্যমতসম্পন্ন বাংলার ও ভারতের বিপ্লবী সমাজ, ইংরাজের বিরুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা'-র গুটিকয় কর্মীর অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করার দায়িত্বকে অপরিহার্যরূপেই গ্রহণ করবে—এই ভরসা আমরা করবো।"

মাস্টারদা আবার ধীরে ধীরে বললেন—"আজ আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি, আমরা সকলেই 'ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা-'র বিশ্বস্ত সৈনিক মাত্র। এর সর্বাধিনায়ক হিসাবেই তোমাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন আমার জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প ও কর্ত্তব্য বলে আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'চ্ছি। বিভিন্ন প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমাকে অবশ্যই কর্মী বিভাগ করতে হ'বে। এজন্য আমি তোমাদের সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন নেতাদের মধ্য থেকে এই ক'জনকে বেছে নিলাম—নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও উপেন ভট্টাচার্য্য।"

আসন্ন অভ্যুত্থানের জন্য মুক্তিপাগল বিপ্লবী সেনানীরা অধীর হ'য়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে কার কার নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে তা' প্রথমে বেশ গোপন রাখা হয়। নেতারা বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে তালিকা প্রস্তুত করলেন। সামরিক ভাষায় এর ইংরেজী

নাম 'মবিলিজেশন্ লিষ্ট' (Mobilisation List) বা বিশেষ দায়িত্বের জন্য নির্বাচিত সৈন্য-তালিকা। শহরের বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতি এবং সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে এই তালিকাভুক্ত বিপ্লবী সেনাদের খবর পাঠিয়ে আনানো হয়।

বিপ্লবী সেনাদের যোগ্যতম ও কর্মদক্ষতা নিপুণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে মাস্টারদা দায়িত্বভার অর্পণ করে দেন। জেলার রিজার্ভড্ পুলিশলাইন ও অস্ত্রাগাব আক্রমণের দায়িত্ব দেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের উপর আর লোকনাথ বল ও নির্মলসেনের উপব দায়িত্ব ছিল পাহাড়তলীর অক্সিলিয়ারী ফোর্সের হেড-কোয়ার্টার ও অস্ত্রাগার আক্রমণের। এই দুইটিই ছিল বৃটিশের প্রধান শক্তিকেন্দ্র। তাই বিশিষ্টতম এই চারজন সহনেতার উপর তিনি এই গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ এক্সচেঞ্জ এবং রেললাইনকে বিচ্ছিন্ন ও বিকল করার জন্য দায়িত্ব নিলেন নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচার্য্য। এঁদের সহযোগিতায় রইলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত অনুগামী বিশ্বস্ত সাহসী কর্মীবৃন্দ।

এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ দারুণ উত্তেজনায় উত্তপ্ত। গান্ধীজী কাবাগারে। জেলায় জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ, রাজদ্রোহ ও আইন অমান্য আন্দোলনেব তীব্রতা অত্যাচারী বৃটিশকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে। এই গণ-আন্দোলনকে দমন পীড়নের রোলারে পিষ্ট করবার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী এক নারকীয় পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত।

মেদিনীপুরের রাঙামাটিব বক্ষঃভেদ করে উড়লো বিদ্রোহের রক্ত নিশান।

কলকাতার সভা-সমিতিতে উপস্থিত জনতার উপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। সমগ্র দেশটা যেন ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত। বন্ধন মুক্তির প্রদীপ্ত আহ্বানে বাংলার ক্ষাত্রবীর্য্য উজ্জীবিত। তেজোদ্দীপ্ত রুদ্রকণ্ঠে তা'দের ধ্বণিত হ'লো :

"নাচে ঐ কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল বসে কি ?
দেরে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'।
লাথি মার, ভাঙরে তালা !
যতসব বন্দীশালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি।"

অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর প্রেসিডেন্টরূপে স্বাক্ষরিত নিচের তিনটি ইস্তাহার জনসাধারণের কাছে বিলি করা হয়। ইস্তাহারগুলোর বাংলা তর্জমাও পাশাপাশি তুলে দেওয়া হ'লো।

"THE INDIAN REPUBLICAN ARMY"

"The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemnly declares its intention to stand against the age-long repression by the British people and their Government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred millions of Indian People subjugated for unlimited time and to eradicate the slightest trace of nationalism and national originality amongst them.

The right of ownership of India and the control of her destinies belong to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and their Government has not

extinguished that right nor it ever CAN. 'The Indian Republican Army' proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of everyone of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations.

It remembers to-day with sorrowful indignation the inhuman massacre of Indian people perpetrated by the British Government on the Indian soil, the blowing up of her woman folk in the mouth of guns, the indiscriminate hangings and cold-blooded murder of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British boot and the complete destruction of her trade and industries and takes up the sacred vow of retaliating and avenging the blood of her late wronged children.

'The Indian Republican Army' is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian people for the unkeep of the national cause and honour and also prays that no person who reveres this cause will dishonour it by callousness, cowardice and inhumanity. In this supreme hour the Chittagong people must by their valour and patriotism and by the readiness of her children

to sacrifice themselves for the comnion good, prove themselves worthy of the august destiny to which they are called.

By order
President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch."

বাংলা তর্জমা নিম্নরূপ :

"ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী"

"ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা, এতদ্বারা ঘোষণা করছে যে, যুগ যুগ ধরে যে বৃটিশ এবং তাব সরকার ভারতের ত্রিশ-কোটী জনসাধারণকে হিংস্র শোষণ-নীতির দ্বারা নিপীড়ন কবেছে, তা'দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সামান্যতম উন্মেষকেও নির্মূল করতে ও জাতি হিসেবে যা'তে তা'দেব বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত না হয় তার চেষ্টা করেছে—তার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ঘোষিত হ'লো।

ভারতবর্ষের জনসাধাবণই ভারতের প্রকৃত অধিকাবী। ভারতের ভাগ্যনির্ধারণের মূল দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের উপর। একটি বিদেশী সরকার ও বিদেশীয়দের দ্বারা জনগণের সেই অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ চলবেনা। আজ ভাবতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী অস্ত্রের মুখে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছে। তাকে বাস্তবে এইরূপেই রূপায়িত করা হ'বে। এই বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, কল্যাণের জন্য এবং অন্যান্য জাতির কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। বৃটিশ সরকার যেভাবে ভারতের জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করেছে, বন্দুকের গুলির মুখে নারী জাতিকে পর্যান্ত

উড়িয়ে দিয়েছে, বহুদেশবাসীকে ফাঁসীতে এবং অন্যভাবে হত্যা করেছে, নিষ্ঠুর বৃটিশ বুটের তলায় শিশুদেরও পিষ্ট করেছে—তীব্র ঘৃণার সঙ্গে তা' আজ স্মরণ করি এবং দেশবাসীর রক্ত শোষণের চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ ঘোষণা করছি।

জাতীয় স্বার্থরক্ষার 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী'-র এই শাখা জনসাধারণের নিকট পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করছে এবং আশা-প্রকাশ করছে যে, কর্ত্তব্যে অবহেলা, কাপুরুষতা বা অমানুষিকতা দ্বারা কখনও জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানের অবমাননা করবেনা। আজকের এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামের জনসাধারণকে তাদের সাহস ও দেশপ্রেম নিয়ে আত্মদানের জন্য এমনভাবে অগ্রসর হ'তে হ'বে যাতে এই পবিত্র দায়িত্বের জন্য তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেন্ট—সপরিষদ,
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রীবাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা।"

নিম্নের দ্বিতীয় ইস্তাহারে ছাত্র ও যুবকদের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

"THE INDIAN REPUBLICAN ARMY"

'To the students and youths of Chittagong.'
"Dear Brothers!

The Indian Republican Army has made an attempt to assert its rightful claim to liberate the country from the cruel yoke and oppression of the British people and their Government and has kept us flying the ensign of free India

The British Government during the last 200

years of their tyrannical reign in India, have crushed with cruel hands the Indians every time they have tried to achieve freedom and this time also they will not spare any energy to restore their illegal establishment for predotory exploitation

So Brothers ! Rise up to the situation, try to feel the anguish of subjngation, see to the sad plight your country has been put to, do what the youths and students of Germany, Russia and China are doing, kindle up the fire of wrath and retaliation in your hearts. Enroll yourselves as soldiers under the Indian Republican Army and make an ardent attempt to save the motherland from the abyss of misfortune and misery.

By order
President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch"

"ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনী"
চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে—

"প্রিয় ভাইয়েরা,

বৃটেনের অধিবাসী ও তাদের সরকারের নিষ্ঠুর খেয়াল ও অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী এক প্রচেষ্টা করেছে এবং স্বাধীন

ভারতের পতাকা উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিগত দু'শ বছরের অত্যাচারের রাজত্বে ভারতীয়েরা যখনই স্বাধীনতার যে কোন প্রচেষ্টা করেছে তখনই তা নির্মম ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। 'এই বারও তারা তাদের রক্তক্ষয়ী নিপীড়ন ও নির্যাতনের অন্যায় শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কোন ক্রটি করবেনা।

আসুন ভাইসব, এই অবস্থার অবসানের জন্য এগিয়ে আসুন, পরাধীনতার বেদনা অন্তরে অনুভব করুন। দেশকে শোষণের দ্বারা কি রকম অধঃপতনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা' লক্ষ্য করুন—জার্মানি, রাশিয়া আর চীনের ছাত্ররা ও যুবকগণ কেমন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা' দেখুন। আপনাদের অন্তরে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালান। দলে দলে আপনারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সদস্যভুক্ত-হোন, আমাদের দেশকে ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে রক্ষা করুন—স্বাধীনতার সৈনিক দলে আসুন।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেণ্ট সপারিষদ,
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা।"

এই ইস্তাহারের বক্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বিপ্লবীরা প্রাথমিক জয়ের পর অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহরে বিদেশী সরকারের সকল ক্ষমতাকে অস্ত্রের মুখে স্তব্ধ পর্যুদস্ত করে দেবার পর অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করে যখন বৃটিশের সামরিক বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে, সেই সময় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী যা'তে সাহসী ও শক্তিশালী ছাত্র-যুবকবৃন্দের সক্রিয় সহযোগীতা পায় সেজন্য উপরোক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করে। পরে চট্টগ্রামের সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যেও আহ্বান জানিয়েএক ইস্তাহার বিলির সিদ্ধান্ত হয়। সেই ইস্তাহারটিও উদ্ধৃত করলাম।

চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতি

এতদ্বারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও বালককে এই আদেশ ও নির্দ্দেশ দিচ্ছে যে, আমাদের জাতীয় আকাঙ্খার বিরোধী সমস্ত ইংরেজ ও শ্বেতচর্ম ঈঙ্গভারতীয়কে অবিলম্বে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সদর দপ্তরে হাজির করতে হ'বে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী-বাহিনী ঘোষণা করছে যে, এরূপ ব্যক্তিদের যারা ধরে আনবে তা'দের যথেষ্ট পুরস্কাব দেওয়া হ'বে।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেন্ট-সপারিষদ,
ভাবতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা।"

বিভিন্ন কাজেব জন্য বিপ্লবীরা নিজেদের সুপবিকল্পিতভাবে আগে থেকেই মহড়া দিয়ে তৈরী করে নিচ্ছিলেন। অনন্ত সিংহ তাঁর 'বেবী অষ্টিন' গাড়ী দিয়ে অনেককেই মোটর চালানো শিখিয়েছিলেন। টেলিফোন—টেলিগ্রাফ্ লাইন, রেললাইন বিকল করার পদ্ধতিতেও তাঁরা গোপনে কয়েক জায়গায় মহড়া দিয়ে নিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকারকে পবাজিত করার মতন পর্যাপ্ত অস্ত্রবল ও লোকবল তাঁদের ছিলনা কিন্তু যা' ছিল সমস্ত বলের উর্দ্ধে সেই অমিত মনোবলে তাঁরা বলীয়ান ছিলেন।

আইরিশ্ রিপাব্লিকান্ আর্মির নেতা ডি-ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্স্ প্রভৃতির বিপ্লবী কার্য্যাবলীর দ্বারা সূর্যসেন ও অন্যান্য নেতারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এই অভ্যুত্থানের তারিখ ও দিন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি—'ইষ্টার বিদ্রোহ'। আয়ারল্যাণ্ডের 'ইষ্টার বিদ্রোহের'

মত চট্টগ্রামে এই অভ্যুত্থানের দিনও স্থির হয় ১৮ই এপ্রিল, 'গুডফ্রাইডের' দিনে। ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি—ইষ্টার বিদ্রোহের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পরাধীন ভারতের ইতিহাসে চট্টগ্রামের স্বাধীনচেতা বিপ্লবীরা এক রক্তোজ্জ্বল অধ্যায় রচনার জন্য জীবনপণে প্রস্তুত হ'লো।

বালেশ্বরের মহাতীর্থে মহাবিপ্লবের যে যজ্ঞ ··· প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারই পূত ভস্মরাশি চট্টগ্রামের শৈলমালায়, তরঙ্গক্ষুব্ধ কর্ণফুলীর তীরে জীবনের মুক্তিসংগ্রামকে সার্থক প্রেরণাদান করেছিল, দিয়েছিল বিপ্লবী অভিযানের সুনির্দ্দিষ্ট পথনির্দ্দেশ।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। বিপ্লবীদের জীবনের এক চরম ক্ষণ। নির্বাচিত বিপ্লবীদের চাঞ্চল্য দেহে মনে। যেন জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড এক একজন—উৎসাহ উদ্দীপনায় তেজোদীপ্ত ভাস্বর। মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বজ্রদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল অবিচল এক একজন সৈনিক। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ল'ড়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হ'তে চলেছে তারা। সে এক ভয়ঙ্কর অনুভূতি। মৃত্যুপথে এক দুর্নিবার আকর্ষণ!

'The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves.'

এই অবস্থায় চট্টগ্রামের বুকে সন্ধ্যায় বিভিন্ন কেন্দ্রে পূর্ব-নির্দেশানুসারে একে একে বিপ্লবীরা এসে সমবেত হ'তে থাকে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তিন জায়গায় সমবেত হয়েছিলেন,—আসকার খাঁর দীঘির পাড়ে কংগ্রেস অফিস, গণেশ ঘোষের পিতার দোকান এবং লোকনাথ বলের পাথর ঘাটার বাসায় বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে সব বিপ্লবী জমা হ'তে থাকেন। ১৭ই এপ্রিল থেকে শহরের উত্তবাংশে প্যাবেড গ্রাউণ্ডে 'মুসলিম কন্‌ফারেন্স' শুরু হ'য়েছে।

১৮ই এপ্রিল তৎকালীন বিখ্যাত কুস্তিগীর গামার কুস্তি প্রদর্শনী--শহরের কিছু মানুষের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ। অন্যদিকে লবণ-সত্যাগ্রহের কাজ চলছে কুমিরায়।

রাত সাড়ে-ন'টায় আঘাত শুরু হ'বে।

খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট, হাফ সার্ট, জলের টিন, অপারেশনের উপযোগী প্রয়োজনীয় সবঞ্জামাদি তিন প্রধান কেন্দ্রেই পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে আগেই। বিপ্লবীরা এসে পোষাক পরিবর্ত্তন করে নেয়।

এসময় এক ঘটনা ঘটে।

প্রায় তিনমাস পূর্বে আসকার খাঁর দীঘির পাড়ে এক বোমা বিস্ফোরণে তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু দস্তিদার আহত হ'য়ে গ্রামের গোপন চিকিৎসাকেন্দ্রে ছিল বলে 'মবিলিজিশন লিষ্ট' থেকে তাদের বাদ দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু দেশপ্রেম ও মুক্তিসংগ্রামের ডাকে এতই উদ্বুদ্ধ ও জীবনপণ ছিল যে, অর্ধেন্দু যথাসময়ে এসে হাজির। তাঁকে অপারেশনে নিতেই হ'বে—একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষ পর্য্যন্ত গণেশ ঘোষের অনুমতিতে অর্দ্ধসুস্থ অর্ধেন্দুকে দলভুক্ত করা হোল।

আরও এক সমস্যা দেখা দিলো।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা প্রয়োজন মাফিক ছিলনা। যথাসময়ে কয়েকটি গাড়ী পাওয়া না যাওয়ায় সঙ্কট দেখা দিল। অথচ গাড়ী যোগাড় করতেই হবে—যেভাবেই হোক।

শহরের মাঝখানে লালদীঘির পাড়ে ট্যাক্সির ষ্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে হিমাংশু সেন একখানা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে গণেশ ঘোষের বাসায়। ড্রাইভারকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা মুখ বেঁধে ফেলে রেখে তার গাড়ী দখল করা হোল। এভাবে আরও একটি গাড়ী যোগাড় করা হ'লো।

লোকনাথ বলের নেতৃত্বে জীবন ঘোষাল ও অন্যান্য সঙ্গীরা আর একখানি ট্যাক্সিতে চেপে দিগন্ত-বিস্তারী ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে কাঁচা গ্রাম্যপথ ধরে চলেছে। সময় বুঝে লোকনাথ বল গাড়ী থেকে কিছুদূরে গিয়ে নেমে পড়লেন। জীবন ঘোষাল ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলেন। ড্রাইভার কিছু অনুমান করবার পূর্বেই তিনি ক্লোরোফরম্ মাখানো একখানি রুমাল দিয়ে ড্রাইভারের নাকে মুখে চেপে ধরলেন। লোকনাথের হাতে উদ্যত বিভলভার দেখে চালক হতচকিত ভীত ত্রস্ত। তাকে সংজ্ঞাহীন করে তাঁরা তার দেহখানি নামিয়ে হাত-পা বেঁধে দূরে মাঠের ধানের ক্ষেতের মধ্যে ফেলে রেখে তার পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে গাড়ী নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। এভাবে সঙ্কটের মুহূর্তে সমস্যার সমাধান হোল। তাঁদের অভীষ্টের পথে আরেক পদক্ষেপ সারা হোল।

এত বড় 'অপারেশনের' মূল দায়িত্ব যাঁর হাতে সেই সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা কিন্তু ধীর শান্ত গম্ভীর। ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসের নূতন অধ্যায় সৃষ্টির যিনি অনন্যতম নেতা তাঁর মধ্যে চিন্তার ঝড় বইছে কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি—স্থির, কর্তব্যে অচঞ্চল। তাঁর প্রশান্ত মুখ দেখে কে বলবে অন্তরে তাঁর আগ্নেয়গিরির বহ্ন্যুৎসার হচ্ছে। কংগ্রেস অফিস থেকে বের হবার আগে পর্য্যন্ত সুদক্ষ কর্তব্যপরায়ণ করনিকের মত সমস্ত কাগজপত্র টেবিল গুছিয়ে রেখেছেন—হিসাবপত্র পুংখানু-পুংখরূপে মিলিয়ে ঠিক করে নির্বিকার চিত্তে অফিস তালাবদ্ধ করে বেরিয়ে এসেছেন।

বিস্ফোরণোন্মুখ বারুদের স্তূপের মত শান্ত, কালবৈশাখী আসার

পূর্বমুহূর্তের পৃথিবীব মত নিশ্চল, হিমালয়ের মত ধীর স্থিব—অসম্ভব তাঁর সংযম, অদ্ভুত তাঁর মানসিক স্থৈর্য্য! এতদিন যে স্বপ্নের সাধনায় তিনি বিনিদ্ররজনীর প্রহর গুণেছেন, নিজের জীবন ও জাতির ইতিহাসকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে ভীরুতার অপবাদ মুছে ফেলবার জন্য যে সাধনায় যে আরাধনায় জীবনপণ প্রতীক্ষায় উদ্বেগ নিয়ে বসেছিলেন,—জীবনের সেই পরম লগ্ন সেই শুভক্ষণ সমাগত। তাই বুঝি তাঁর অন্তরে-বাইরে এই প্রশান্তি, এই তৃপ্তি।

দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের মহামুক্তির সংগীত সুধা তিনি স্থির বিশ্বাসে সমস্ত দেহ-মন নিয়ে পান করছেন।

জীবন-মৃত্যুর এক মহাসন্ধিক্ষণেব মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন চট্টলার বিপ্লবী সন্তানেরা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশেব রক্তে তর্পণ করবেন তাঁরা জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর শহীদদের শান্তির জন্য—দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মবিসর্জন দিয়ে অতীতের ভুলভ্রান্তির জাতির ক্ষমাহীন কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত করবেন—এই প্রতিজ্ঞা এই মৃত্যুপণ সঙ্কল্প তাঁদের অন্তরে। আজ সংগ্রামেব প্রাক ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে সঙ্কল্প নিলেন:

"উদয়ের পথ শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

বিপ্লবীরা জানতেন এ সংগ্রাম বড় কঠিন, বড় ভয়াবহ।

তাঁদের ক্ষুদ্র শক্তি বৃটিশ শক্তির তুলনায় অত্যন্ত নগন্য কিন্তু তাঁরা জানেন দেশের জন্য চরম স্বার্থত্যাগ ও পরম আত্মত্যাগ কখনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে পারেনা। এ সংগ্রাম একদিন সার্থক হ'বেই। সেই আশা নিয়ে সেই ভরসায় বুক বেঁধে দেহ-মনে এক দুর্জয় সাহস ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে তাঁরা

দীপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে এসেছেন। 'আকৃশনে' যাবার আগে মাস্টারদা সবাইকে ডাকলেন, গম্ভীর কণ্ঠে মৃত্যুপথ যাত্রী সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বললেন—"মাতৃভূমির নামে তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করে বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়বো—শত্রুর দুর্গ অধিকার করে বিজয়পতাকা আকাশে ওড়াবো। যেকোন উপায়ে যেকোন মূল্যে শহর আমাদের চাই!"

যাত্রাব পূর্বে মাস্টারদা সঙ্গীদের আক্রমণের সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী শেষবাবের মতন আবার বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক রাত ৯-৫০ মিঃ আক্রমণ শুরু হ'বে। রেলপথ আক্রমণকারীদের পূর্বদিনই যথাযোগ্য নির্দ্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে। কাজ শেষ করে সবাই পুলিশ আর্ম্মারীতে প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানেই হেড-কোয়ার্টার বসিয়ে নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পুলিশ আর্মাবী আক্রমণকাবী দল গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে গণেশ ঘোষের বাড়ী থেকে যথাসময়ে মোটব যোগে রওনা হবে আক্রমণ-স্থলে।

লোকনাথ বল ও নির্মল সেনেব নেতৃত্বে রেলওয়ে, আর্মারী আক্রমণকারী দল রওনা হবে—লোকনাথ বলের বাড়ী থেকে মোটর নিয়ে। অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দল যাবে টেলিগ্রাম-টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করতে কংগ্রেস অফিস থেকে মোটরে।

এই দলগুলোর সহায়ক হিসাবে ৩০ জনেব (ত্রিশ জনের) একটি দল পায়ে হেঁটে গিয়ে পুলিশ আর্মারীর নিকটবর্তী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঙ্কেতের অপেক্ষায় প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে। সঙ্কেতমাত্র তারা আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যোগদান করে আক্রমণকে জোরদার করবে। আর সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা অন্য এক মোটরে কিছু সঙ্গী নিয়ে পুলিশ আর্মারীতে নির্দ্দিষ্ট সময়েই গিয়ে উপস্থিত হ'বেন।

হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট।

বিপ্লবী সৈনিকেরা সামরিক পোষাক পরে প্রস্তুত। সামরিক পোষাক দেহ ও মনে দৃঢ় সংগ্রামী সাহস ও বল আনে এবং

সৈনিকদের অত্যন্ত সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ক'রে তোলে। তা'ছাড়া এই বাহিনীর সামরিক পোষাক পরিধানের অন্যতম কারণ ছিল আর্মারীতে বৃটিশ গার্ডদের মধ্যে প্রথম দর্শনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যা'তে সেই অপ্রস্তুত মানসিক অবস্থার অবকাশে আক্রমণের সহজ সুযোগ নেওয়া যায়। শুধু এই 'অ্যাকশনে' যাবার আগেই বিপ্লবীরা সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়েছিলেন তা' নয়, মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী কর্মীরা সামরিক কায়দায় ও পোষাকে সুসজ্জিত হ'য়ে গঠিত হয়।

লোকনাথ বল শক্তিমান সুপুরুষ ছিলেন। গায়ের রং ছিল খুব ফর্সা। জেনারেলেব পোষাকে সজ্জিত তাঁকে দেখে উচ্চপদস্থ বৃটিশ সামরিক অফিসার না মনে করার কোন কারণ ছিলনা। তাঁর সহকর্মীবা নির্মল সেন, রজত সেন, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুবী ও জীবন ঘোষাল ও সামরিক পোষাক ও অস্ত্রে সজ্জিত হলেন। প্রত্যেকেব কোমবে বিভলভার। দলের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহ ও বৃটিশ আর্মি জেনারেলের পোষাক পরলেন—দু' কাঁধের উপর ঝকমকে তারকা, ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির মনোগ্রাম করা নাম। আর পোষাকে পদাধিকারের নানা চিহ্ন ও পদক, কোমর ও বুকের উপর আড়া-আড়ি ভাবে ক্রস্‌বেল্ট আঁটা, মাথায় সুদৃশ্য পালক লাগানো সোণালী হেল্‌মেট্।

গণেশ ঘোষের পোষাক ফিল্ড্-মার্শালেব। জমকালো অপূর্ব রণ-বেশ। কোমরে তরবারির পরিবর্তে হাতে ফিল্ড মার্শালের 'ব্যাট্'। অপূর্ব মানিয়েছে তাঁকে। চোখে-মুখে বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞার সুস্পষ্ট ছাপ। প্রতিহিংসার আগুনে দুচোখ জ্বল জ্বল করছিল।

দলের প্রত্যেকেই সামরিক-পদ অনুযায়ী ইউনিফর্মে সজ্জিত ছিল। শুধু মাত্র চোখ ধাঁধানো পোষাক নয়—দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ জাগ্রত চেতনার যেন এক একটি জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি!

অভ্যুত্থানের পরিকল্পণা অনুযায়ী প্রথমে আয়োজন সংবাদ-

সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বিকল করা। অন্যান্য আক্রমণের কেন্দ্রগুলো আক্রান্ত হবার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সমাধা করা দরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী। মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন—"নূতন বড় গাড়িটি আনন্দ চালাতে পারবে তো? গাড়িটির ট্রায়াল নিয়ে তার কি মনে হলো? সে চালায় ভাল কিন্তু গাড়িটির অনুপাতে সে যে খুব ছোট! অম্বিকা বাবুর মতটা চাই, তিনি কি আনন্দের উপর নির্ভব করতে পারেন?"

উত্তরে অনন্ত সিংহ বললেন—"আমি ট্রায়াল্ নিয়েছি। আনন্দের মোটর গাড়ী চালানোব পারদর্শিতায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বড় গাড়ী হ'লেও গাড়িটির উপর আনন্দের পুরো দখল আছে। আমার মনে হয় অম্বিকাদা নিঃসন্দেহে তাঁর দলটিকে নিয়ে আনন্দের গাড়িতে টেলিফোনভবন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যেতে পারেন।"

অম্বিকা চক্রবর্তী তাঁর মতামত জানালেন—"অনন্ত ঠিকই বলেছে। তাঁর অভিমত শুনে আমবা সবাই আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু যদি অনন্তের মত নাও শুনতাম তবুও আনন্দের গাডি চালাবার দক্ষতা সম্পর্কে আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠতো না।"

আনন্দ গুপ্ত একজন স্কুলের ছাত্র—বয়স মাত্র ষোল বৎসর। তার দাদা দেবপ্রসাদ গুপ্ত একজন বিপ্লবী সৈনিক—বয়স মাত্র আঠার বৎসর। আনন্দ বয়সে ছোট হ'লেও অসাধারণ সাহস ও নিষ্ঠা তার মধ্যে ছিল। তার উপর অর্পিত প্রতিটি দায়িত্বে সে নিষ্ঠা ও দক্ষতার ছাপ রেখেছে।

অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কালী চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত ও আরও তিনজন কর্মী মোটর যোগে ঘড়ি ধরে রওনা দিল।

পাহাড়তলী অস্ত্রাগার আক্রমণের জন্য সদলবলে রওনা হ'লেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। রওনা হ'য়ে গেলেন গণেশ ঘোষ ও

অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে আর একটি দল। একই সঙ্গে মাস্টারদাও তাঁর অনুচরদের নিয়ে প্রস্তুত। তরুণ বিপ্লবী নরেশ রায়ের নেতৃত্বে 'ইউরোপীয়ান্ ক্লাব' আক্রমণের জন্য অপর দলটিও তৈরী।

শহরের বিভিন্ন গোপন কেন্দ্র থেকে একই সময়ে বিপ্লবীরা বৃটিশ শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাতের সঙ্কল্প নিয়ে সেদিন রাতের অন্ধকারে অভিযান শুরু করে।

টেলিগ্রাফ্-অফিস আক্রমণের কৌশল হিসাবে উত্তর দিকের নির্জন পথটি বেছে নেওয়া হয়েছিল; কারণ এই পথটি জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। দু'টি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে এই রাস্তা—পথটির নামও তাই কাটপাহাড় রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে সারি দিয়ে প্রহরীর মতন। দক্ষিণের টিলার উপর টেলিফোন-ভবন এবং অন্যদিকে ফরেষ্টার্স্ অফিস ও কোয়ার্টার।

আনন্দ গাড়ী নিয়ে এসে থামলো টিলার গায়ে।

অতি দ্রুত দলটি উঠে গেল উপরে টেলিফোন-ভবনে।

একজন অপারেটর ছিল সামনে—নাম আহমতুল্লা। প্ল্যান অনুযায়ী অম্বিকা চক্রবর্তী দুদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর একজন দক্ষিণের বারান্দার দিকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রেখেছে। আনন্দ টেলিফোন ঘরে সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকে পড়লো। বুকের উপর রিভলবার ধরে দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিল—'হ্যাণ্ডস্ আপ'। অপারেটর যেন ভূত দেখছে—ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। মন্ত্রমুগ্ধের মত আসন ছেড়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো। অন্যান্য অফিস কর্মীদের হাতও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে তারা থর থর করে কাঁপছে।

ইতিমধ্যে দমাদম্ হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো সুইচ্ বোর্ডের উপর। হাতুড়ির ঘায়ে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। সুইচ্ বোর্ড

ভাঙ্গার পর পেট্রোল ঢেলে অফিস ঘরে অগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রথম সাফল্যের অগ্নিশিখা। রাত্রির নিস্তব্ধতায় বৃটিশরাজের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'লো।

কাজের এই উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যেও কিন্তু তারা স্নায়বিক ভারসাম্য হারায়নি। হাতে হাতে সব গুলীভর্ত্তি রিভলবার কিন্তু উত্তেজনা বশে ভুলেও তারা কোন কর্মীর উপর বেপরোয়া হ'য়ে ওঠেনি। বিপ্লবীদের নীতি ছিল নিরীহ নিরস্ত্র দেশেব মানুষের উপর কোন অন্যায় অত্যাচার না করা—সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যই শুধু গুলী করা নির্দেশ ছিল। দেশের মানুষ তাঁদের শত্রু নয়—তারা বৃটিশের বেতনভুক্ কর্মচারী মাত্র—তাদের শত্রু ঐ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা!

দু'মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ।

দলেব নেতার সঙ্গে দ্রুত সবাই গাড়িব দিকে ছুটে চললো। যাওয়ার সময় তাবা একটি গুলীর শব্দ পেলো। ডেপুটি-সুপারন্টেণ্ডেন্ট্ নিজেব ঘরের জানালা দিয়ে গুলী ছুঁড়েছিলো। অম্বিকা চক্রবর্তীও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। দু'টো গুলীব আওয়াজ কাটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাত্রিব মৌনতা ভঙ্গ করে টুকরো টুকবো হ'য়ে প্রতিধ্বনিতে মিলিয়ে গেল। বিনা রক্তপাতে চট্টগ্রামকে সাবা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হো'ল—এটা কম বিস্ময় ও গৌরবের কথা নয়!

এ ঘটনা সম্পর্কে টেলিগ্রাফ্ মাষ্টাব W. D. Horn এর রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি:

"প্রায় রাত দশটার সময় যখন আসি ডেপুটি-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কোয়ার্টার থেকে আমার কোয়ার্টারে ফিরে আসছিলাম তখন টেলিফোন কক্ষ থেকে জিনিসপত্র ভাঙ্গার আওয়াজ আসছিল শুনতে পেলাম। কক্ষের পূর্বদিকের জানালা দিয়ে আমি দেখতে

পেলাম· পাঁচ-ছয়জন লোক (বাঙালী বলেই মনে হল) সজোরে একসঙ্গে বোর্ডে হাতুড়ির ঘা লাগাচ্ছে। আমার আরও মনে হ'ল যে তারা সেই কক্ষের যত আসবাব পত্র সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করছে। বাইরে থেকে আমি হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'কোন্ হ্যায়?' কিন্তু কোন জবাবই পেলাম না। আমার মনে হ'ল একজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো। আমি দৌড়ে ফিরে গেলাম ডেপুটি-সুপারিনটেণ্ডেন্টের কোয়ার্টারে এবং তাকে জানালাম যে টেলিফোন কক্ষে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—তিনি যেন শীগ্‌গিরই তার বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাই করলেন--কিন্তু ইতিমধ্যে এক্স্‌চেঞ্জ কক্ষে বিরাট আকারে আগুন লেগে গিয়েছিল।"

আর পরবর্তী মামলার রায়ে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট্ এ সম্বন্ধে লিখেছেন:

"The Photograph (Ex.xxxv) taken by the S. D O. Telegraphs (P. W. 48) and the enlargement (Ex cl xx) by P. W. 4 show more fully and forcibly than any witness could describe the extent of the damage done. The telephone switch-board and all the connected apparatus were reduced to a smouldering wreck. Curiously enough, the fire blackened dial of the clock which hung on the wall behind the switch-board, with its hands arrested at 9-50 P. M. (standard time) offers its own silent testimony as to the time at which the outrage was committed." (Judgement of Ctg. Armoury Raid case No-1)

টেলিফোন-ভবনের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী সশস্ত্র

অভ্যুত্থানের প্রথম জয় ঘোষণা করে সঙ্গীদের নিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। কাটা-পাহাড়ের রাস্তা ধরে সাফল্যের গৌরব ও উদ্দীপনায় তাদের গাড়ী ছুটে চলেছে দাম-পাড়া পুলিশ ব্যারাকের দিকে। ওয়াটার-ওয়ার্কস্ কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়ে যাওয়া অদূবে একটি উঁচু টিলা। তারই উপর সমতল-ভূমিতে এই পুলিশ লাইন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র বৃটিশ ঘাঁটি।

অন্যদিকে আরেকটি দল গাড়ী নিয়ে ক্লাব ঘরের পাহাড়ের নীচের রাস্তা ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। গাড়িতে বোঝাই আছে অস্ত্রশস্ত্র। গাড়ি খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে—এগিয়ে চলেছে এই গাড়ীকে ছায়ার মতন অনু-সবণ করে কৃষ্ণচূড়া গাছেব আডালে আড়ালে পায়ে-হাঁটা পাঁচ জনের এক সাহায্যকারী দল।

গাড়িটি এসে থামলো আক্রমণ স্থল থেকে দূরে একটি গোপন জায়গায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডজ্ গাড়িটি নিয়ে নির্মল সেন ও লোকনাথ বল এসে উপস্থিত হ'লেন। নিজাম পল্টনের বিস্তীর্ণ মাঠেব অন্ধকার ঠেলে অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলেব পদাতিক বাহিনী সুসজ্জিত হ'য়ে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে আরও কয়েকটি দল পুলিশ-লাইনের প্রধান আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে অতিসন্তর্পণে এগিয়ে চললো। দশটার আগে পুলিশ-লাইনের খুব কাছে রাস্তার বাঁকে সবাইয়ের দেখা হবে—প্ল্যান অনুযায়ী এই ঠিক আছে।

গণেশ ঘোষের গাড়ী ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ওয়াটার-ওয়ার্কসের কাছে এসে পড়লো। গাড়ীর হেড্লাইটে তাঁরা দেখতে পেলেন মাস্টারদাকে—পূর্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে একজন বডিগার্ডের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

আপাদমস্তক সাদা পোষাকে তিনি সজ্জিত। মাথায় সাদা

উষ্ণীষ—তার ডানদিকে টাকার সাইজের উজ্জ্বল ধাতু-নির্মিত ভারতবর্ষের প্রতীকচিহ্ন। গায়ে লম্বা সাদা খদ্দরের কোট—বাঁদিকে বুকের উপর ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেণ্টের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি উজ্জ্বল পদক শোভা পাচ্ছে। তা'ছাড়া ভেলভেটের উপর জরীর কাজ করা একটি ব্যাজও শোভা পাচ্ছে। পরণে ধুতি পায়ে সাদা কেডস্। তাঁব এই জমকালো পোষাকের মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আরও বেশী প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

মাস্টারদার পাশে গাড়ী এসে দাঁড়াতেই গণেশ ঘোষের কম্যাণ্ডে তাঁর দলের ছ'জন সাবিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মাস্টারদাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালো।

মাস্টারদা অভিবাদন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন—"সব ঠিক আছে?"

গণেশ ঘোষ উত্তর দিলেন—"সব ঠিক আছে।"

তারপর তাঁরা আবার গাড়ীতে উঠে বসলেন। নিজেদের অস্ত্রগুলো আবার চেক্ করে নিলেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের রিভলবারের 'সেফ্‌টিক্যাচ' খুলে নিয়ে একেবারে তৈরী হ'য়ে রইলেন। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য অনেকসময় দেখা গেছে 'অ্যাকশনে' কেউ কেউ 'সেফ্‌টিক্যাচ' খুলে না গিয়ে ফায়ারের ব্যর্থ চেষ্টা করে বিপদের সম্মুখীন হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'সেফ্‌টিক্যাচ' না লাগিয়ে আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে অনর্থ ঘটিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করছিঃ "বিপ্লবী যুবকদের যেমন অনেক সাহস ও বিক্রমের ইতিহাস আছে তেমনি আবার অনেক ভীরুতা ও দুর্বলতারও শোচনীয় নজির দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়নি বলে অনেকে বিভিন্ন ঘটনাস্থলে প্রয়োজনের অধিক বলপ্রয়োগ করেছে—এমন কি বিনা প্রয়োজনে তাদের হাত থেকে অসাবধানতা বশতঃ পিস্তলের গুলী

বেরিয়ে গেছে। ···· যুবকেরা একেবারে প্রথম যখন কোন সশস্ত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে তখন তারা যতই সাহসী হোক না কেন, যদি আক্রমণ-কৌশলের বিশেষ শিক্ষা না থাকে তবে এক-প্রকার স্নায়বিক দুর্বলতায় তাদের আঙ্গুল •ট্রিগারে স্থির থাকেনা— **involuntarily** ট্রিগারে চাপ পড়ে অনর্থ ঘটায়। আমাদের নিজেদের সামান্য পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল বলে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বিপ্লবী রণকৌশল কেবল যুদ্ধের কায়দায় না শিখিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক কৌশলের সমন্বয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার এই অভিমত থেকে কেউ যদি অর্থ করেণ যে আধুনিক যুদ্ধে যে-প্রকার “কম্যাণ্ডো ট্রেনিং” বা “গেরিলা-ট্রেনিং” এর ব্যবস্থা আছে, সেই যুগে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেরূপ সামান্য ট্রেনিং দিতে সমর্থ হই তা’ বর্তমান কালের এই বিশেষ রণকৌশলের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তা’হলে ভুল হবে।”

টিলার উপর সদম্ভ ঔদ্ধত্যে নির্ভীক সান্ত্রী পাহারারত—খুব কাছে থেকেই তাঁরা তা’ লক্ষ্য করলেন। তার প্রতি পদক্ষেপেই বৃটিশ প্রভুত্বের নির্লজ্জ দম্ভ ফুটে উঠছে।

বিদ্যুৎবেগে গাড়ী এসে থামলো পুলিশ-লাইনের টিলার নীচে। পিছন পিছন ছুটে আসছে মাস্টারদার গাড়ী। প্রহরারত সান্ত্রীকে সতর্কতার কোন সুযোগ না দিয়েই নিশেষে আক্রমণ করে গার্ডরুম দখল করার জন্য সান্ত্রীর উপর জোড়া জোড়া চোখ খুলে রাখলেন। রিভলবারের ট্রিগারে হাতের তর্জনী চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত।

গাড়ী থেকে তড়িৎবেগে তাঁরা নেমে পজিশন নিলেন। সঙ্কটময় মুহূর্তে এক একটি মুহূর্তের মূল্যও অনেক। সময়ের সামান্যতম অপচয়েও মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। তাঁরা টিলা বেয়ে দ্রুত উঠে যেতে লাগলেন।

সান্ত্রীর দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হয়নি। সে গাড়ী এসে থামতে দেখেছে, দেখলো সামরিক পোষাকে সজ্জিত কয়েকজন লোককে

নামতে। কিন্তু তার মনে গভীর সন্দেহও দানা বাঁধতে পারছিল না। হয়ত সে সামরিক পোষাকে সজ্জিত দেখে নিজেদের লোকই ভেবেছিল। তা'ছাড়া গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের পোষাক পরা ছিল—সে হয়ত ভেবেছে উচ্চপদস্থ অফিসাররা পর্য্যবেক্ষণে এসেছেন। আবার অসময়ে অপ্রত্যাশিত আগমন, অন্য পথে টিলা ধরা ওঠা ইত্যাদি কতকগুলো সংশয়জনক প্রশ্নও তাকে কিছুটা সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল।

সান্ত্রীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ডান হাতে ধরা রিভলবার পিছনে রেখে দ্রুত উঠছেন। সামনে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ—পিছনে ধাপে ধাপে উঠছে বিধু ভট্টাচার্য্য, হরিপদ মহাজন, হিমাংশু সেন ও সরোজ গুহ।

নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের দোলায় যখন দুলছিল সান্ত্রী, ঠিক সেই মুহূর্তে সান্ত্রীর বুক লক্ষ্য করে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের রিভলবার গর্জে উঠল। মূলোৎপাটিত বৃক্ষেব মত সান্ত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্য বিপ্লবীদের এই হত্যা করতে হ'য়েছিল। অস্ত্রসজ্জিত সান্ত্রীর কাছ থেকে যে কোন মুহূর্তে বিপদের গুরুতর আশঙ্কা। সান্ত্রীর বন্দুক তুলে নিয়ে বিপ্লবী মুক্তি-যোদ্ধারা পিস্তল থেকে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে অন্যান্য রক্ষীদের এতটুকু প্রস্তুতের অবকাশ না দিয়ে গার্ডরুমের উপর আক্রমণ করলো। এই অতর্কিত আক্রমণে গার্ডরুমের রক্ষীরা ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে ইতস্ততঃ পালিয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হ'লো।

ইতিমধ্যে মাস্টারদার নেতৃত্বে তাঁর দল ও অপেক্ষ্যমান পদাতিক সহযোগী বাহিনী এসে যোগ দিল। পলাতক রক্ষীদের অস্ত্রশস্ত্র তারা তুলে নিলো।

কণ্ঠে কণ্ঠে 'ইনক্লাব-জিন্দাবাদ' 'long live Revolution', 'Down with Imperialism' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত

হ'য়ে উঠলো। মুহুর্মুহু গুলীর আওয়াজ, সমবেত কণ্ঠে-শ্লোগানের পর শ্লোগান এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। যে যেখানে পারলো পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো। পুলিশ-ব্যারাক গার্ডশূন্য হ'য়ে পড়ে রইলো। বড় বড় টর্চ লাইটের তীব্র আলোয় ৪।৫ জন পুলিশ-ব্যারাকের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহারা দিতে লাগলো।

এবার অস্ত্রাগারের ও ম্যাগাজিন ঘরের তালা ভাঙ্গার পালা। তালাও দরজা ভাঙ্গার যাবতীয় যন্ত্রপাতি তাঁদের সঙ্গেই আছে। হাতুড়ি ও শাবলের দমাদম্ আঘাতে সব ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। দরজা-তালা ভাঙ্গার দারুণ কর্কশ শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতা-ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিল—পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি মাথা খুঁড়ে মরতে লাগলো। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে মহা উল্লাসে তারা ঢুকে পড়লেন—ভিতরে লাইন দিয়ে সাজানো মাস্কেট্রি ও রিভলবার।

বিপ্লবীদের দরকার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, সংগ্রামের হাতিয়ার। সবাই গণেশ ঘোষের কম্যাণ্ডে লাইন বেঁধে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়লো। কয়েকজন প্রত্যেকের হাতে হাতে রিভলবার, মাস্কেট্রি ও কার্তুজ তুলে দিয়ে যেতে লাগলো।

সরবারহ শেষ হ'লে ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ একটা উঁচু জায়গায় উঠে সবাইকে কি করে মাস্কেটে কার্তুজ ভর্ত্তি করতে হয়, গুলী ছুঁড়তে হয়, মাস্কেটের নালী আটকে গেলে কি করে তা' আবার ঠিক করে নিতে হয়—কিভাবে বিপদের মুখে শুয়ে পড়ে পজিশন নিয়ে মাস্কেট্রি ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

প্রাথমিক বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পরীক্ষা করবার জন্য গণেশ ঘোষ কম্যাণ্ড করলেন—"Load!" সবাই টোটা ভর্ত্তি করে নিল! "Aim"! নিমেষে তারা উপরের দিকে লক্ষ্যস্থির করলো।

তৃতীয় কম্যাণ্ড দিলেন তিনি—"Fire!" একসঙ্গে পঞ্চাশটি

মাস্কেট্রি গর্জন করে উঠলো পর পর তিনবার—নিঝুম রাত টুকরো টুকরো হ'য়ে যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।

অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে—মাস্কেট্রির মত একটি অস্ত্রচালনা এত স্বল্পকালের মধ্যে শিক্ষালাভ সম্ভব কি করে?

এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিয়েছেন সংগ্রামের অন্যতম নায়ক জেঃ অনন্ত সিংহ: "অনেক আগে থেকেই বন্দুকের ক্যাটালগ থেকে ছবি দেখিয়ে তাদের খুব ভালো করে মাস্কেট্রির ক্রিয়া-কৌশলের বিষয়ও শেখানো হয়েছিল। তবু মাস্কেট্রি হাতে পাওয়ার পর প্র্যাক্‌টিকালি (হাতেনাতে) ফায়ার করতে তাদের শেখানো হ'লো। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এত জনকে একসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'লো। কিন্তু একটি অ্যাকসিডেন্টও হয়নি। সামরিক শিক্ষা-পদ্ধতির যেরূপ ধারা আছে; তা' অনুসরণ করলেও তিন মাসের কম সময়ে রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মিলিটারীতে শিক্ষার সময় অ্যাক্‌সিডেন্ট্ থেকে বাঁচার জন্য নানাধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিধান আছে। কাজেই পাঁচ-মিনিটের মধ্যে গণেশ যে-শিক্ষা তাদের দিয়েছিল, তার মধ্যে যে অনেক ত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই। তবু বিনা অ্যাক্‌সিডেন্টে মোটামুটি ভাবে মাস্কেট্রি ব্যবহার যে তারা শিখেছিল, তার একমাত্র কারণ, অনেক আগে থেকেই বহুদিন ধরে তারা ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক দিয়ে রিহর্সেল দিয়েছে এবং মাস্কেট্রি চালানোর বিষয়েও theoritically অনেক কিছু শিখেছে।"

পুলিশ-লাইন দখল করে হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হ'লো।

মাস্টারদা হুকুম দিলেন—"বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক্ খুঁজে বের করে পুড়িয়ে ফেল।"

মাস্টারদার আদেশে ইউনিয়ন জ্যাকের বহ্ন্যুৎসব হ'লো।

মাস্টারদা আবার আদেশ দিলেন—"জাতীয় পতাকা তোল।"

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো দু'জন তরুণ বিপ্লবী সগর্বে।

সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বেজে উঠ্‌লো ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য।

ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ কম্যাণ্ড্‌ দিলেন—"Fire!" তিনবার সশব্দে পঞ্চাশটি মাস্কেট্রী আকাশ ফাটিয়ে গর্জে উঠলো।

আবার বিউগলের সুরে সুরে কণ্ঠে কণ্ঠে ভেসে উঠলো—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' 'বন্দে মাতরম্‌!' 'সাম্রাজ্যবাদধ্বংস হোক!'

অনুষ্ঠান শেষ হলে গণেশ ঘোষ অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর ঘিরে পজিশন নিতে হুকুম দিলেন। অনুগামী সৈনিকেরা সঙ্গে সঙ্গে পজিশন নিয়ে শুয়ে পড়ে বাইরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন।

সেই রাত্রের চাঞ্চল্যকর ঘটনার এক বিবৃতি উল্লেখ করছি। প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ-লাইনের একজন কর্মচারীঃ "আমার নাম সঞ্জীব চন্দ্র নাগ, আমি চট্টগ্রামের পুলিশ-লাইনের রিজার্ভ সাব-ইন্স্‌পেক্টর। গত রাত্রিতে প্রায় ১০টার সময় আমি শুতে যাই। রাত প্রায় সাড়ে-দশটার সময় আমি হঠাৎ রিভলবারের ও বন্দুকের গুলীর আওয়াজ এবং 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনি শুনতে পেয়ে জেগে উঠি। আমি দরজা খুলে আমার কোয়ার্টারের সামনের বারান্দায় এসে দেখতে পাই ৩।৪টি মোটর গাড়ী অস্ত্রাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই সঙ্গেই দেখতে পেলাম অনেকগুলো টর্চ জ্বলছে ও প্রায় ৩০।৪০ জন লোক অস্ত্রাগারের সামনে জড়ো হয়েছে। তারা গুলী ছুঁড়ছিল। অবস্থা দেখেই আমি বুঝলাম যে বিপ্লবীদল পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছে।—সুতরাং আমি ছুটে পুলিশ ব্যারাকে গেলাম এবং পুলিশ বাহিনীর সবাইকে চেঁচিয়ে বললাম যে বিপ্লবীদল আমাদের অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছে। তারা যেন তাদের সাধ্যমত উপায় অবলম্বন করে। আমি তারপর আমার এ্যাসিষ্টেণ্ট্‌ সাব-ইন্স্‌পেক্টর প্রতুলচন্দ্র বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের বাংলোতে যাই এবং তাঁকে ও ডি, আই, জি,-কে (তিনিও তখন সেখানেই ছিলেন) সমস্ত পরিস্থিতি জানাই। পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের নির্দেশে আমি কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশনে

যাই এবং সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে খবর দিই। তারপর আমি ডেপুটি পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ও গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর-কেও সংবাদ দিই।

রাত প্রায় ১২-৩০ মিঃ সময় আমি, আবদুল-আজিম খান (জনৈক পুলিশ কর্মচারী), যোগেশ চন্দ্র দাস (পুলিশ কর্মচারী) ও ডেপুটি-পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ৩।৪ জন কনষ্টেবলকে নিয়ে এবং সঙ্গে দুটো মাস্কেট নিয়ে পুলিশ-লাইনের কাছে গেলাম এবং গিয়ে দেখতে পেলাম বিপ্লবীরা তখনও প্রচণ্ডভাবে গুলী ছুঁড়ছে—তাই আমরা তাদের কাছে যেতে পারলাম না। আমরা এক বস্তির ভিতর লুকিয়ে রইলাম। এই বস্তিটি অস্ত্রাগারের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখান থেকে এনর্কিষ্ট্দের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম।”

খবর পেয়ে এ্যাসিষ্টেণ্ট্ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ মিঃ লুইস্ তাঁর আর্দালীকে নিয়ে পিস্তল হাতে পুলিশ-লাইনের দিকে ছুটে এলেন। আর্দালীর কাঁধে বন্দুক। তারপর তাঁদের কী দুর্দশায় নর্দমায় কাটাতে হ'য়েছিল তা' সরকারী তথ্য থেকেই জানা যায়। তথ্যে আছে—“We may here relate the previous adventures of Mr. Lewis .. ..On being apprised by a Constable of the attack on the police-lines he went outside and heard firing and shouting in that direction. Arming himself with a Pistol and his Orderly with a shot gun he set off accross country on foot and emerged on the parade ground at the liues where they were fired upon. They shouted. 'Don't shoot, we are Police'. Where upon the firing became more intense. They took cover in ditch there for about three quarters of an hour during which, Mr. Lewis says, firing went conti-

nuously from the direction of the reserve office. He could see the electric torch lights and figures moving... . " (Judgement of Ctg. Armoury Raid Case No-1)

লুইস্ সাহেব ভেবেছিলেন পুলিশেরা হয়ত অস্ত্রাগার পুনরুদ্ধার করেছে—এত গুলী সব বিপ্লবীদের লক্ষ্য করেই ছুটছে। কারণ বিপ্লবীদের হাতে এত মাস্কেট্রি ভাবতে পারেননি। তাই তিনি—'আমরা পুলিশ—গুলী ছুঁড়োনা' বলে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ফল হলো উল্টো। গুলীর গতি হ'লো আরও তীব্র—সংখ্যায় আরও অনেক বেশী।

পুলিশ-লাইনে হেড্ কোয়ার্টার বসাবার পর বিপ্লবীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে চারিদিকে পাহারার ব্যবস্থা করলেন। টর্চ লাইটের তীব্র আলো সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরছে।

এমন সময় তাঁরা দেখতে পেলেন দূরে হেড্লাইট জ্বালিয়ে ছুটে আসছে একটি গাড়ী। পাহারাদাররা সতর্ক হ'লো—শক্তহাতে পিস্তল ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। গাড়ী কাছে আসতেই একজন পাহারাদার হাঁকলো—"Halt! put off lisht!" গাড়ীর আলো নিভলো।

গাড়ীর আরোহীরা তাঁদের পরিচয়ের সঙ্কেত দিলেন।

না, শত্রু নয়, স্বয়ং অম্বিকা চক্রবর্তী বিজয়বার্তা নিয়ে সদলবলে ফিরে এসেছেন। মহোল্লাসে বার বার কণ্ঠে কণ্ঠে জয়ধ্বনি ভেসে উঠলো—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।'

মাস্টারদা এগিয়ে গিয়ে অম্বিকাদাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন, উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—'কেউ হতাহত হয়নি তো?'

অম্বিকা চক্রবর্তী বল্লেন—কেউ-ই না, বিনা রক্তপাতে টেলিফোন ভবন ধ্বংস করেছি।'

ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল ও

রিভলবার নিয়ে অন্যান্যদের মত আক্রমণের ও আত্মরক্ষার জন্য শুয়ে পড়ে পজিশন নিলেন। এখনও দু'টো দলের কোন খবর তাঁরা পাননি। একদলে আছেন নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, মনোরঞ্জন সেন, অমরেন্দ্র নন্দী, প্রভৃতি—তাঁরা ইউরোপীয়ান্ ক্লাব ধ্বংস করতে গেছেন ; আর অন্যদলে আছেন লোকনাথ বল, নির্মল সেন, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী শান্তি নাগ, ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, নিতাই ঘোষ ও প্রভাস বল। তাঁরা গেছেন অক্সিলিয়ারী ফোর্স আর্মারী আক্রমণ করতে।

এক অজানা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা তাঁদের ব্যাকুল করে তুলেছে। অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করে রয়েছেন—এই বুঝি ওরা এসে গেল। শিরায় শিরায় উত্তেজনায়, বৃটিশের অত্যাচারের প্রতিশোধের প্রতিহিংসায়, রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। ঐ ঘৃণিত পশুদের সঙ্গে অন্য কোন রকম আপোষ নেই—আপোষ শুধু রক্তের মোকাবিলায়। এই মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই নির্মম সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিংসার দ্বারাই হিংসাকে জয় করতে হ'বে। স্বাধীনতা সংগ্রামে দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোন অহিংস সমাধান সম্ভব নয়, তা হ'তে পারেনা।

"Blessed are those who shall live
The days of the glory to see—
But the next dearest blessing on earth
I's the pride of thus dying for thee—"

এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম! এ সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম !! ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়, অতীতের কোন ঘটনার ভিন্নতর নিয়মে অনুরূপভাবে নিষ্পন্ন হওয়া। ইহা স্বাভাবিক। অবস্থা এবং ঐতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যে ঘটনা প্রবাহিত হ'য়ে থাকে। দেশপ্রেমের প্রেরণা সশস্ত্রভাবে সংহত হয়েছিল একদিন হল্‌দিঘাটের পার্বত্য প্রদেশে। দেশরক্ষার ও দেশপ্রেমের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রণক্ষেত্রে তাদের পরিণামের চিত্র ইতিহাসের পাতায় আরও আছে কিন্তু প্রকৃতিতে হল্‌দিঘাট হ'য়েও তা' হুবহু হল্‌দিঘাটের প্রতিচ্ছবি বলতে পারিনা। দেখা গিয়েছে যে, সংখ্যাবলে ও অস্ত্রবলে বিপুলতা না থাকলেও মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল সংখ্যক ও শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করেছে। আগেও বলেছি সংখ্যাবলই সংগ্রামের বড় সহায় নয়, বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের আকুতি অসাধ্য-সাধনের ইতিহাস সৃষ্টি করে। দেশপ্রেমের প্রেরণার কথা বাদ দিয়ে যুদ্ধের তথ্য ও জয়-পরাজয়ের সত্যাসত্যের উপর এই বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উত্তর-আফ্রিকার রণাঙ্গণের চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখতে পাই, মুসোলিনীর বিরাট বাহিনী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও বিপক্ষের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ কয়েকটি ব্রিগেডের আক্রমণে খুব সহজেই বিপর্য্যস্ত ও পরাভূত হয়েছিল। আকারে প্রকারে বিশাল হলেও মুসোলিনীর বাহিনী যেন কাঠের সেপাই বাহিনীর-মত অপদার্থতার জঞ্জালের নিষ্করুণ চেহারা নিয়ে রণাঙ্গণে ধরাশায়ী হ'য়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। সেদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বর্ষা শুরু। মোগলবাহিনীর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর অধীনে বর্ষাশেষের অপেক্ষায় শিবিরে দিনযাপন করছে। বর্ষা শেষ হ'লেই তারা দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা শিবাজীর দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু শায়েস্তা খাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। বর্ষার আকাশে বিদ্যুতের চকিত চমকের মত

শিবাজীর সামান্য সংখ্যক সেনাবলের আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ নিজেই শায়েস্তা হ'লেন। তাঁর শিবির ছিন্নভিন্ন হ'লো। আকারে প্রকারে সামরিক চণ্ডতা হিংসাশ্রয়ী না হ'য়ে পারেনা, কিন্তু তাদের ভীরু হৃদ্‌পিণ্ডে পরাভবের ভয় প্রবল। শায়েস্তা খাঁর সশস্ত্র সংখ্যাবল নির্বল হ'য়ে ভয়ানক পরিণামে পরিণত হলো।

এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে বৃটিশ সামরিক ঔদ্ধত্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। শুরু নয়, শেষও নয়, আজকের এই প্রস্তুতি, পরাধীনতার বন্ধনমোচনে মুক্তির যে সংগ্রাম তা' সেই শেষ পরিণামের শুরু!

একটি বেবী-অষ্টিন্ ,সঙ্কেত ধ্বনি দিতে দিতে এসে থামলো। ধীর ও মন্থর গতিতে হেঁটে আসছে গাড়ী থেকে নেমে পাঁচজন—নরেশ রায়ের নেতৃত্বে তার দল ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের মুখে বিজয়ের উল্লাস কই? এত মর্মাহত, এত বিমর্ষ কেন তারা? পুলিশ-লাইন বিজয়ীদের সার্বিক জয়ের উৎসবে তারা এত নিরাশ এত ম্লান কেন?

মাস্টারদা জিজ্ঞেস করেলেন, "নরেশ, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?" নরেশ—"আমরা দৈহিক সুস্থ, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসেছি।" মাস্টারদা হতাশ হ'য়ে পড়লেন। ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করলেন—"বার্থ হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত ফিরে এলে? সব খুলে বল কি হয়েছে!"

নরেশ সব ঘটনা বলতে লাগলো—"আমরা অতি সন্তর্পণে ইউরোপীয়ান্ ক্লাবঘরের কাছে গিয়ে পেঁছালাম। প্রত্যেকেই পিস্তল, বোমা, কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঝটিকাবেগে বিভিন্ন দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকে পড়ি—কিন্তু আশ্চর্য্য! হলঘর একেবারে শূন্য! ছুটে পাশের ঘরগুলোতে গিয়ে ঢুকলাম, কিন্তু সেখানেও একই দৃশ্য! কামরার পর কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একজন সাহেবকেও পেলাম না। সামান্য কয়েকজন বেয়ারা

ছিল। তাদের আশ্বাস দিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম—সাহেবরা সব সাড়ে আটটা—নটার মধ্যে বাড়ী চলে গেছে। প্রতিশোধ নিতে পারলাম না, মাস্টারদা।"

মাস্টারদা—"শহর আমাদের দখলে, প্রতিশোধ আমরা নেবোই।"

এই ভয়াবহ রাত্রিতে পুলিশ-লাইনে একজনকে দ্রুত পা ফেলে আসতে দেখা গেল। পরণে সামরিক পোষাক। কাছে আসতেই একজন রক্ষী হুকুম দিল—"Halt! Hands up!" হাত তুলে আগন্তুক উত্তর দিল—"আমি কালী।" একজন বিশ্বস্ত বিপ্লবী। গোসাই ভাঙ্গার কালীকিঙ্কর দে। কালীকিঙ্করকে দূর দূর গ্রামে মাস্টারদা পাঠিয়েছিলেন।—ক্ষীবোদ মোহন, অর্ধেন্দু দত্ত ও প্রফুল্ল মল্লিকের কাছে রাত্রে এই বার্তা দিয়ে যে তারা যেন রাত আটটার পরিবর্তে রাত দশটার পর নির্দ্দিষ্ট প্রচাবপত্রগুলো বিলি করে। কালীকিঙ্করকে মাস্টারদা খুব বিশ্বাস করতেন। কাজের ভার দিয়ে তাকে পাঠাবার সময় তিনি যে উক্তি করেছিলেন তা' থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়।

তিনি বলেছিলেন—"দেখ কালী! তোমার উপর কতখানি গুরুতর দায়িত্ব দিলাম। তুমি ইচ্ছে করলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার, আবার অ্যাকশনে যাওয়ার মুখে যদি মনে ভয় হয়, তবে এই যে তুমি যাচ্ছ, আর ফিরে নাও আসতে পার। যাই করনা কেন—বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই তুমি করবেনা—এ বিশ্বাস আমার আছে। ভরসা করি তুমি আমার এই বিশ্বাসের অবমাননা করবে না। আরও বিশ্বাস করি, তুমি সময়মত ফিরে আসবে।"

হ্যাঁ, কালীকিঙ্কব মাস্টারদার আবস্থার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। জীবনের বিচিত্র ঝুঁকি নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম থেকে গ্রামে বিশ্বস্ত অনুচরের মত তার সর্বাধিনায়কের নির্দেশ পেঁাছে দিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। তাই দেখে মাস্টারদার খুশির অন্ত ছিলনা। সবাইয়ের বিজয় গৌরবে সেও অংশ নিল।

পুলিশ-লাইন দখল করার পর প্রায় আধ-ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে যখন পুলিশ-লাইন আক্রান্ত হয় ঠিক সেই সময়ে লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে অক্সিলিয়ারী আর্মারী আক্রান্ত হয়েছিল। রাত দশটার পর ডজ্ গাড়ী নিয়ে লোকনাথ বল এসে থামলেন অস্ত্রাগারের সামনে। সঙ্গে আরও পাঁচজন সশস্ত্র সহযোদ্ধা।

পাহারারত সিপাহী হাঁক দিল—হল্ট্!

গাড়ীর ভিতর থেকে একজন জবাব দিল—ফ্রেণ্ড্স্।

তারপর লোকনাথ বল নামলেন—গায়ে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের পোষাক। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই গাড়ী থেকে নেমে তাঁকে 'স্যালুট' করলো। দূর থেকে প্রহরী তা' দেখে নিঃসন্দেহ হ'লো যে নিশ্চয়ই কোন অফিসার ইন্স্পেক্শনে এসেছেন।

কাছে আসতেই সিপাহী দারুণভাবে লোকনাথ বলকে 'স্যালুট' ঠুকে দিল। কিন্তু তাকে হতচকিত করে দিয়ে জেনারেল বলের পিস্তল থেকে গুলী ছুটে এসে তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। বারান্দার উপর সশব্দে লুটিয়ে পড়লো সিপাই-এর রক্তাক্ত দেহ। ফায়ারের আদেশ পেয়ে বিপ্লবীরা মুহূর্মুহু গুলী ছুঁড়ে যেতে লাগলো। অস্ত্রাগারের প্রহরারত সিপাইরা মুহূর্তে যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়ে গেল। অস্ত্রাগার রক্ষার চেয়ে প্রাণরক্ষার তাগিদ্ তাদের কাছে বেশী।

ইংরেজের সুরক্ষিত অস্ত্রাগার কয়েকমিনিটের মধ্যেই বিপ্লবীরা দখল করে নিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনন্ত সিংহের সঙ্গে হিমাংশু ও মনোরঞ্জন সেন, হরিগোপাল বল (টেগ্রা) এসে হাজির হ'লো অস্ত্রাগারের কাছে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হলোনা যে অস্ত্রাগারের সবকিছু অধিকৃত। গাড়ী থেকে তারা এগিয়ে যেতে লাগলো। লোকনাথ বল চীৎকার করে উঠ্লেন—"Who comes there ?"

অনন্ত সিংহ উত্তর দিলেন—"Gen. Sinsh and the party"

লোকনাথ বল আবার বললেন হুঁশিয়ারী দিয়ে—"A few men of enemy camp are hiding there. Take the side track on your left and join us."

অস্ত্রাগার দখল করে তাঁরা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করলেন চারদিকে। গুলীর আওয়াজ শুনে অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সার্জেন্ট্ মেজর ফ্যারেল্ তার কোয়ার্টার থেকে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে এলেন অস্ত্রাগারের দিকে। একজন রক্ষী 'হল্ট্' বলতেই ফ্যারেল্ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ততোধিক দ্রুত আবার কোয়ার্টারের দিকে ছুটলেন। বুঝলেন অস্ত্রাগারে তার বেতনভুক্ প্রহরীরা নেই। তার মাথায় সব গোলমাল ঠেকতে লাগলো।

সাহেব পুনরায় রিভলবার হাতে ছুটে আসতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসে আর পেঁীছাতে পারলো না। কয়েক পা-র ব্যবধানেই গুলী খেয়ে পড়ে গেলো। তার স্ত্রীর কাছে অনুরোধ গেল—"Darling! Darling! Phone to the Police."

দু'শ বছরের নৃশংসতার চরম প্রতিশোধ—সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারীদের রক্তের ঋণ রক্তেই পরিশোধ! এই দৃশ্য দেখে ফ্যারেল্-পত্নী তাদের পরিবারের অন্যদের প্রাণভিক্ষা করে সকরুণ আর্তনাদে আকুতি জানালো।

লোকনাথ বল দৃঢ়ভাবে বললেন—"Stay in Don't come out—then you are Safe"

অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙ্গে এবার অস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে হ'বে। সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন কার্তুজের। কারণ সিপাইদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু রাইফেল্ তাদের আছে, কিন্তু কার্তুজ সব ফুরিয়ে গেছে। আরও বড় রকমের বিপর্য্যয় রুখতে হ'লে প্রচুর কার্তুজ প্রয়োজন—প্রয়োজন আরও আগ্নেয়াস্ত্র। দরজা ভাঙ্গতে তাদের খুব বেগ পেতে হ'লো। বৃটিশ অস্ত্রাগারের দরজা সহজেই ভাঙ্গা যাবে—একথা ভাবা যায় না।

পর পর দুটি দরজা ভাঙ্গতে পারলে অস্ত্রাগারে তবেই অনুপ্রবেশ সম্ভব হবে, অন্যথায় ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে ফি:র যেতে হবে। প্রথম দরজা হাতুড়ি-শাবলের আঘাতে ভাঙ্গা গেল না। শেষ পর্য্যন্ত দরজার হাতলের সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে তা ডজ্ গাড়ীটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'লো।

মাখন ঘোষাল গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল—দারুণ উৎসাহভরা মুহূর্ত! কৌতূহল ও উদ্দীপনা নিয়ে সবাই দরজার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে—কি হয়, কি হয়! মাখন ঘোষাল আরও একটু চাপ দিল স্পিডোমিটারে। তারপর মাত্র কয়েক মুহূর্ত! চটাং করে খুলে দু'ফাঁক হ'য়ে গেল দৃঢ় লৌহ-কপাট।

আরও একটি দরজা। ভিতর দিকে পাল্লা খোলা যায় এই দরজাটির। বোল্টের এই দরজা যেন উপহাসের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভিতরে থরে থরে সাজানো আর্মি-রাইফেল্। নীচে একটি করে বাক্সো বসানো—বোধহয় কার্তুজ ভর্তি আছে। আলতারাকের উপর দুটো বড় বড় তালা ঝুলছে। বিপ্লবীদের সমস্ত শক্তিকে যেন বিদ্রূপ করে পাঞ্জা লড়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জের কাছে বিপ্লবীরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়। তালা ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি নাই-বা কার্য্যকরী হলো! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বৃটিশ-শক্তিকে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাফল্যের পর সাফল্যের জয়মাল্য লাভ করেছে, যারা সুকঠিন আঘাতে বৃটিশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গবার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের শক্তির কাছে এই সামান্য তালা বাধা হয়ে দাঁড়াবে!

রাইফেল চাই—কার্তুজ চাই—কোন বাধাই তাদের রুখতে পারবে না। অসম্ভবের ফাঁদে তারা পা দিতে রাজী নয়। 'Impossible is the word found in the dictionary of fools.'

লোকনাথ বল রজত সেনকে ডাকলেন—"চল রজত, একসঙ্গে আমরা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারি।"

সকলের একযোগে তীব্র ধাক্কার মোকাবিলা বৃটিশ আর্মারীর লৌহ-কপাট করতে পারলো না। ঝন্ ঝন্ শব্দে সবেগে দু' পাল্লা খুলে গিয়ে দু' দেওয়ালে ঘা' খেয়ে আবার ফিরে এলো।

অবিশ্বাস্য ঘটনা কিন্তু অতি সত্য।

অসম্ভব কি? তাঁদের রক্তস্রোতে বইছে সংগ্রামের তীব্র অগ্নিধারা! দেশপ্রেম অমিতশক্তির অধিকারী করেছে তাঁদের। এ যেন এক ঐশ্বরিক শক্তি তাঁদের আশ্রয় করে বলীয়ান করে তুলেছে।

এতদিনে তাঁদের সাধনার ধন মিললো। তাদের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হ'তে চলেছে। রাইফেল, রিভলবার ও লুইস্‌গান— যত প্রয়োজন ছিল তারা তুলে নিলেন। মহানন্দে কার্তুজ ভেবে সবাই নীচে বসানো বাক্‌সগুলো তুলে খুলে সব বোকা বনে গেল। সব ফাঁকা। বাক্‌সগুলোতে কার্তুজের পরিবর্তে ছিল ক্রস্‌বেল্ট, হ্যাভারস্যাক্ প্রভৃতি। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো সবাই। আর্মারী ও ম্যাগাজিন যে সামরিক রীতি অনুসারে এক জায়গায় কখনও থাকেনা—এ বিষয়টা বিপ্লবীদের অজানা ছিল।

সুতরাং কার্তুজের অভাবে এই বিশেষ ধরণের সামরিক অস্ত্রাদি কাজে লাগানো সম্ভব হ'লো না। হতাশায় অবসাদে সবাই ভেঙ্গে পড়লো। এমনি সময় সার্জেণ্ট্ ব্ল্যাবার্ণ, কলেন্ ও আরও দু'জন জাহাজের সামরিক অফিসার ঘটনাস্থলে এসে পড়লো। তারা ফিরছে স্ফুর্তির নেশা নিয়ে। আর্মারীর মধ্যে অপরিচিত লোকের আনাগোনা ও চীৎকার শুনে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'লো।

নেশায় জড়িয়ে জড়িয়ে ব্লার্কবার্ণ চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো— "Who are you? What do you want?"

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের প্রশ্নের জবাব ছুটলো গুলীর মুখে।

বেগতিক অবস্থা দেখে সাহেবদের নেশা ছুটে গেল। ব্লার্কবার্ণ

তার সঙ্গীদের ডাক দিয়েই ছুট দিলো প্রাণপণে। কলেন্ দিশাহারা হ'য়ে পড়লো। তার দিকে আরও কয়েকটা গুলী বর্ষিত হওয়ায় সাহেব গড়াতে গড়াতে ঝোপের আড়ালে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে মরার মতন পড়ে রইলো। কোমরে তার একটা গুলীও লেগেছে। অসহ্য যন্ত্রণাকে চেপে পড়ে রইলো সেখানে সুযোগের অপেক্ষায়।

একটু পরেই সার্জেণ্ট্ মোর্শেদ্ এসে হাজির। আর্মারীর দিকে অগ্রসর হ'তেই দু'জন রক্ষী হাত তুলতে নির্দেশ দিল। মোর্শেদ্ ভেবেছিলেন বোধ হয় তারা মজা করছে। তাই বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"এই গাধারা, কি হচ্ছে?"

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কঠিন স্বরে রক্ষীরা পুনরাদেশ দিতেই সে ঘাবড়ে গিয়ে হাত তুললো। কিন্তু কি ব্যাপার? লোকনাথ বলকে দেখে মোর্শেদের মনে হয়েছিল ক্যাপটেন্ টেট্। কিন্তু এখন তারই মুখে মোর্শেদকে গুলী করার আদেশ শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে মোর্শেদ নিমেষে কৌশলে ছুট দিলো। কোন রকমে উপস্থিত বুদ্ধির ফলে আত্মরক্ষা করলো। এতক্ষণে মোর্শেদ বুঝতে পারলো আর্মারী এখন কাদের দখলে। ক্যাপটেন টেটের মত দেখতে স্বয়ং লোকনাথ বল।

এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি মামলায় জজের কাছে—যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা' উল্লেখযোগ্য :—

"Segt. Marshead appears to have displayed that night conspicuous courage, resource and presence of mind.........when near the gate across the Pahartali Road he heard fire on six reports in quick succession from the direction of the A. F. I. armoury and immediately after two more shorts..........The figures. were moving about and

three or four of them were flashing torchlights about. At first he took them to be members of the Auxiliary Force as they were dressed in khaki and were inside the Armoury compound one man among them he noticed in particular who was dressed in khaki, ware a khaki topi and sam Brownbelt and appeared to him to be A. F. I. Adjutant, Capt. Taitt......As he approached two figures dressed in khaki suddenly appeared on the verandah one of them being the stout man he had taken for Capt. Taitt. This individual pointed a revolver at him and his companion pointed a rifle or musket at him and they shown a powerful electric torch on him and one of them shouted—'Hands up.' Marghead did not do so but being still under delusion that they were members of the Auxiliary Force, who were playing a rather crude practical joke on him, cried 'Don't be silly ass' The answer was a repetition in a louder and more peremtory tone of the order to put his hands up. He did so, Saying, 'All right they're up—what's the matter ?' He was then about 7 or 8 yards off from them. After a panse of a few seconds the man with the torch and revolver whom—he still thought to be Capt. Taitt., said, 'That is one of them—shoot.' He spoke in English but with an unmistakable Bengali accent. Realising

them that they could not be members of the Auxiliary Force, Marshead ducked and ran back and simultaneously they both fired at him. As he reached the main gate they again fired but again missed. Not stopping to pick up his cycle he ran along the road and turning up towards Piccadilly Circus, met a car in which was Capt. Carter the master of a B. I. ship. He asked Capt. Carter to take him to the police-lines. By this time he realised that the man who had attempted to shoot him was not Capt. Taitt and he had come to the conclusion that the A. F. I. armoury had been attacked by local revolutionaries and that the stout man in question was one of them Lokenath Bal, whom he knew by sight." (Judgement Ctg. Armoury Raid case).

বিপ্লবীদের পদদলিত আজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শক্তির দম্ভ এই আর্মারী। শত্রুর প্রধান সামরিক ঘাঁটি বিপ্লবীসেনাদের দখলে।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্যাপটেন্ টেট্ একটি ছোট দল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। এসেই বীরদর্পে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করলেন—"টুম্ লোগ্ কোন্ হ্যায়?"

প্রত্যুত্তরে লোকনাথ বল বললেন—"Halt, not a step further—I will shoot you."

ক্যাপটেন্ টেট্ 'নেটিভ্' এর হুকুম মানতে রাজী নয়। ইংরেজরা বাঙালীদের হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত নয়। দীর্ঘকাল ধরে ওরা আমাদের হুকুমের দাস করে রেখেছে। —অত্যাচার

নিপীড়নের নিষ্পেষণে আমাদের অস্থিসার করে দিয়েছে, ভেঙ্গে দিয়েছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ওঠার সাহস। তাইতো ইংরেজ কর্মচারীর এত দম্ভ।

ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো ক্যাঃ টেট্—'Halt, বাঙ্গালী কুত্তা!'

জেঃ বলের অপমানে সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। তিনি চীৎকার করে তাঁর সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন—"Get ready with bombs. Ready—follow me—charge!"

এই দৃপ্ত আদেশের ধ্বনি শুনে সাহেবের মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। বলে কি? বাঙ্গালী 'নেটিভ'-দের এত স্পর্ধা ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রমণের আদেশ!

সাহেবকে আর ভাবতে হ'লোনা—কয়েকটা গুলীর আওয়াজ হ'তেই এই বীরপুঙ্গবের আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে যাবার উপক্রম। এত দম্ভ, এত বিক্রম, অহঙ্কার ভয়ে কর্পূরের মত তৎক্ষণাৎ উড়ে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল! ক্যাঃ টেট্ তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে 'পড়ি কি মরি' করে দে ছুট্।

খানিক বাদেই বিপ্লবী একজন প্রহরী লক্ষ্য করলেন দূরে—জোরালো হেড্লাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর তীব্রগতিতে ছুটে আসছে। আসছে এই আর্মারীর দিকেই। সকলেই সতর্ক হ'য়ে গেল। জেঃ বল তৎক্ষণাৎ একটি টেক্নিক্যাল পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গাড়ী কাছে আসতেই রক্ষী হাঁক দিল—"Who comes there, Halt!"

গাড়ীর ভিতর থেকে উত্তর ভেসে এলো—'ফ্রেণ্ড্স্।'

তারপর স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্ উইল্কিন্সন্ জেঃ বলকে ক্যাপটেন্ টেট্ মনে করে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে লাগলেন। জেঃ বল গাড়ী দেখেই চিনেছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট্ এসেছেন। আর দেরী না ক'রেই কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করলেন গাড়ীর উপর। উইল্কিন্সন্

বিপদ বুঝে ত্বরিত্‌গতিতে ছুটে গাড়ীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর অতি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

তাঁর আর্দালি নিহত হ'লো, নিহত হ'লো কনষ্টেবল জরাসিন্ধু বড়ুয়া আব আহত হ'লো ড্রাইভার বীরমন থাপা। উইল্‌কিন্‌সন্‌ অতি তৎপরতায় সাফল্যের সঙ্গে পলায়ন করে ছুটলেন ষ্টেশনের দিকে কর্ত্তব্যে অটল থেকে। সেখানে গিয়ে তিনি ওয়ারলেসে বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ পাঠালেন।

গাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হোল। এত পরিশ্রম এত বিপদের ঝুঁকি কিন্তু পুরোপুরি সফলকাম হ'লো না কার্তুজহীন অস্ত্রাদি শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্প্রাণ, নিরর্থক। শক্তিশালী ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত অস্ত্র ব্যতিবেকে কোন সুদৃঢ় প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করা সম্ভব নয়। লোকনাথ বলের আদেশে অস্ত্রাগারে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো। সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ বিপ্লবের আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মে পরিণত হতে লাগলো। বিপ্লবী স্কোয়াড আশা হতাশায় ভরা মন নিয়ে তাদের গাড়ীতে এসে বসলেন। তারপর আর্মারী ছাড়িয়ে দু'টি গাড়ী পুলিশ-লাইনের দিকে ছুটে চললো।

এদিকে চট্টগ্রামের এই বিদ্রোহী বাহিনী যখন অস্ত্রাগার দখল করছিল, তখন অন্যদিকে রেলওয়ে-ধ্বংসকারী আর একটি দল শহর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে ধূম ষ্টেশনে একখানি মাল গাড়ীকে লাইনচ্যুত করে। লাঙ্গলকোটে টেলিগ্রাফের বিস্তীর্ণ এলাকায় তার কেটে সংযোগ ব্যবস্থা আরও বিপর্য্যস্ত করে দেয়। বিভিন্ন এলাকায় ফিস্‌প্লেটের সারি সরিয়ে ফেলে। তিনটি ফিস্‌প্লেট, সমস্ত ডগ্‌স্পাইক্‌ অপসারিত করে তারা মেলট্রেণের গতিরোধ করে দেয়। ফলে নানাস্থানে প্রশাসনিক সংযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে।

রাত বারটা। পাহাড়ের গা ধরে দু'টি গাড়ী স্বাভাবিক গতিতে

চলেছে। নিস্তব্ধ নির্জন জনপথ। শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াবার জন্য গাড়ীর হেড্‌লাইট্‌ নেভানো ছিল। দেখতে দেখতে তারা পুলিশ-লাইনের কাছে এসে থামলেন। সকলে মিলে একত্রে বিজয়োল্লাসে মুহূর্মুহূ জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। তারপর মাস্টারদা সব খবর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে একটিও কার্তুজ পাওয়া যায়নি শুনে তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—"তা কি করে সম্ভব? লুইসগান, ম্যাগাজিন রাইফেল অকেজো হয়ে থাকবে?"

তাঁর কপালে চিন্তা ও হতাশার রেখা ফুটে উঠলো। পুলিশ-লাইন থেকেও পূর্বের সংগৃহীত কার্তুজই ভরসা করে লড়াই করতে হবে!

অম্বিকা চক্রবর্তী হতাশায় প্রশ্ন করলেন—"তা' হলে এখন উপায়? লুইস্‌গান, ম্যাগাজিন রাইফেল ছাড়া আমরা কতক্ষণ লড়তে পারবো?"

চিন্তাব ছায়া গণেশদার মুখেও—চিন্তা সকলের।

তবু তাঁরা নূতন করে সাহসে বুক বাঁধলেন। হতাশায় ভেঙ্গে পড়া মনগুলোকে আবার শত্রুসংহারী মনোবলে প্রাণবন্ত করে তুলতে লাগলেন। তাঁরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি সঙ্গে নিলেন। বাকী অস্ত্রশস্ত্র যা'তে শত্রুর ব্যবহারে আসতে না পারে সেজন্য পুলিশ-লাইনের অস্ত্রাগার কক্ষগুলোতে অগ্নিসংযোগের দায়িত্ব দেওয়া হ'লো হিমাংশু সেনের উপর। সুস্পষ্ট ও সক্রিয় সামরিক সিদ্ধান্ত নেতৃবৃন্দ এখনও নিতে পারেননি। প্রতিকূল অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি ঠিকই কিন্তু তাঁরা বৃটিশের সাংগঠনিক শক্তিকে একেবারে উপেক্ষাও করতে পারেন না—তা' যদি করেন তা' হলে দূরদর্শিতার অভাবে দূরবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। প্রতিকূল অবস্থা আসতে পারে এবং সেজন্য রণনীতি ও রণকৌশল অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে

নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গের তরুণ সাথীদের মনে আছে দুর্জয় সাহস—তাঁদের কাছে এক বিরাট শক্তি।

রাত তখন প্রায় দু'টো। ঠিক হলো পুলিশ-লাইনকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহী-বাহিনী যাবে কাছারি পাহাড়ে এবং সেখানকার ইংরেজদের বিচারালয় দখল করে অন্যায় অবিচারের বাণী ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে সেই বিজয়-কেন্দ্রে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের স্বাধীন বিজয়-কেতন স্থাপন করবেন। এই চূড়ান্ত অভিযানের জন্য যখন তাঁরা যাত্রা শুরু করবেন ঠিক সেই সময় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত শুরু হ'লো। ট্যাট্—ট্যাট্—ট্যাট্।

অবিরাম গুলী ছুটে আসছে মেসিনগান থেকে—পুলিশ-লাইনেব পাকা দেওয়ালে অসংখ্য ছিদ্রেব দাগ বসিয়ে দন্তেব দাঁত ফুটিয়ে দিচ্ছে। খুব কাছাকাছি জায়গায় শত্রুপক্ষ পজিশন নিয়েছে নিঃসন্দেহে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্দেহেব নিরসন ঘটলো। শত্রুপক্ষ নিকটবর্তী ওয়াটাব-ওয়াকসেব জলের ট্যাঙ্কেব আড়ালে পজিশন নিয়ে মেসিনগান বসিয়েছে। অক্সিলিয়ারী আর্মারী তো লুণ্ঠিত-বিধ্বস্ত, পুলিশ-লাইন তো বিদ্রোহ-বাহিনীর এখন দখলে বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে—শত্রুপক্ষ এত তাড়াতাড়ি এই মেসিনগান সংগ্রহ করে আনলো কোথা থেকে?

বিদ্রোহী বাহিনীকে এখানে ভুলের মাশুল গুনতে হ'বে।

চট্টগ্রামে শত্রুপক্ষের দু'টি অস্ত্রাগাব—একটি পাহাড়তলীতে অন্যটি ডবলমুরিং-এ। প্রথমোক্ত অস্ত্রাগার ইতিপূর্বেই বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছে, তা' বলেছি; কিন্তু বিদ্রোহী-বাহিনী এই শেষোক্ত ডবলমুরিং-এর দ্বিতীয় খুব ছোট অস্ত্রাগারটির কোন গুরুত্বই বোধ হয় দেয়নি। দিলে এই অস্ত্রাগাব ধ্বংস করার নিশ্চয়ই তারা পরিকল্পনা রচনা কবতেন। ছোট খুব কম শক্তির উৎস বলে তারা উপেক্ষাই করেছে বলে আমরা নিশ্চিত মনে বিশ্বাস করতে পারি। পুলিশ-লাইন ও অক্সিলিয়ারী আর্মারী দখল করার পর

হাতের হাতে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসবে তার সামনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ঐ ছোট অস্ত্রাগারের অল্পসংখ্যক অস্ত্র নিয়ে শত্রুপক্ষ মোকাবিলায় দাঁড়াতে কিছুতেই সাহস পাবেনা—এই ছিল বোধ হয় বিদ্রোহী-বাহিনীর ধারণা।

ছোট বলে যাকে উপেক্ষা করেছে তা' এখন সংহার মূর্তির রূপ নিয়েছে। বৃটিশের রণচাতুর্য্য ও সাংগঠনিক ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। বিপ্লবীদের এই আকস্মিক আঘাতে প্রত্যাঘাত হানতে তারা বদ্ধপরিকর—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এত সহজে পরাজয় স্বীকার করে পশ্চাদপসারণ করবে—তা' অসম্ভবই শুধু নয় অচিন্তনীয়ও।

স্বাধীনতাকামী মানুষকে পদদলিত করে প্রভুত্বের অঙ্গীকারে ধ্বংসের রাজনীতিতে তারা বণিকের—ছদ্মবেশে দেশে দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। বিপ্লবীবাহিনীর বিজয়-আমেজের অবকাশে এক অসতর্ক মুহূর্তে তাই তারা আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে পুলিশ-লাইনের দিকে মেসিনগানের অগ্নিগর্ভ মুখ খুলেছে।

চ্যালেঞ্জেব বজ্রনির্ঘোষে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে আসছে। চট্টগ্রাম শহরে ঢুকবার প্রধান সড়কের পাশে ওয়াটার-ওয়ার্কসের উপর পজিশন নিয়ে পথরোধ করে বসে আছে। মেসিনগানের দূব-পাল্লার গুলীর মুখে তাদের মাস্কেট্রি, বন্দুক, রিভলবার অনেক দুর্বল।

কিন্তু তাদের এত সাহস এত কৃতিত্ব একটা মেসিনগানের মুখে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে? এত পরিশ্রম এত প্রচেষ্টা অবশেষে নিছক প্রহসনে পরিণত হবে? যতখানি সাফল্য অর্জন করা গেছে তার মর্যাদা পরিপূর্ণ ভাবে রক্ষা করতেই হবে। অর্জিত শক্তিকে প্রাথমিক অবস্থাতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয় কিছুতেই। সেই সঞ্চিত শক্তিকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে।

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার আদেশে সকলে সম্ভাব্য সতর্কতামূলক পজিশন নিয়ে গুলীর মুখে গুলীর জবাব দিলেন। চৌষট্টি মাস্কেট্রি

থেকে একসঙ্গে গর্জন করে গুলী ছুটলো। মেসিনগানের গুলী থেমে থেমে শুরু হ'তে থাকে।

জেঃ লোকনাথ বলের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি মাস্টারদাকে বললেন—"গুলী বর্ষণের ধরণ দেখে মনে হয় ওরা পুন-প্রস্তুতির সুযোগ নিচ্ছে এবং আমাদের এখানেই আটক করতে চায়।"

মাস্টারদা এই সাবধানবাণীতে সতর্ক হয়ে বললেন—"এখানে আর অপেক্ষা করে কাজ নেই, এক্ষুনি পরবর্তী প্রোগ্রামে হাত দিতে হ'বে।" ইতিমধ্যে গুলীবর্ষণ দু'পক্ষই থেমে গেছে। শত্রুপক্ষ আক্রমণে ক্ষান্ত হ'লে মাস্টারদা তাঁর সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্রে আহ্বান জানালেন—

Dear soldiers of Revolution!

The great task of revolution in India has fallen on the Indian Republican Army

We in Chittagong have the honour to achieve this patriotic task of revolution for fulfilling the aspirations and urge of our nation.

It is a matter of great glory that today our forces have seized the strongholds of the Government in Chittagong: The enemy armoury has been captured : The Central Telephone Exchange of the town has been destroyed ; external telegraphic communications have been snapped ; railway lines have been removed and goods trains have been derailed, train communications have been cut off. The enemy force has been defeated. The oppressive foreign Government has ceased to exist. The

National Flag is flying high. It is our duty to defend it with our life and blood."

"The Indian Republican Army declares today for universal information and recognition the end of predatory rule and control by the British Imperialist bandits on Indian Soil in Chittagong.

Chittagong is a tiny part of India, but it is hoped and expected the achievement of today will inspire and impel our countrymen to do likewise everywhere in India and to free our entire Motherland from the unholy clutches of the British bandits before long."

"I, Surya Sen, President of the Indian Republican Army, Chittagong Branch, do hereby proclaim the e isting council of the Republican Army in Chittagong to form itself into a Provisional Revolutionary Government to carry out the following urgent tasks :

1) To defend and maintain the victory gained today ;

2) To extend and intensify the armed struggle for national liberation ;

3) To suppress the enemy agent within ;

4) To keep the criminals and looters in check ;

5) And to take further course of action what this Provisional Revolutionary Government will decide later."

"This Provisional Revolutionary Government expects and demands full allegiance, loyalty and active co-operation from every true son and daughter of Chittagong. And desires sympathy and active support from all patriots and nationalists and from every person who has the well-being and liberation of India in his or her heart."

"With full confidence in victory in our holy war of liberation !

No mercy to the British bandits !!

Death to the traitors and looters !!!

Long live Provisional Revolutionary Government !!!!

"BANDE MATARAM."

এই ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ !

ভারতে বিপ্লবের সুকঠিন দায়িত্ব ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর উপর ন্যস্ত। জাতির মনোবাসনা ও আকাঙ্খাকে পরিপূর্ণ করবার জন্য চট্টগ্রামে স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ আমরা সেই বৈপ্লবিক কর্ম সম্পাদনের গৌরব অর্জন করেছি।

অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, আমাদের বাহিনী আজ চট্টগ্রামে বৃটিশের শক্ত ঘাঁটিগুলো দখল করে নিয়েছে। শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত; শহরের কেন্দ্রীয় টেলিফোন-ভবন বিনষ্ট; বাইরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী তার ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত; বিভিন্ন স্থানে রেল-লাইন অপসারিত ও মালগাড়ী লাইনচ্যুত; ট্রেন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শত্রুপক্ষ পরাজিত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের

অস্তিত্ব অবলুপ্তির পথে। জাতীর পতাকা উড়ছে। আমাদের জীবন ও রক্ত দিয়ে এই পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য।"

"বিশ্বের অবগতি ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী আজ ঘোষণা করছে যে চট্টগ্রামে ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ দস্যুদের শাসন ও শোষণের সমাপ্তি ঘটেছে।

চট্টগ্রাম ভাবতের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ; কিন্তু এই আশা ও ভরসা করি আজকের এই অর্জিত অধিকার-কালে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের অধিবাসীদেব মধ্যে অনুরূপ প্রেরণা ও চেতনার সৃষ্টি করবে এবং অচিরেই বৃটিশ দস্যুদেব কলঙ্কিত পরাধীনতাব বন্ধন থেকে আমাদের সমগ্র মাতৃভূমিকে বৃটিশ-অধিকার-মুক্ত করবে।"

"ভাবতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি সূর্য্যসেন এতদ্বারা ঘোষণা করছি চট্টগ্রামে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর বর্ত্তমান পরিষদই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারেব দায়িত্ব নিয়ে নিম্নোক্ত জরুবী কর্মসূচী রূপায়নে নির্দেশ দান করছে ঃ—

১) আজকেব অর্জিত জয়কে রক্ষা ও সুনিশ্চিত করতে হবে;
২) জাতীয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও তীব্রভাবে বিস্তৃত করতে হবে;
৩) শত্রুব দালালদের দমন করতে হবে;
৪) সমাজ বিবোধী ও লুঠেরাদের রুখতে হবে;
৫) এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী কর্মসূচী পালন করতে হবে।"

"এই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামেব প্রতিটি দেশপ্রেমিক যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভের আশা ও দাবী পোষণ করে এবং প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের কাছ থেকে আন্তরিক সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন প্রত্যাশা করে।"

"আমাদের এই পবিত্র মুক্তিযুদ্ধে জয়ের অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে আজ শপথ নিই—

বৃটিশ দস্যুদের প্রতি কোনও করুণা নয়!

বিশ্বাসঘাতক ও লুঠেরারা খতম হোক!!

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবি হোক!!!

"বন্দেমাতরম্"

সকলের মিলিত কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো।

নূতন পরিকল্পনানুযায়ী বাইরে পাহাড়ের দিকে যাওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় পুলিশ-লাইনের অস্ত্রাগারের এক কক্ষ থেকে আগুন ঠেলে হিমাংশু সেনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। আগেই বলেছি অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগের দায়িত্ব ছিলো এই মুক্তিযোদ্ধার উপর। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে এক দুর্ঘটনায় সে গুরুতর আহত।

বিপদের মুখে আর এক বিপদ! এই অভূতপূর্ব সমস্যায় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। কি করা যায় এখন? শত্রুপক্ষের এই চ্যালেঞ্জের মুখে তাকে সঙ্গেও নেওয়া যায়না আর ফেলে রেখে যাওয়াও যায়না। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় হিমাংশু যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরাচ্ছে। কেউ বললো তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে, আবার কেউ-বা বললো—"গুলী করে মেরে ফেল"। সহযোদ্ধার এই অসহায় অবস্থায় এই জাতীয় উক্তি অত্যন্ত অমানবিক ও নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। কিন্তু সামরিক আইন বলে গুরুতর আহত সৈনিককে যদি নিরাপত্তার জন্য গোপন আস্তানায় প্রেরণ করা সম্ভব না হয় তা'হলে সমগ্র বাহিনীর নিরাপত্তার ও সুবিধার্থে আহতকে হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। অন্যথায় যন্ত্রণা কাতর আহত সৈনিক যদি শত্রুপক্ষে বন্দী হয় তা'হলে তার দুর্বল মুহূর্তে

অনেক সামরিক তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। দেশের সামগ্রিক স্বার্থে তা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক।

তাই সহযোদ্ধার প্রতি হত্যার নির্দেশ বাস্তব দৃষ্টিতে অত্যন্ত নির্মম মনে হ'লেও তা' সামরিক আইনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। শেষপর্য্যন্ত তাকে নিরাপদ গোপন আস্তানায় পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে জেঃ অনন্ত সিংহ ও জ্বরাক্রান্ত মার্শাল গণেশ ঘোষ হিমাংশুকে দ্রুত মোটর গাড়ীতে তুলে নিলেন। জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তও লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ীর ষ্টীয়ারিং ধরলো আনন্দ গুপ্ত।

বিপদের এক চরম সন্ধিক্ষণে দুই প্রধান সহনেতাকে মৃত্যুপথযাত্রী সহকর্মীকে রক্ষার জন্য চলে যেতে হ'লো। শত্রুর দিক থেকে বিপদের সংকেত—অশেষ ধৈর্য্য নিয়ে মাস্টারদার নেতৃত্বে অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করে রইলেন সঙ্গীদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায়!

সঙ্গীরা এখনও ফেরেনি। ট্যাট্-ট্যাট্-ট্যাট্। আবার ওয়াটার-ওয়ার্কসের দিক থেকে কয়েক ঝাঁক্ গুলী ছুটে এলো। মাস্টারদা প্রমাদ গণলেন। তিনি সকলকে বললেন—"আর এখানে অপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। প্রচুর সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে। ওরা না আসা পর্য্যন্ত এখনি নূতন প্রোগ্রামেও হাত দেওয়া যায়না। সুযোগের অপেক্ষায় আপাততঃ কোন নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপনই একমাত্র পথ।"

লুইস্‌গানগুলো কার্তুজের অভাবে কোন কাজে আসছে না। শত্রুসৈন্য পরে যা'তে ঐ-গান্‌গুলো তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে না পারে তাই স্থান ত্যাগের আগে মাস্টারদা সেগুলো হাতুড়ির আঘাতে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ বিকল করে দিতে বললেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রয়োজনীয় ও বহনযোগ্য আগ্নেয় অস্ত্রাদি সঙ্গে রেখে বাকী অধিকৃত সমস্ত অস্ত্র অকেজো করে দিলেন।

আহত হিমাংশুকে প্রায় রাত তিনটের সময় আনন্দ গুপ্তের

বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। সাহচর্য ও পরিচর্যার জন্য আনন্দ গুপ্তও গাড়ী থেকে নেমে গেল। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও জীবন ঘোষাল এত বিপদের মধ্যেও তেজোদ্দীপ্ত, নির্ভীক। চোখে-মুখে ভীরুতার কোন কালিমা লাঞ্ছিত নেই। সঙ্গীর জন্য দীর্ঘশ্বাস নয়—সৈনিকের হৃদয়ে দুর্বল সূক্ষ্ম অনুভূতির বিকাশের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই—দীপ্ত দৃঢ় মনোবলে তাঁরা গাড়ী ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ষ্টীয়ারিং জেঃ অনন্ত সিংহের হাতে। এখানে উল্লেখ্য, পরদিন হিমাংশু সেন চিরশান্তি লাভ করে।

তাঁরা সোজা চলে এলেন পূর্বনির্ধারিত একটি স্থানে। প্রোগ্রাম ছিল রাত্রেব আহার তাঁবা এই স্থানের পূর্বনির্দ্দিষ্ট একটি হোটেলে গ্রহণ করবেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করাব পরও যখন মাস্টাবদাব নেতৃত্বে বাহিনী এসে পৌঁছালো না, তখন এঁরা খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। কি করবেন এখন? প্রতিটি মুহূর্ত তাঁদের কাছে অতি মূল্যবান। এক একটি মুহূর্তেব অপচয়ে মারাত্মক বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আব দেবী না করে সোজা জেঃ অনন্ত সিংহের বাড়ীতে এসে সামরিক পোষাক পরিবর্ত্তন করে নিলেন। ইতিমধ্যে অনেক সময়ের অপচয় ঘটে গেল। এই অবকাশে শত্রুসৈন্য নিশ্চয়ই অনেকটা সংগঠিত হ'য়ে পড়েছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে তাদের টহল স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় সামরিক পোষাক পরে যাওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখলেন—পোষাকে যেন তিনজন ফিট্‌ফাট্ বাবুটি। কয়েক-মিনিটের মধ্যেই তাঁরা দ্রুতগতিতে আবার পুলিশ-লাইনে ফিরে এলেন।

এদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পব সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত দেখে তাঁরা ভাবলেন যে, তারা হয়ত শত্রুপক্ষের কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। অথবা মরণাপন্ন হিমাংশুকে নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত। নানা আশা-আকাঙ্খা সন্দেহের দোদুল্যমান পবিস্থিতিতে নেতৃবৃন্দ

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। এই ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁরা অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন। প্রতিমুহূর্তে যেখানে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা, মৃত্যুর করাল ছায়া যে কোন মুহূর্তে যেখানে গ্রাস করতে পারে সেখানে এক অনিশ্চিত আশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় অতিবাহিত করা মূর্খের ভাবনা ছাড়া কিছু নয়।

অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী বললেন—"এখন আব শহরের দিকে যাওয়া উচিত নয়। শত্রুসৈন্য হয়ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হতে পারে। শহরের পরিস্থিতি না জেনে এ মুহূর্তে কোন বড় রকমের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবেনা। প্রত্যেকে বহনযোগ্য সমস্ত অস্ত্র তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চল।"

তাঁরা এগিয়ে চললেন নিকটবর্তী পাহাড়ের দিকে।

এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এক অজ্ঞাত-লক্ষের দিকে চট্টলার বিদ্রোহী তরুণদল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যাত্রা শুরু করলেন। শহরের নির্জন প্রান্তসীমা থেকে পাহাড়ের হাতছানিতে তাঁরা সাড়া দিলেন—হয়ত ওখানে সাময়িক নিশ্চিন্ত বিশ্রাম মিলতে পারে—ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবসন্ন দেহগুলো আবার সতেজ করে তোলার শান্ত অবকাশ মিলতে পারে।

ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।

আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য এই আত্মগোপন নয়, আক্রমণের কৌশল ও ভূমিকা রচনার জন্য এই আত্মরক্ষা। রণক্লান্ত সৈনিকদের জন্য তাই চাই সাময়িক বিশ্রাম।

এই অবসরে পুলিশ-লাইনে জেঃ গণেশ ঘোষ প্রমূখ এসে দেখলেন সেখানে তাঁদের মূল বাহিনী নেই—অগ্নির লেলিহান শিখা সমগ্র পুলিশ লাইনকে গ্রাস করেছে। তাঁরা চিন্তিত হ'লেন। কোথায় গেলেন মাস্টারদারা? নানা উত্তপ্ত চিন্তা তাঁদের মাথার মধ্যে মেসিনগানের গুলীর মত ছুটতে লাগলো। তাঁরা ভাবলেন—হয়ত মূলবাহিনী নিরাপত্তা ও বিশ্রামের জন্য নিকটবর্তী কোন নির্জন পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

পুলিশ লাইন থেকে গাড়ী তাঁদের মোড় নিলো শহরের বাইরের একটি কাঁচা রাস্তার দিকে। অতি সন্তর্পণে ও মন্থর গতিতে তাঁরা গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন—গাড়ীর হেড্‌লাইট জ্বেলে রাখা বিপজ্জনক হ'লেও তা' তাঁরা নিভিয়ে দেননি। কারণ মনে এই আশা ছিল, ঐ লাইট ও গাড়ীর গতির মন্থরতা দেখে মূল বাহিনী দূর থেকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে এবং সঙ্কেত জানাবে। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে আসার পরও যখন কোন হদিস্ মিললো না তখন প্রায় হতাশা ও দুঃখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁরা ফিরে চল্‌লেন শহরের দিকে।

তারপর তাঁরা একটি নৌকা নিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে সমুদ্রোপকূলের পতেঙ্গা নামক এক জায়গায় নামলেন ধানের ক্ষেতের মধ্যে চাষীদের এক আটচালায় সাময়িক কালের জন্য আশ্রয় নিলেন।

ভোর হ'লেই আবার তাঁরা শহরের দিকে রওনা দিলেন। —মন তাঁদের অস্থির।

মূল বাহিনীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে।

এসে পরদিন আশ্রয় নিলেন আনন্দ গুপ্তের বাড়ীতে।

বিপ্লবীদের তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করেছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে— তারা পরাজিত নায়কের মত ভগ্নহৃদয়ে ভীরুতার আশ্রয়ে আত্মরক্ষার মন্ত্রজপে সময়ের কখনও অপব্যবহার করেনি। দলিত-নাগিনী যেমন আঘাত বুকে নিয়ে ও আঘাতকারীর সামনে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফণা তুলে দাঁড়ায়, তেমনি সংঘর্ষের বিরতির অবকাশে পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ বৃটিশ, বৃটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হৃদয় আত্ম-অবমাননায় জ্বলতে থাকলেও প্রস্তুতি রচনায় তাদের কর্তব্যপরায়ণতা ও দক্ষতার পরিচয় আমরা প্রায়ই পেয়েছি।

সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতি আক্রমণের জন্য কীভাবে তৎপরতা দেখিয়েছিলো তার পরিষ্কার ইঙ্গিত আমবা পাই নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে :

"At the Chittagong Railway station Mr. Wilkinson and Capt. Taitt Cmomandeered an engine and in it went to the Jettie's armoury from which Capt. Taitt took as many men as he could obtain, while the District Magistrate went aboard a ship and despatched a message by wireless. Then, while the armed party followed by train they both returned to the A. F. I. headquarters by car to find the building on fire and a member of European Club including Major Bark already assembled there. There set about getting the ammunition out of the magazine into a place of safety."

—চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে গিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইলকিন্‌সন্‌ এবং ক্যাপ্টেন টেট্‌ একটি ইঞ্জিন চালিয়ে জাহাজ ঘাটের আর্মরীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং কিছু লোককে অস্ত্রে সজ্জিত করেন

এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নদীবক্ষে এক জাহাজে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে বেতার বার্তা প্রেরণ করে আবার সদলবলে অক্সিলিয়ারী আর্মারীতে ফিরে এলেন। এদিকে মেজর বেকার নিরাপদ স্থানে কার্তুজের বাক্সগুলো সরাতে লাগলেন। বিপ্লবীদের এই ঈপ্সিত সম্পদ চোখে পড়েনি কারণ এক নির্জন কক্ষে এই কার্তুজের বাক্সগুলো সুরক্ষিত ছিলো। এই বাক্সগুলো যদি তাঁরা পেতেন তাহলে পরবর্তী অধ্যায়ের সংগ্রামের নজির অন্য ভাষায় লেখা থাকতো।

মিঃ উইলকিন্‌সন্ ও ক্যাপ্টেন্ টেটের নেতৃত্বে যখন একটি দল ওয়াটার-ওয়ার্কসের মাথায় বসে মেসিনগান নিয়ে আক্রমণ রচনা করেছিল তখন অন্যদিকে—এস্, পি ও ডি, আই, জির নেতৃত্বে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আরেকটি দল কর্মতৎপর হয়ে ওঠে:

"......At the same time the Superintendent of Police Mr. Johnson, with Mr. Farmer, the D. I. G. hurriedly got into uniform and after despatching constable Jorasindhu Barua to inform the District Magistrate and their orderly constables to warn Capt. Taitt and Mr. Lewis, the A. S. P proceeded by motor car to the A. F. I. Armoury in the hope of obtaining assistance there As he approached the A. F. I., Armoury and was just about to enter the gate ....rapidly coming to the conclusion that this Armoury was being attacked as well, he drove at speed straight on towards Pahartali . .... some 200 yards further along the road he overlook, running along the road towards Pahartali, three persons, one of whom he discovered to be Sergt. Blackburn of the A. F. I. He further elicited from

Sergt. Blackburn that the keys of the Pahartali subsidiary A. F. I. Armoury were kept by Mr. Barraclough. So he took Blackburn to show him the way to Barraclough's house There Barraclough was arose and set with Sergt. Blackburn to open the Pahartali Armoury while Mr. Johnson went on to alert other Pahartali-residents viz Messrs. Francis, Thomas, Proran, West, Tyres, etc. Returning with them to the Armoury, rifles and ammunition, etc. were obtained and a Lewis gun with the gunner Barraclough was placed in Mr. Francis car while four riflemen got into Mr. Johnson's car along with him and Mr Farmer. They then drove to the A F. I. Headquarter's Armoury to find the raiders had assembled .. ..The Armoury building was blazing fiercely . .Leaving the A F. I. Armoury Mr. Johnson and Mr Farmer went on to visit the Imperial Bank and Kotwali P. S as they thought that these might have been attacked as well They took with them the Assistant Superintendent of Police Mr. Lewis, who in the meantime had arrived at the A. F. I. Armoury with his orderly and Barraclough with his Lewis gun .....At the Imperial Bank, Messers Farmer and Johnson found all quiet and at Kotwali that the alarm had already been received, so they motored to the European Club garage and thence proceeded on foot over the golf course towards the police line............"

অর্থাৎ সহজ কথায় মোটামুটি অর্থ হ'ল এই—এস, পি-মিঃ জনসন্ ও ডি, আই, জি-মিঃ ফারমার ইউনিফর্ম পরে প্রস্তুত হয়ে নিলেন এবং কনষ্টেবল জবাসিন্ধু বড়ুয়া ও তাঁদের আর্দালী কনষ্টেবলদের যথাক্রমে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ক্যাপ্টেন টেট্ ও এ, এস, পি-মিঃ লুইসের কাছে পাঠিয়ে তাঁরা ছুটলেন এ, এফ, আই আর্মারীর দিকে। কাছে এসে তাঁরা অস্ত্রাগার আক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পেরে পাহাড়তলীর ছোট অস্ত্রাগারের দিকে মোটর নিয়ে ছুটলেন। পথে সার্জেণ্টে ব্ল্যাকবোর্ণ-এর দল তার সঙ্গ নিলেন। সেখান থেকে মিঃ ব্যারাকলোর বাংলোয়। তাঁদের অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করতে বলে মিঃ জনসন্ অন্যত্র ছুটলেন। তারপর সবাই আর্মারীতে এসে দেখেন আর্মারী জ্বলছে, সেখানে বিপ্লবীরা কেউ নেই। সবাই তৎক্ষণাৎ পুলিশ-লাইনের দিকে দ্রুত ধাবিত হ'লেন।

মিঃ জনসন্ ও মিঃ ফারমার্ এ, এস্, পি,মি, লুইসকে নিয়ে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও কোতোয়ালী থানার অবস্থা দেখবার জন্য রওনা দিলেন এবং গিয়ে সব ঠিক আছে দেখে ইউরোপীয়ান্ ক্লাবের মোটর গ্যারেজের পাশে ও গল্ফ্ কোর্সের মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে পুলিশ-লাইনে এসে সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ক্রমে ক্রমে এক একটি দল এসে ক্রমশঃ দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলো।

অতর্কিত আক্রমণে শত্রুপক্ষ বিপর্যস্ত হয়েছিল কিন্তু কর্তব্য ও দায়িত্ব রক্ষায় তারা অটল ছিলো। প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাত করার জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজেদের তারা সংগঠিত করেছে—প্রতি আক্রমণ করে সামরিক-কৌশলের পরিচয় দিয়েছে। তবে বিপ্লবীদের তা'তে কোন বড় বিপদের মধ্যে পড়তে হয়নি। বিপদের আশঙ্কা ছিল ঠিক-ই, কিন্তু বিরাট আতঙ্ক তাঁদের মধ্যে ছিল না।

গণেশদাদের উপস্থিতিতে তরুণ বিপ্লবী আনন্দ গুপ্তের আনন্দের সীমা রইল না। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা মূল বাহিনী ও তাঁদের কাছ

থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল, অসহায় নিরাশ মনে সে শুধু প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল আর সংগ্রামী সঙ্গীদের মধ্যে থাকতে না পারায় নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছিল। আনন্দের বিপ্লবী মন দেখে আজ নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সে যেন জাত-বিপ্লবী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। সে দেখেছে গতকাল মৃত্যুর বিভীষিকা—সংগ্রামী বন্ধুত্বের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে লড়াই করেছে। দেখেছে বুঝেছে সে কী সুকঠিন সংগ্রাম! সংগ্রামের সে তো মাত্র বলতে গেলে প্রাথমিক পর্য্যায়।

অকস্মাৎ আক্রমণ রচনা করে বৃটিশ শক্তিকে তারা বিপর্যস্ত করেছে কিন্তু ক্ষিপ্ত সিংহ বৃটিশ রাজশক্তি যে এত সহজে পরাজয় স্বীকার করবে না এবং দারুণ প্রত্যাঘাত হানবে তাও আব অজানা ছিল না। ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষার জন্য সে এই বিপ্লবের মৃত্যু-পথ ত্যাগ কবে সরে আসতে পারতো কিন্তু সে তা কবেনি। তার মহৎ স্বদেশপ্রেম, স্বচ্ছবিবেক আত্মসুখের সব প্রলোভন থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে—নিমেষে উড়িয়ে দিয়েছে মনের সব সংশয়, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। মনের মধ্যে এক নিখুঁত বৈপ্লবিক আদর্শ পোষণ করে সে অস্থির প্রতীক্ষার কাল গুণছিল। তাই বলছি আনন্দ যেন জাত-বিপ্লবী।

অসুস্থ গণেশদা। জ্বরে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহটাকে এই মহান্ বিপ্লবী বিশ্রাম দিতে নারাজ। সারাটা দিন আজ তাঁদের অস্থিরতার মধ্যে কাটলো। সামান্য ভুলের জন্য আজ তাঁদের কী মানসিক অশান্তি! প্রতি পলে পলে গুণে যাচ্ছেন সেই ভুলের মাশুল। বৃটিশের সামরিক শক্তিকে সুসংগঠিত করার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টির জন্য সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাঁরা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন কিন্তু ভাগ্যের এমন-ই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, নিজেদের মূল বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে যে ফলশ্রুতি ভোগ করতে হচ্ছে। এতদিনের প্রস্তুতি পরিশ্রম নিষ্ঠা আজ বুঝি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

ক্যালেণ্ডারের আরেকটি পাতা উল্টে গেল।

১৯শে এপ্রিলের রজনী ২০শে এপ্রিলের কোলে মাথা রাখলো। দিন যায় ক্ষণ যায়—উৎ-কণ্ঠা বাড়ে। ব্যাকুল হৃদয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় যেন মুষড়ে পড়ে।

আবার সন্ধানী সংকল্প নিয়ে তাঁরা পথে নামলেন। অজানার পথে আবার তাঁরা পথিক।

আবার ফিরে যাই সেই পাহাড়ের ছায়াঘন আশ্রয়ে যেখানে মাস্টারদা তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে এক উদগ্র প্রতীক্ষায় এক সমস্যা জর্জর দুশ্চিন্তায় ভাবনাব ভবনে দীপ জ্বেলে বসে আছেন। শান্ত ধীর স্থির সেই মানুষটি যেন হিমালয়ের মত স্তব্ধ, সমুদ্রের মত গভীর গম্ভীর! দলের দু'জন প্রধান নায়ক অনুপস্থিত—অনুপস্থিত তাঁদের আরও দু'জন সহযোদ্ধা। পরবর্তী প্রোগ্রাম স্থগিত হয়ে আছে —এত সাফল্যের মধ্যে এই অভাবনীয় পরিস্থিতি তাঁকে হতবুদ্ধি, অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নেতা নির্মল সেন, নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী। এতগুলো তরুণ প্রাণ হতাশ বিমূঢ়। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে অবশেষে তাঁদের ফিরে যেতে হবে? পরাধীনতার শৃংখল পরে বৃটিশের দাসত্বে বিপ্লবের তথা স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে বলি দিতে হ'বে? যে অগ্নিময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্জয় সংকল্পে চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এক গ্লানিকব ভূমিকায় সে আদর্শের কি মৃত্যু ঘটবে? ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্যকবে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে বৃটিশ শোষকদের সঙ্গে মরণ পণ সংগ্রামের জন্য যে মনকে তাঁরা বজ্রদৃঢ় করে তুলেছেন তা' কি অনিশ্চয়তার কালক্ষেপ করে হতাশায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? উৎকণ্ঠায় অনাহারে সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় পাহাড়ের কোলে কি বসে থাকবেন?

কিন্তু না,—বৃটিশের সঙ্গে এক প্রচণ্ড মোকাবিলার জন্য এই তরুণেরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

মাস্টারদা তাঁর প্রধানতম সহনেতা নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন বিচ্ছিন্ন সঙ্গীদের অনুসন্ধানের জন্য ও শহরের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য লোক পাঠাবেন। পরবর্তী প্রোগ্রামে হাত দেবার আগে শহরের বর্তমান পরিস্থিতি তথা শাসকশ্রেণীর সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্যক তথ্য অবগত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় অনুমানে আক্রমণ রচনা রণ-চাতুর্য্যের দিক থেকে কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হ'বে না।

সংবাদ সংগ্রাহক একটি তরুণ অতঃপর সামরিক পোষাক পরিবর্তন করে পাহাড় বেয়ে নেমে গ্রামের পথ ধরলো। গ্রাম ছেড়ে ক্রমে শহবে প্রবেশ ক'রল সে।

শহবের মধ্যে সেই চঞ্চলতা সেই কর্মমুখরতা নেই—থম থমে ভাব চারিদিকে। মানুষের মনে যেন আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর কোন তৎপরতা নেই—অরক্ষিত এক শহবে যেন মুমূর্ষু রোগীর মত অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে।

এত বড় আঘাতের পর ও শহরের মধ্যে পুলিশ-মিলেটারীর কোন তৎপরতা না দেখে সংবাদ গ্রহণকারী শহরের অবস্থাকে শান্ত বলে মনে করলেন। কোন রকম বিপদের আশঙ্কা তার মধ্যে উদয় হ'ল না। অল্পবয়স্ক তরুণমনের সহজ বিবেচনায় সামরিক রণ-কৌশলের ইঙ্গিত সূক্ষ্মভাবে ধরা না পড়া স্বাভাবিক।

কিন্তু আগেই বলেছি, আহত পরাজিত নায়কের মত শাসকগোষ্ঠী নিষ্কর্মার মত দর্শক হয়ে বসে ছিল না। শহর ত্যাগ করে সামান্যতম সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাদের পরিবার-পরিজনকে শহর থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে তাদের আপাতঃ সীমিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছিল পুলিশ লাইনের ও আর্মারীর কাছাকাছি অঞ্চলে। তারা ব্যাপক প্রস্তুতির চেষ্টার মধ্যে এই স্থানই নিরাপদ মনে করেছিল—করেছিল এই জন্য যে, বিপ্লবীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাদের আক্রমণ এবার নিশ্চয়ই

শহরকে কেন্দ্র করে রচিত হ'বে।

এই সংবাদ-সংগ্রাহক শহরের অবস্থা মোটামুটি শান্ত মনে করে তথা নিরাপদ মনে করে সোজা নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। সে ছিল একজন কলেজের ছাত্র পরীক্ষার্থী। স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সে আর খবর দিতে পাহাড়ে ফিরে গেল না—বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিল। যে দুঃসাহস নিয়ে একদিন সে বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা সচক্ষে দেখে পশ্চাদপসরণ করলো—জীবনের প্রতি তীব্র মমতা তাকে পথভ্রষ্ট করলো। অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত বেদনাদায়ক এই ঘটনা। যে মহান্ দায়িত্ব দিয়ে নেতৃবর্গ তা'কে এক অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠাজনক পরিস্থিতিতে পাঠিয়ে ছিলেন, সেই ভীষণ কর্তব্যপরায়ণতা থেকে বিচ্যুত হয়ে সমগ্র বাহিনীকে আরও দুশ্চিন্তা, আরও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠেলে দিল।

মাস্টারদারা পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে অধীর আগ্রহে বসে আছেন—এই বুঝি খবর নিয়ে সে ফিবল। 'এই আসে' 'এই আসে'—এই অধীর ধৈর্য্যের শেষে বাঁধ ভাঙ্গলো। তরুণটি ফিরে না আসায় তাঁরা আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মনে মনে বিপদাশঙ্কা করলেন—হয়ত সে ধরা পড়েছে বা কোন অঘটন ঘটেছে। ব্যাকুল হয়ে উঠলেন সকলে।

পাঠালেন আরও দু'জন তরুণকে সঠিক খবর নিয়ে সত্বর ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে।

দুই তরুণ বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তি মেধা কঠিন কর্তব্য নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে গেলেন। তারা দু'জন আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হয়েই শহরের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা শুরু করলো। অরক্ষিত শহর—সীমাহীন অস্বস্তি বুকে নিয়ে পড়ে আছে। মৃত নগীরর মত জনহীন নয় সত্য, কিন্তু দুঃস্বপ্নের ঘোর বুঝি তার দু'চোখে! তারা আরো জানতে পারলো

যে ব্যাপক আক্রমণ রচনার জন্য শত্রুপক্ষ কলকাতা ও ঢাকাব ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে তারবার্তা পাঠিয়েছে।

যত সময়ের অপচয় ঘটবে—পরবর্তী আক্রমণের যত বিলম্ব ঘটবে বিপ্লবীরা ততই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'বে। এই অবকাশে শত্রুপক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে নিয়ে নিজেদের সংগঠিত করতে পারে।

আবও বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য তরুণদের তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু সতীভূষণ সেনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ ছিল কিন্তু তাদের পক্ষে তা' সম্ভব হয়নি। কারণ বিকেলের ছায়া মিলিয়ে গোধূলির অন্ধকার নেমেছে। সংবাদ নিয়ে ফিরে যেতে হ'বে অনেকটা পথ। আর কালক্ষেপ নয়। ফিরে চললো দুই তরুণ পাহাড়ে—যেখানে বসে আছে মাস্টারদার নেতৃত্বে মূলবাহিনী।

গণেশদারা পাহাড়ের বন্ধুর পথ ভেঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত চরণে এগিয়ে চলেছেন। বেলা গড়িয়ে দুপুব হয়ে এল। পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা একটি নিরাপদ নির্জন স্থানে তাঁরা ক্লান্তপদে বসে পড়লেন। অসুস্থ গণেশদাব আর বুঝি চলার ক্ষমতা নেই। শরীরকে উপেক্ষা করে শুধু দুর্জয় মনেব বলে তিনি শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলেছেন। শবীব বিশ্রাম চাইলেও মন তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে—প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'তেই হ'বে।

পথের ডাক তাঁদের উপেক্ষা করার সময় নেই। আবার পথ চলা শুরু করলেন।

চলতে চলতে পথের ধারের কয়েকটি চা-পান-বিড়ির দোকানে খরিদ্দারের ভূমিকায় তারা বসলেন। কথাবার্তার কৌশলে কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি না চেষ্টাও করলেন। কিন্তু দোকানদারদের কাছ থেকে কোন আশার বাণী বিপ্লবীরা শুনতে পেলেন না। হাঁটতে হাঁটতে তাবা নিকটবর্তী একটি তরমুজ ক্ষেতে ঢুকলেন—রেল লাইনের কাছাকাছি এই ক্ষেত।

ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তারা চাষীর অনুকম্পায় তরমুজ খেলেন ক্লান্তি, কিছু শ্রান্তির অবসান হ'ল।

দূরে একদল সৈন্য মার্চ করে চলেছে—দেখতে পেলেন হঠাৎ। আক্ষেপ ও ক্ষোভে তাঁদের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। শত্রুপক্ষের এই প্রস্তুতির অবকাশ শুধুমাত্র তাঁদের সামান্য ভুলের পরিণতিতেই। এই প্রস্তুতিব বিন্দুমাত্র অবকাশ শত্রুপক্ষ পেতো না যদি যথাসময়ে তাঁরা পরবর্তী মূল প্রোগ্রামে হাত দিতে পারতেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

আবার পথচলা। তাঁবা ঘুরছেন পথে পথে—মূলবাহিনী ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় কোথায় প্রতীক্ষার দিন কাটাচ্ছে জানেন না। বন-জঙ্গল, ঘেবা পাহাড়েব মধ্যে সঙ্গীদের যদি অবস্থান হয় তা'হলে ও আন্দাজে তাঁদের খুঁজে বের করা সহজ সাধ্য হবে না। যদি খাদ্যেব অন্বেষণে লোকালয়েব কোন দোকানের সঙ্গে তাঁবা যোগাযোগ কবেন অথবা ভাগ্যদেবীর সুপ্রসন্নতায় যদি হঠাৎ কোন সঙ্গীর সাক্ষাৎলাভ ঘটে তাই এই পথ চলা—এই অনুসন্ধান। নতুবা এ পথে পথে ফেরা ব্যর্থ পরিশ্রম ছাড়া আব কিছু নয়।

এবার তাঁবা শহরের পথ ধরলেন—অতি সাবধানে নির্জন পথ ধরে তাঁরা এগিয়ে চললেন—পাশে পাশে পাহাড় ছেড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঝুপ্ ঝুপ্ কবে নেমে এল।

চারজন বিপ্লবী শহরে ঢুকে পড়লেন। শহরেব মধ্যে কোন সামরিক চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত না হওয়ায় তাঁবা এ অস্বাভাবিক অবস্থাকে শত্রুপক্ষেব আত্মরক্ষার কৌশল বলে ধবে নিলেন। তাদের শক্তি এখন ও সীমিত—এই সীমিত শক্তি দিয়ে শহবের প্রতিবক্ষায় ব্যূহরচনার প্রয়াস মূর্খতা। কারণ বিপ্লবীদের দুর্ধর্ষ ক্ষমতার পরিচয় তারা পেয়েছে।

আরও কিছুটা পথ চলে তাঁরা সতীভূষণ সেনের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলেন। এই বিপ্লবীদের সাহায্যের ভূমিকায় সেন মহাশয়েব

অবদান অনেক। সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ অনেকেই করতে পারেন না বা নানা কারণে সম্ভবও হয়না কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে অলক্ষ্যে যাঁরা কাজ করে যায়—যুদ্ধের দ্বিতীয় সারিতে যাঁরা স্তম্ভস্বরূপ—এই সতীভূষণ সেন মহাশয় তাঁদের-ই মত একজন।

পরিচিত অপরিচিত এরকম আরও অনেক সঙ্গী শুভানুধ্যায়ী বিপ্লবীদের পাশে পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের দান ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম বীর সংগ্রামীদের দেহমনে বিরাট আশা ও শক্তির সঞ্চার করেছে—সংগ্রামকে জোরদার করেছে।

বিপ্লবীদের কাছে পেয়ে সেন মহাশয় অভিভূত হয়ে পড়লেন—বিস্ময়ে হতবাক্ ও কী ব্যাপার?

তারা সমস্ত জানালেন। মাস্টারদার কোন কর্মী এখানে আসেননি তাও তারা জানতে পারলেন। হতাশ হয়ে পড়লেন সবাই—আর বুঝি যোগাযোগের কোন সম্ভাবনা নেই। কি কর্তব্য এখন?

সংবাদ নিয়ে দীপ্তি মেধা ও অমরেন্দ্র নন্দী যখন শহর ছেড়ে পাহাড়ের পথে পা বাড়াল তখন সন্ধ্যার কালো ওড়নায় চট্টগ্রাম গা-মুড়ি দিয়েছে। অন্ধকারে সন্ত্রস্ত মনে তারা পা চালিয়ে চললো। শহর ফেলে পাহাড়ের সন্নিকটে এসে পড়েছে কিন্তু বিধাতার যেন আরেক চক্রান্ত তাদের এত পরিশ্রম পণ্ড করে দিল। অন্ধকার ইতিমধ্যে যেন ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে। রাত্রির সেই অন্ধকারে তারা পাহাড়ের পথ হারালো;—হন্যে হয়ে তারা মাস্টাদাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পাহাড় থেকে পাহাড়ে। কিন্তু বিধাতা যেখানে বিরূপ সেখানে মানুষের ক্ষমতা কত নিস্ফল। বিপদ যখন আসে তখন একা আসেনা—একটির পর একটি বিপদ যেন হাত ধরাধরি করে এসে এই তরুণদের সমস্ত আশাকে ভেঙ্গে চরম সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। অবশেষে এই দুই তরুণ নিস্ফল অনুসন্ধানের পর আবার শহরের পথ ধরে ফিরে এল। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর ছলনা!

মাস্টারদা গভীর রাত্রি পর্যন্ত সংবাদবাহকদের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থেকে যখন তারা আর ফিরলো না তখন তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা নিশ্চিন্ত হলেন যে, শহরের পথে তারা কোথাও ধরা পড়েছে বা এখন কোন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ওখানে, যার ফলে তাদের প্রত্যাগমন সম্ভব হয়নি।

তিনি আর বেশীক্ষণ ঐ পাহাড়ে অপেক্ষা করা সমীচিন মনে করলেন না।

কয়েকমিনিটের মধ্যে তাঁর বাহিনী নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের সন্ধানে সেই গভীর রাত্রেই যাত্রা করলেন।

আশ্রয়হীন খাদ্যহীন এই তরুণ দেশপ্রেমিদের দুর্দশায় সমস্ত অন্তঃকরণ কেঁদে উঠে।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর তরুণদের মুখে বিষাদেব কালো ছায়া নেমে এসেছে। ক্লান্ত অলস পদক্ষেপ তাই বুঝি পথ আর শেষ হতে চায়না এদিকে উত্তেজনা জনিত মানসিক শ্রান্তি অন্যদিকে পবিশ্রান্ত দেহে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিপীড়ন। অভুক্তদেহেব কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে—শারীরিক অবসাদ নিদারুণ অভিশাপ ডেকে আনলো। পথ আর চলতে পারছেন না—চল্‌তে চল্‌তে পা যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে।

নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গণলেন।

সঙ্গীদের অন্ততঃ কিছু খাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। কোন রকমে মূলবাহিনীকে তাঁরা টেনে এনে ফতেয়াবাদ পাহাড়ে তুললেন।

গভীর জঙ্গলে ভরা এই পাহাড়।

রাত শেষ। সূর্যের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী গ্রামগুলো ছবির মত ভেসে উঠলো। সঙ্গীদের মধ্যে দু'তিনজন ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পীড়িত ক্ষুধার্ত। নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী দূর থেকে দেখতে পেলেন তাঁর পরিচিত একটি গ্রাম-ফতেয়াবাদ। খাদ্যের অন্বেষণে তিনি একজন তরুণকে নিয়ে চললেন

পাহাড় থেকে নেমে ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে।

অনেকটা পথ—অনেক সময় ফুরিয়ে গেল গ্রামে পৌঁছাতে। গ্রামে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে খিচুড়ী রান্নার ব্যবস্থা করলেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সকলের জন্য পরিমাণ মত রান্না সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সামান্য কিছু মুখে দেওয়ার মত একটি বড় হাঁড়িতে খিঁচুড়ী নিয়ে তাঁরা আবার রওনা দিলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল। বিকাল শেষবেলার ক্লান্ত-হাত দুই বিপ্লবী বাড়িয়ে দিল গোধূলীর দিকে।

দীর্ঘ পথশ্রমের পর উপস্থিত হ'লেন। সামান্যতম আয়োজন কিন্তু কী আনন্দ, কী প্রাণচাঞ্চল্য! দু'দিনের অনাহার, সুদীর্ঘ পথচলার কঠোর পরিশ্রমে তাঁরা দুর্বল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এ দুর্বলতা আসতে পারে।

বীর নেপোলিয়ন এক জায়গায় বলেছেন যে, পেটে ক্ষিধে থাকলে প্রাণপণ যুদ্ধ করা যায় না।

সংগ্রামের সেই প্রাণশক্তির উপকরণ খাদ্য সঙ্গত কারণেই নিয়মমত প্রয়োজন। সেই এক হাঁড়ি খিচুড়ী মহানন্দে মুহূর্তে সবাই শেষ করে দিল। পানীয় জলের জন্য দু'জন তরুণ নেমে গেল নীচে। জল আর কিছু কচি আমও সংগ্রহ করে নিয়ে এল। তাই ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে যেন উৎসাহের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটাকার কিছু বিস্কুট ও রুটি কয়েকজন গিয়ে দূরের এক দোকান থেকে কিনে নিয়ে এলো। দোকানদারের সাক্ষ্য থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দোকানদারের উক্তির অংশবিশেষ এখানে চট্টগ্রামের ভাষায় উদ্ধৃত করলাম :

"রাইত্ তন্ বোওত্। আঁই ও আঁর দুইজন চত্তর্ সিদ্দিক্ আহম্মদ ও সগীর আহম্মদ্ ঘুম যাইর্। এ্যান্ সমত্ "দোয়ানওয়ালা"

"দোয়ানওয়ালা" করিয়েরে চিক্কিরাইলে আঁরার ঘুম ভাঁই যাগোই। আঁই উগ্গা বাত্তি জ্বালানোর হঙ্গে হঙ্গেই দুইজন খাকি সার্ট-প্যাণ্ট্ পরা মানুষ দোয়ানের ভিতরে ঢুকি পইল্ল। আর বাআরে তিনজন থিয়াই রইল। তাঁরার কাঁধত্ বন্দুক ও আছিল। আঁর হাতত্ হতের ও টেঁয়া দিইয়েরে বিস্কুট ও রুটি দিতো কোইল। আঁই রুটিও বিস্কুট দুয়া ঝুড়ির মইধ্যে বাঁধি হিতারার হাতত্ দিলাম। ঝুড়ি লইয়েরে হিতারা গ্যাল গোই। কডে যার হিতারা—জিজ্ঞাইলে আঁরে কইল যে, হিতারা পুলিশ—পাআরা দিতে যাজ্জে।"

পাঠকদের সুবিধার জন্য বাংলা অনুবাদও করে দিলাম:

রাত তখন অনেক। আমিও আমার দুজন চাকর সিদ্দিক আহম্মদ্ ও সগীর আহম্মদ্ তখন ঘুমিয়ে। এমন সময় "দোকানওয়ালা" "দোকানওয়ালা" করে চীৎকার করে ডাকতেই আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি একটা বাতি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন খাকি সার্ট ও প্যাণ্ট পরা মানুষ দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়লো। আর বাইরে তিনজন দাঁড়িয়ে রইল। কাঁধে তাদের বন্দুক ছিল। আমার হাতে সতেরটা টাকা দিয়ে বিস্কুট ও রুটি দিতে বললো। আমি দুটো ঝুড়িতে রুটি ও বিস্কুট বেঁধে তাদের হাতে দিলাম। ঝুড়ি নিয়ে তারা চলে গেল কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতেই তারা আমাকে বললো যে তারা পুলিশ—পাহারা দিতে যাচ্ছে।

রাত্রির বিশ্রাম আজকে এই পাহাড়েই। ক্লান্ত শ্রান্ত সৈনিকেরা প্রকৃতির উন্মুক্ত আশ্রয়ে স্বস্তিতে শয্যা রচনা করলো—প্রকৃতি মায়ের অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা তা'দের দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে দিলো।

২২শে এপ্রিল সকালের মধ্যেও যখন সংবাদ-বাহকদের কোন হদিশ পাওয়া গেল না, তখন মাস্টারদারা অনিশ্চিত অবস্থায় বসে

থেকে বৃথা শক্তিক্ষয় করা সঙ্গত মনে করলেন না। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে শহরের মধ্যে সুযোগ মত শত্রুপক্ষকে মরণ-পণ আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যে আবার বাহিনীর মার্চ শুরুর প্রস্তুতি নিলেন। নিরুদ্দেশের পথে এ অজানার হাত-ছানি নয়—বিপ্লবী বাহিনী এক সম্মুখ সমরে শত্রুসেনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায়। নূতন উত্তেজনায় প্রতিটি তরুণ-প্রাণ দেহ মনের সমস্ত অবসাদ ধুয়ে মুছে ফেলে এক নূতন প্রাণের শক্তিতে নিজেদের উজ্জীবিত করলো।

মাস্টারদার আদেশে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। এখন তাঁদের চোখেমুখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন—উন্নীতগ্রীবায় দণ্ডায়মান স্বাধীনতা রক্ষার বলিষ্ঠ সংকল্পে উদ্দীপ্ত এক একটি দক্ষ সৈনিক যাদের উদ্যম তাদেরই তো বল। দেশপ্রেমের সেই অগ্নিপ্রাণ উদ্যমকে কে রুখবে?

মাস্টারদা দীপ্তকণ্ঠে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন—"ভাইসব! ১৮-ই এপ্রিল আমরা আক্রমণ করতে যাওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলাম। আমরা প্রত্যেকে মৃত্যুপণ করে প্রোগ্রাম সফল করার ভার নিয়েছিলাম। আজ আবার আমাদের প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে—'মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন্' আমি প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রাখছি, ভেবে বলবে—মৃত্যু উপেক্ষা করে প্রবল শক্তিশালী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধ করতে সত্যি-ই কি আমারা প্রস্তুত?"

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চান্নটি রাইফেল দৃঢ় হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে একবাক্যে সমগ্র বাহিনীর সৈনিকেরা জবাব দিল:

"শপথ করছি—ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই।
শপথ করছি—প্রোগ্রাম আমাদের মৃত্যু।
শপথ করছি—আমরা ইংরেজ মেরে মরবো।

দীপ্তকণ্ঠের এ ঘোষণায় মাস্টারদার মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি জানেন না এ কোন উচ্ছ্বাসের ঘটনা নয়। সেই সুকঠিন সংঘর্ষের বাস্তব রূপ তাঁর চোখের সামনে ভাস্ছে। এই তরুণ প্রাণগুলোর নিষ্ঠা, মনোবল ও সামরিক দক্ষতায় তাঁর আস্থা আছে—আছে গভীর শ্রদ্ধা। কিন্তু বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তির মধ্যে ও অগ্ন্যুদ্গারের পূর্বমুহূর্তের আগ্নেয়গিরির মৃত্যু গহ্বরের মত তিনি শান্ত নিস্তব্ধ।

সঙ্কটে উচ্ছ্বাস বা আত্মতৃপ্তি নেতৃত্বে শোভা পায় না।

বিরাট দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তার ভারী বোঝা নিয়ে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। দুই দক্ষ নায়ক জেঃ গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের সঙ্গে আরও দু'জন দল থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশ্বস্ত কর্মী হিমাংশু সেন নেই। আরও তিনজন সহযোদ্ধার কোন খবর নেই। এই কারণে দলের শক্তি অনেকটা কমে গেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝুঁকি নেবার আগে তিনি আবার সবাইকে গভীর ভাবে ভেবে নিতে অবকাশ দিলেন—

"সাবার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের মনোভাব দেখে আমি খুশী হয়েছি। যুদ্ধ করতে যে আমরা পিছ্পা নই, তা' প্রমাণিত। তবু মানসিক প্রস্তুতির শেষ নেই। যুদ্ধের জন্য সুদৃঢ় মানসিক প্রস্তুতির দরকার। তাই আমি আবার বলছি, সবাই যেন আমরা মানসচক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ দৃশ্য একবার দেখতে চেষ্টা করি। মৃত্যুর বিভীষিকা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ, মেসিনগানের অজস্র গুলি বর্ষণ, পরিণামে চতুর্দিকে রক্তের স্রোত! শত্রুর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে পঞ্চান্নটি সেকট্রি নিয়ে সামঞ্জস্যহীন যুদ্ধ—আমাদের সুনিশ্চিত মৃত্যু। তাই আমি আবার ২য় বার সুযোগ দিচ্ছি—খুব ভাল করে নিজের মনকে বিচার কর। যাদের মনে একটুও দুর্বলতা আছে, তারা

এখন-ই মনস্থির কর। নইলে চূড়ান্ত অভিযানের মুখে ফিরে আসা যাবে না—তখন একজনের কাপুরুষতা সমস্ত সৈন্যের 'moral' নষ্ট করে দিতে পারে। তাই আবার বলছি—নিজেদের মন তলিয়ে দেখ। এখনও সময় আছে ভেবে উত্তর দাও—কি চাও? সংগ্রাম না সন্ধি? স্বাধীনতা না শৃঙ্খল?"

প্রত্যেকের হাতের মাস্কেট্‌ আবার নড়ে উঠল। না—বিপ্লবী সৈনিকেরা পশ্চাৎ অপসরণের পথ চায় না—বিপ্লবের পথে ন্যায়ের অধিকারে, তাদের স্বাধীনতা চাই। "আমরা প্রস্তুত"—দ্বিধাহীন তেজোদীপ্ত কণ্ঠে জবাব ভেসে এল।

মাস্টারদা কিন্তু অবিচল। তিনি সত্যিই শঙ্কিত, না তরুণ বিপ্লবীদের মনোবল পরীক্ষা করছেন? আত্মরক্ষার সুযোগ দিয়ে অগ্নিপরীক্ষার কষ্টিপাথরে দেশপ্রেম যাচাই করে দেখছেন? যুদ্ধের মৃত্যু, বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তাদের আছে—সেই ভয়ংকরতা থেকে কেউ মুক্তি চায় কি না কাপুরুষের মত—তাই পরীক্ষা করে দেখতে চাইছেন? হয়ত বা তাই হ'বে।

তিনি আবার বললেন—"আমি সবার কাছে দু'টি প্রস্তাব রাখছি। আমি চাই, যার যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ইচ্ছে, সে সেইটি দ্বিধাও সঙ্কোচহীন চিত্তে গ্রহণ করুক। আমার প্রথম প্রস্তাব—অসমান যুদ্ধে পা দিয়ে স্বাধীনতার রক্তাক্ত বিপ্লবের সৌধ নির্মাণ করা। ২য় প্রস্তাব—অসমান যুদ্ধ পরিহার করে আত্মগোপন করা। যারা আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে চাও তারা কোনো সঙ্কোচ করোনা। কেউ কিছু মনে করবে না—এখনও সময় আছে, যাদের ইচ্ছে দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজেদের দায়িত্বে চলে যাও এবং ভবিষ্যতে বুদ্ধি করে সংগঠিত হয়ে যেভাবে পার শত্রুকে আঘাত হান্‌বে। ···· যারা যেতে চাইছ—যাও।"

কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। দৃঢ়ভাবে সবাই উন্নতবক্ষ উন্নতশিরে মাস্কেট্‌ হাতে দাঁড়িয়ে—প্রতিজ্ঞায় অচল অটল।

গর্বে মাস্টারদার বুক ভরে গেল। কী দুঃসাহস এই তরুণেরা দেশপ্রেম এদের কত খাঁটী, কত গভীর!

আজকের যুগের তরুণসমাজে এই নিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেমে এই গভীরতা ও দেহ মনে এত দুঃসাহস পারস্পরিক স্বার্থের তীব্র সংঘাতে এবং আদর্শ নেতৃত্বের অভাবে বিহ্বল, বিশৃঙ্খল। এই তারুণ্যের বিপুল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, আদর্শ নেতৃত্বের অভাবে তরুণ সমাজ যদি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যদি তাদের মধ্যে মানসিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠে, তবে মনে রাখা দরকার জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে—দেশ কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

মাস্টারদা তখন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন—"যত শীঘ্র সম্ভব শহরে ইংরেজদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে হ'বে—পর্যুদস্ত বিপর্যস্ত করতে হ'বে তাদের সাংগঠনিক শক্তিকে। অতএব প্রস্তুত থাক। সাহস, বিক্রম—সিংহবিক্রম চাই।"

২২শে এপ্রিল তাঁরা মার্চ করে এসে আশ্রয় নিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। এই সেই ঐতিহাসিক পাহাড় জালালাবাদ। বিপ্লবীদের উদ্দীপ্ত যৌবনেব গৌরবজ্জ্বল কীর্তির আধার এই পাহাড়। ২২শে এপ্রিলের জালালাবাদ ভারতীয় জাতীয় পতাকা স্বাধীনতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। সেই অধ্যায় বিপ্লব সাধনার হৃদয়ের শোনিতে লিপিবদ্ধ। হলদিঘাটের পব জালালাবাদ। আত্ম-শক্তিতে দীপ্ত—অসীম শৌর্য-বীর্য্যের দেশপ্রেমের একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা এই 'জালালাবাদ যুদ্ধ'।

ভারতের বিপ্লব-সাধনার ঐতিহাসিক সিদ্ধি-'জালালাবাদের যুদ্ধ'। এ শুধু নিগূঢ় স্বদেশপ্রেম নয়, এই মৃত্যুঞ্জয়ী সংঘর্ষ ভারত-আত্মার জাগ্রত প্রকাশ। অতীতের সেই অমর-মহিমার মধ্যেই আছে বর্তমানের নিদর্শন এবং আত্মোপলব্ধির মহামন্ত্র! জালালাবাদের ঐতিহাসিক সংঘর্ষ বিপ্লববাদের নিছক রূপ রেখা নয়—এই স্বাধীনতা সংগ্রামের

মধ্যে আমরা সমগ্র দেশের হৃদয়ের ভাষাকেই খুঁজে পাই। এই যুদ্ধ বিজয়ের গৌরবময় কাহিনী, তাই বিশেষ তাৎপর্য পর্ণ। বিজয়ী বিপ্লবীরা বীরের জয়মাল্য কণ্ঠে পরেছেন আর দেশবাসীকে দিয়েছেন বিজয়ীর মর্য্যাদা ও গৌরব। ত্যাগ ও ক্ষাত্রবীর্যের এক অতুলনীয় আদর্শ—তুলে ধরেছেন সকলের সম্মুখে। জাতির গৌরবময় জীবনে এ শুধু একটি ঐতিহাসিক বীরত্ব কাহিনীর অধ্যায় সংযোজন নয়—সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাবের ফসল ও। ইতিহাসের সীমিত পরিধি থেকে টেনে নিয়ে গেছে চিরন্তন মহাকাব্যের আলোক পথে। পরাধীন ভারতের আত্মিকবেদনার বিষ্ফোরণ ভারত-আত্মার 'মুক্তিতীর্থ' জালালাবাদ।

"মহাভারতের স্বাধীনতা রণে তীর্থ জালালাবাদ
চিত্ত ভরিয়া নিলাম তোমার দীপ্ত আশীর্বাদ।
গণতান্ত্রিক ভারতের সরকার
জাতীয় পতাকা উড়ায়ে ঘোষিল বিপ্লবী অধিকার
জালালাবাদের যুদ্ধের জয় ভারতের আত্মার—
ধর্মবিজয়-ইতিহাসে তুলে বিপ্লব জয়বাদ।"

● ● ● ● ● ●

"দাসত্ব বোঝা আত্ম-অসম্মান
দণ্ড আঘাত পরপশ্যতা অপমান অবসান—
বলদর্পীর বজ্রশাসন ভাঙ্গি পড়ে খান্ খান্
পিঞ্জর হ'তে সিংহ জেগেছে—ধ্বনি বিপ্লববাদ।"

জালালাবাদের কালোপাথর বিপ্লবীদের রক্তে সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল—ঝরে পড়েছিল ফুলের মত অনেক তরুণ প্রাণ। রক্তে রাঙা 'মহাতীর্থ' জালালাবাদ যুদ্ধের সেই মর্মন্তুদ্ কাহিনী আপনাদের এবার শোনাব।

মাস্টারদারা পাহাড়ের উপর বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁদের গতিবিধি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহের জন্য চতুর্দিকে শত্রুপক্ষ গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও লোকনাথ বলকে যে কেউ জীবন্ত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারবে বৃটিশ সরকার তা'কে মাথা পিছু ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করবে বলে ঘোষণা পত্র প্রচার করা হ'লো।

শত্রুপক্ষ অনুমান করেছিল বিদ্রোহী বাহিনী পুলিশ লাইন ত্যাগ করে যখন শহরের মধ্যে প্রবেশ করে নূতন কোন আক্রমণ সৃষ্টি করেনি তখন তারা নিশ্চয়ই পুলিশ-লাইন সংলগ্ন পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। তাই তাদের গুপ্তচর-চক্রকে বিশেষভাবে পাহাড়ী অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাবার নির্দেশ দিল।

পাঁচ-হাজার টাকা লাভের আশাতীত আশায় দেশব্যাপী অনেকের নৈতিক অধঃপতন ঘটল। শিক্ষিত-অশিক্ষিত-দরিদ্র অনেকেই দেশের প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় পা বাড়ালো। বীর দেশপ্রেমিকদের ধরিয়ে দেবার জন্য তাই অনেকেই অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল। এই মীরজাফরদের ষড়যন্ত্রের আত্মঘাতী-অস্ত্রের শানিত কৃপাণ বহুজাতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে—ডেকে এনেছে সমগ্র জাতির উপর দীর্ঘ-দিনের নিপীড়ন, লাঞ্ছনা ব্যক্তিগত স্বার্থের তীব্র লালসায় এই শয়তানের দল দেশকে পরাধীনতার পঙ্কিলাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ইতিহাসের বহু নজীর এই সত্যতা প্রমানের সাক্ষী হয়ে আছে। এই সব ঘৃণ্য পশুদের নৈতিক অধঃপতন জাতির কলঙ্ক আমাদের তা মর্মান্তিকভাবে লজ্জা দেয় আজও।

মাস্টারদারা যখন পাহাড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন দু'জন কাঠুরিয়া সেই পাহাড়ে কাঠের সন্ধানে ওঠে এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে। তারা অভুক্ত ক্লান্ত কর্দমাক্ত পোষাকের এই মানুষগুলোকে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু অত্যন্ত সহজমনে কাঠ সংগ্রহ করে তারা পাহাড় থেকে আসে। তারপর যা' হবার

তাই—শত্রুপক্ষের সদরদপ্তরে বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়ের খবর তারা পৌঁছে দিল।

দেশবাসীর প্রতি মমতা দেখাতে গিয়ে বিপ্লবীরা এই দু'জন আগন্তুককে সরলমনে ছেড়ে দিলো। শত্রুর সঙ্গে যেখানে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তারা শহর আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে অপেক্ষা করছে রাত্রির অন্ধকারের জন্য, যেখানে সেই মুহূর্তের রণনীতিতে মানবতা ও উদারতার অবকাশ কোথায়? আর এই সব নৈতিক গুণ-ই রণনীতির ভাষায় শত্রুপক্ষের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন মাত্র এবং পরিণামে নিজেদের পরাজয়ের পথকেও সুগম করা। তাদের গোপন আস্তানার খবর এই দু'টি লোক শত্রুপক্ষে পৌঁছে দেবে না—এমন নিশ্চিত গ্যারান্টি তারা নিজেদের দিলো কি করে? দ্বিধাহীনচিত্তে সামরিক বিধি অনুযায়ী আগন্তুকদের প্রতি তাদের বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদন করে বন্দী করাই খুব উচিৎ ছিল। এই ভুলের সুযোগ নিল শত্রুপক্ষ:

"That same afternoon S. I. Moidar Ali brought information about the whereabouts of the raiders to the superintendent of Police who sent him and Hem Gupta to verify it. They went out by taxi to 'JHARJARIA BATTALI' about six miles from Chittagong, picking up on route S. I. Fazul Rahman of Panchalais P. S, who was on his way to the S. P. with similar news. At Jharjaria Battali they made further inquiries and brought back with them to the S. P. a man who had given them the detailed and reliable information which they were seeking. At that time S. I. Abdur Rahman

had also been sent to Jharjaria Battali to make inquiries. If he found the information to be corrected, he was to go on to Chowdhary hat and inform Col. Dollas Smith and his party. This he did. about 3-30 P. M. Hem Gupta and Moidhar Ali returned to Chittagong and reported to the Superintendent of Police what they learned........."

জালালাবাদ পাহাড়ের উপর থেকে শত্রুপক্ষের এই তৎপরতার কোন আঁচই বিপ্লবীরা পাননি। তারা প্রস্তুত হয়ে আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে আক্রমণের প্রোগ্রাম নিয়ে। রুটিওয়ালা-দোকানদারের দোকান থেকে বিস্কুট-রুটি কেনার খবরটি ও পুলিশের কর্ণগোচর হয়। নানা জনের কাছ থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে শত্রুপক্ষের পদস্থ কর্মচারীরা তা নিখুত ভাবে পর্যালোচনা করে বিপ্লবীদের অবস্থানের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে আক্রমণের পরিকল্পনায় হাত দিল।

দু'দিক থেকে তারা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে পাহাড় অভিযান শুরু করল। ক্যাপ্টেন টেটের নেতৃত্বে 'ইষ্টার্ণ রাইফেল্‌স্' বাহিনী ও 'সুর্মাভেলী' বাহিনী পাহাড়েব পশ্চাৎদিকের রেল-লাইন ধরে অগ্রসর হ'তে লাগল। আরেকদল ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে নালা-নর্দমা পার হয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের সম্মুখীন হ'ল। উদ্দেশ্য— চুপিসারে অপ্রস্তুত বিপ্লবী সৈনিকদের আক্রমণ করা। অতি সন্তর্পণে সঙ্গীন লাগিয়ে রাইফেল হাতে ইংরেজ সৈন্য ঝোপ-ঝাড় সরিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো। অতি সতর্ক প্রতিটি পদক্ষেপ— মনে আতঙ্ক ও তাদের অবশ্য কম নয়।

বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়ে ছড়িয়ে বসে আছে। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সব!

ইংরেজ সৈন্যদের মনে বড় আশা—অতর্কিতে মুক্তিসেনাদের আক্রমণ করে সদলবলে বন্দী করে নিয়ে যাবে। তারপর তাদের বিচারের নামে বিচারের প্রহসন করে বিজয়োল্লাসে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবে। কিন্তু সে আশা তাদের সুদূর পরাহত।

ধাপে ধাপে বৃটিশ সৈন্য নিঃশব্দে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। বেয়নেটের নৃশংস চার্জ করার জন্য তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পাহাড়ের কাছে রেল-লাইনের উপর মিলিটারী বোঝাই একটি ট্রেন এসে থামলো। অসময়ে এই অস্থানে ট্রেন এসে থামলো—অসংখ্য সৈন্য নালা-নর্দমা ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে অতি সতর্কভাবে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে—এ দৃশ্য বিপ্লবীদের সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, চরম মুহূর্তের জন্য তাবা প্রস্তুত হয়ে রইলো। আসন্ন যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনায় তাঁদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁদের মাস্কেট্ ধরা—ট্রিগারের উপর আঙ্গুল শুধু কম্যাণ্ডের অপেক্ষায় আছে।

মাস্টারদা গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন—"জেনারেল্ বল! কম্যাণ্ড্ তোমার উপর ন্যস্ত আছে, তুমি আমাদের পরিচালনা কর। ভয় নেই—সাহস আনো শত্রুকে চরম আঘাত হানো।" জেনারেল্ বল বীরের মত উত্তর দিলেন—"আমাদের অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার ও তার প্রেসিডেণ্টের উপর পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য নিয়ে আমি আমার বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করতে এতটুকু ভীত নই।"

তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন—"Get ready, take your position on Extended line. Lie down!"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকের মত সকলে বিভিন্ন জায়গায় position নিয়ে শুয়ে পড়লো। জেনারেল্ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী পাহাড়ের কেন্দ্রস্থলে দু'টি technical position-এ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মাস্টারদা ও নির্মল সেন দাঁড়িয়ে পড়লেন আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ-স্থানে। ইত্যবসরে শত্রুসৈন্য পাহাড়ের প্রায়-অর্ধেক উঠে পড়েছে। রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গুণছে বিপ্লবীরা। সময় সংক্ষিপ্ত! সৈন্যরা আরও এগিয়ে এসেছে। আর নয়, জেনারেল বল আর এক পাও তাদের এগিয়ে আসতে দেবেন না।

জালালাবাদ পাহাড় ঝাঁপিয়ে বজ্রকণ্ঠে তিনি আদেশ দিলেন— 'Halt'!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল সে ধ্বনি—Halt!

যেন বজ্রপাত হ'ল। বৃটিশ সৈন্যরা ভয়ে থমকে দাঁড়ালো, দুর্দান্ত মুক্তিসেনাদের সামনে আর এগিয়ে যাবার সাহস নেই।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বৃটিশ সৈন্যদের আর বিন্দুমাত্র ভাববার অবকাশ না দিয়ে জেনারেল বল মুহূর্তেই দীপ্তকণ্ঠে আদেশ দিলেন—'Fire'!

বিপ্লবী সৈনিকেরা শুধুমাত্র এই আদেশের জন্য এতক্ষণ অধীর অপেক্ষায় অন্তরে উত্তাপ অনুভব করছিল। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে-ই পঞ্চান্নটি মাস্কেট্রি অগ্নিবর্ষণ শুরু করল।

হতচকিত শত্রুসৈন্য বিপাকে পড়ল।

তারা ভাবতেই পারেনি তাদের শুরুতেই এত প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণের মুখে পড়তে হ'বে। প্রচণ্ড গুলীবর্ষণে বেসামাল হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করল। পাহাড় থেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নেমে এল নীচে নীচ থেকে অপেক্ষমান ক্যাপ্টেন টেট্ ও ডি, আই, জি-মিঃ ফারমারের সহযোগী বাহিনী অবিরাম গুলী চালাতে লাগলো। শত্রুপক্ষের অবস্থানগত অসুবিধার জন্য এবং বিপ্লবীদের অবস্থানগত সুবিধার জন্য এই অবিরাম গুলীবর্ষণে বিপ্লবী বাহিনীর গায়ে গুলীর আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। অপর পক্ষে হতাহতের সংখ্যা যে অনেক সে বিষয়ে সন্দেহই থাকতে পারে না। শত্রুপক্ষ এত গোপনীয়তা রক্ষা করছিল যে এই সংখ্যাতথ্য জানা সম্ভব হয়নি। তবে বিপ্লবীদের

নিরাপদ সুবিধামত অবস্থান থেকে আক্রমণ এবং বিরাট প্রস্তুতি সত্বেও শত্রুপক্ষের পশ্চাদপসরণের ঘটনাচক্র থেকে আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি তাদের হতাহতের সংখ্যা নগন্য নয়। বহু সৈন্যকে বিপ্লবী যোদ্ধারা আহত হয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখেছে —জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায় রণক্ষেত্রের উন্মত্ত উত্তেজনার মধ্যেও তারা শুনেছেন আহত বৃটিশ সৈন্যদের হৃদয় বিদারক আর্তনাদ!

শত্রুপক্ষের সৈন্যদের শোচনীয় দুর্দশা দেখে বিপ্লবী তরুণদের দেহে যেন নূতন প্রাণের অমিত শক্তির সঞ্চার হ'ল। জেঃ লোকনাথ বল আদেশ দিয়ে চললেন—'Fire! volley fire! অবিশ্রান্ত গুলী চালাও। ক্ষমা নেই—শত্রুকে একেবারে খতম করে ফেল!'

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।' বৃটিশরাজ খতম কর!! —মুহূর্মুহু শ্লোগান আর মাস্কেট্রির গর্জন নিস্তব্ধ জালালাবাদ পাহাড়কে মুখরিত করে তুললো।

ক্ষাত্রতেজের গরিমায় পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বিপ্লবীরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে তারা যেন শুয়ে সামরিক কায়দায় লড়ইয়ের স্থৈর্য ও হারিয়ে ফেলেছে—মাঝে মাঝে কয়েকজন যোদ্ধা অমিতবিক্রমে রুখে দাঁড়িয়ে ফায়ার করছে। জেনারেল বল বিপদাশঙ্কায় সতর্ক করে দিলেন—'Lie down!'

প্রায় দু'ঘণ্টার প্রচণ্ড আক্রমণে বৃটিশ সৈন্য নাস্তানাবুদ হয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য নালার মধ্যে কোণঠাসা হয়ে রইল। তাদের পালাতে দেখে বিপ্লবীদের কেউ কেউ চীৎকার করে উঠলো—Coward Shame on you! Down with you!!

এই প্রথম সংঘর্ষে আমাদের বিপ্লবী বাহিনীর জয় ঘোষিত হ'লো। পাহাড়ের উপর বিজয় কেতন পত্ পত্ করে উড়তে লাগলো।

বেলা শেষ। সূর্য অস্তমিত। আঁধার সমগ্র অঞ্চলকে ঢেকে

দিল। বৃটিশ সৈন্য আপাততঃ রণে ক্ষান্ত দিয়েছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ও তাঁদের মাস্কেট্রিকে সংযত করেছে।

বৃটিশ সৈন্যরা এবার নূতন কৌশল অবলম্বন করলো। কর্ণেল ডালাস্‌স্মিথ্‌ ও এসে শক্তিবৃদ্ধি করেছেন দলবল নিয়ে। বিচ্ছিন্ন পলাতক সৈন্যরা ইতিমধ্যে আবার নিজেদের সংগঠিত করে নিয়েছে। জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে বিদ্রোহীদের আক্রমণের পরিকল্পনা তারা বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষাও নূতন আক্রমণের জন্য দূরের দু'টি পাহাড়ে গিয়ে ব্যূহ রচনা ক'রল। বসালো সেখানে দূরপাল্লার মেসিনগান।

ক্যাপ্টেন্‌ টেট্‌ বারবার পাহাড়ে উঠতে সৈন্যদের আদেশ দিয়েছে—হুকুমের জোরে তারা সিংহের মত সদম্ভে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু পাহাড়ের তাদের মৃত্যুদূতেরা বারবার তাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বৃটিশ সিংহের দল (?) শৃগালের মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে।

এই অপমান এই আঘাত ক্যাপ্টেন টেট ও মিঃ ফারমারকে জর্জরিত করে তুলেছে। এবার মরিয়া হয়ে লড়ার জন্য সুবিধাজনক পজিশনে তারা সৈন্য সমাবেশ করেছে।

মেসিনগান ও লুইসগানগুলো জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে যেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে।

এবার ২য় সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘনিয়ে এল। পাহাড়ের উপর বিপ্লবীদল বুকে অদম্য সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তারা ভুলে গিয়েছে—ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন এক একজন বীর সৈনিক যেন এক একটি উল্কাপিণ্ড! নির্ভীক দুর্দান্ত সংগ্রামে তারা অবিচল! দেশ-মাতৃকার প্রতি কী প্রগাঢ় ভক্তি! মরণ-পাগলের দল ক্ষিপ্ত উত্তেজিত। শত্রুকে ক্ষমা নেই—শত্রুর তাজা

রক্তে দেশমাতৃকার তর্পণে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সবার মনে জয়ের গৌরব—স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই কোন আপোষ নয়—শুধু সংগ্রাম! রক্তাক্ত সংগ্রাম!!

ক্যাপ্টেন্ টেট সবুজ সংকেত দিলেন। মেসিনগানের মুখ থেকে শোঁ শোঁ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে গিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তিন দিক থেকে অবিশ্রান্ত গুলী ছুটে আসছে—ঝাঁকে ঝাঁকে—শ'য়ে শ'য়ে।

জেনারেল লোকনাথ বল ত্বরিতগতিতে তিন দিকে তাঁর সৈনিক-দের সাজিয়ে ফেললেন।

প্রায়—মিনিট পনের ধরে তিনদিক থেকে গুলী ছুটে আসতে লাগলো। কিন্তু বিপ্লবী-বাহিনী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে গুলী এড়িয়ে গেছে।

দু'তিন মিনিট পরেই আবার মেসিনগানের গুলী ছুটে আসতে লাগলো ঝাঁকে ঝাঁকে—পঙ্গপালের মত। পাহাড়ের গাছপালা ঝোপঝাড় নির্মূল হয়ে যেতে লাগলো।

জেনারেল বলের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল চকিতে তিনি গর্জন করে উঠলেন—'Fire! Rapid fire!'

শত্রুসৈন্যের উপর অবিরত গুলী বর্ষিত হ'তে লাগলো—গুলীর জবাবে গুলী। একদিকে বৃটিশ-এর ভাড়াটে সৈন্য, অন্যদিকে দেশ-বীর সন্তানেরা।

বিপ্লবী সৈনিকদের মনোবল দৃঢ় গুলীর নিশানা অব্যর্থ। তুমুল সংঘর্ষেও বিপ্লবীদের শত্রুপক্ষ কাবু করতে পারল না—পরন্তু তাদের হতাহতের সংখ্যা অসংখ্য। চিন্তাক্লিষ্ট বৃটিশ সমর—নায়করা গুলী বর্ষণ বন্ধ করলো। উত্তপ্ত জালালাবাদ আপাততঃ শান্ত রণক্লান্ত।

সমর নায়ক লোকনাথ বল তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুপক্ষকে শেষ আঘাতে পর্য্যুদস্ত করার দৃঢ় সংকল্পে অবিচল—অতি সচেতন, সতর্ক। শত্রুপক্ষ নীরব। তিনিও তাই অযথা শক্তিক্ষয় করারপক্ষপাতী নন।

সৈনিকদের হুকুম দিলেন—'Stop fire ! All eyes focus on hills and below !' বিপ্লবী সেনারা সজাগ দৃষ্টি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

দু'পক্ষই রণে ক্লান্ত—অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তবে বিপ্লবীদের moral বৃটিশের ভাড়াটে সৈন্যদের তুলনায় শতগুণে বেশী এ সত্য স্বীকারে অত্যুক্তি নেই।

বিপ্লবীদল উত্তেজনায় এখন প্রতিটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়—উষ্ণ নিঃশ্বাসে বয়ে আসছে তাদের হৃদয়ের উত্তাপ ! তাদের উদ্যত রাইফেল শত্রুপক্ষের আগুনে-গোলার মুখে সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত।

ট্যাট্—ট্যাট্—ট্যাট্—শত্রুরা আবার মেসিনগান ও লুইস্‌গানের মুখ খুলেছে।

টট্—টট্—টট্—রাশি রাশি গুলী পাহাড়ের গায়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে তার সর্ব্বাঙ্গ। শত্রুরা এবার বদ্ধপরিকর—অন্ততঃ তাদের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে বিপ্লবীদলকে তারা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। বিরামহীন গুলীবর্ষণ—অসংখ্য গুলী বিপ্লবীদের আশ-পাশ দিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবীরা এখনও নিরাপদ অক্ষত দেহে—মেসিনগান-লুইস্‌গান অসংখ্য গুলীর ছোটাছুটির মধ্যে ও তারা অবিচল অমিতবিক্রমী।

জেনারেল্ বল যেন প্রতিহিংসার এক জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ! হুকুম দিলেন—'Rapid fire !'

বিপ্লবীদের দু'চোখ দিয়ে যেন প্রতিশোধের আগুন ছুটে বেরিয়ে আসছে। হাতের মাস্কেট্রি অব্যর্থভাবে বিরামহীন গুলী ছুঁড়ে চলেছে। অনবরত অগ্ন্যুদগীরণের ফলে মাস্কেট্রির 'ব্যারেল্' গরম হয়ে উঠেছে। ব্যারেলের নীচের পাতলা কাঠের প্রোটেক্‌টার সে উত্তাপ আর ধরে রাখতে পারছে না। কেউ গায়ের জামা খুলে কেউ বা গাছের বড় বড় পাতা জড়িয়ে ধরলো ব্যারেল্। ক্রমান্বয়ে একটানা

ট্রিগার টানতে টানতে কারও কারও আঙ্গুল ছড়ে গেল। কিন্তু সেদিকে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই।

আরও এক অসুবিধার সৃষ্টি হ'লো। অসংখ্য গুলীবর্ষণের ফলে মাস্কেট্রির নলে স্বাভাবিক কারণেই ছাই-কালি জলীয় বাষ্প জমে আঠা হয়ে যাচ্ছে—ফলে পর পর অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র—অচল হয়ে পড়লো।

কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে মাস্কেট্রি একমাত্র সংগ্রামের হাতিয়ার—সেগুলোকে সর্ব প্রচেষ্টায় রক্ষা করতেই হ'বে—আবার সচল করে তুলতে হ'বে। কিন্তু ফায়ারিং লাইনে লায়িং পজিশনে থেকে সংগ্রামী সেনাদের পক্ষে জমে যাওয়া ময়লা নল থেকে পরিষ্কার করা কোন মতেই সম্ভব নয়। লায়িং পজিশনে মাথা তুললে বা বেশী নড়াচড়া করলে বিপদ অনিবার্য্য। অথচ এক একটি মাস্কেট্রি বিকল হয়ে যাওয়ার অর্থ এক একজন বীর যোদ্ধার হাত স্তব্ধ হয়ে যাওয়া।—মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া। একটির পর একটি অস্ত্র যদি অচল হয়ে পড়ে তা'হলে সমগ্র বাহিনীই তো পরিশেষে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তখন? বৃটিশের কাছে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে। তা'হলে এখন উপায়? মাস্কেট্রি-গুলোকে বাঁচিয়ে রাখার গুরু দায়িত্ব নেবেন? সামরিক প্রয়োজনে গুলী বর্ষণ অব্যাহত রাখতেই হ'বে।

এই গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হ'লেন সর্বাধিকনায়ক সূর্য্যসেন ও তাঁর সহনেতা নির্মল সেন। কিছুতেই তারা পরাজয় মেনে নেবেন না। নল পরিষ্কার করার লুব্রিকেটিং তেলের টিন নিয়ে নির্মল সেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পজিশন নিলেন। মাস্টারদা বুকে হেঁটে পাহাড়ের অসমতল জায়গার উপর দিয়ে যোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে এনে দিতে লাগলেন নির্মলসেনকে। আবার ঠিক তেমনি তা' সচল অবস্থায় যোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়ে আসতে লাগলেন নিপুণ দক্ষতায়। এক কথায়—নিরলসভাবে

সবার পশ্চাতে থেকে শক্তির যোগান দিয়ে যেতে লাগলেন।

পাহাড়ের অসমতল পথে বুকে হেঁটে যাতায়াত করতে করতে তাঁর বুক-হাত-পা জায়গায় জায়গায় ছড়ে যেতে লাগল কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি অপূর্ব দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর কঠিন দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। তা' থেকেই তাঁর কর্তব্যপরায়ণতার স্বরূপ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে। বলেছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবীযোদ্ধা—

"আজও আমাদের চোখের সামনে ভাস্‌ছে মাস্টারদার সেই চোহারা—কিভাবে তিনি সমগ্র পাহাড়ের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বুকে হেঁটে যোদ্ধাদের পাশে পাশে অস্ত্রহাতে বেড়িয়েছেন। অজস্র-ধারায় গুলী চল্‌ছে, মাস্টারদার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দূর পাহাড়ের উচ্চ শিখর হতে 'ভাইকার মেসিনগান' গর্জন করে চলেছে। মিনিটে বোধহয় তিনশ' পঞ্চাশটি ফায়ার হচ্ছে। কারও মাথা তোলার উপায় ছিল না। আমাদের কম্‌রেডরা একের পর একজন গুলীবিদ্ধ হচ্ছে ; তবু মাস্টারদা আমাদের 'ফায়ার পাওয়ার' বজায় রাখতে মাস্কেট্রি পরিষ্কার করবার জন্য ক্রমাগত মাস্কেট্রি আনা নেওয়া করেছেন। মাস্টারদার সেই প্রশান্ত দৃঢ়ভাব চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না—মাস্টারদা বলেই সেদিন তা' সম্ভব হয়েছিল।"

কোথায় পেলেন তিনি তাঁর দুর্বল শরীরে এই অমিত দুর্জয় শক্তি? আমরা বরাবর দেখেছি, সঙ্কট মুহূর্তে তিনি ধীরস্থির কর্তব্যে অবিচল থেকে শক্তহাতে হাল ধরেছেন। বিপ্লবের এই মহানায়কের মনের অটল বিশ্বাস কোন পরিস্থিতিতেই দুর্বল হয়ে পড়েনি। মাস্টারদা চরিত্রে এ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মনে পড়ে যায় তাঁর সেই সুস্পষ্ট ঘোষণা—"আজ আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করি, আমরা সকলেই 'ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি'-র চট্টগ্রাম শাখার বিশ্বস্ত সৈনিক মাত্র। এর সর্বাধিনায়ক হিসাবেই তোমাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন আমার জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প বলে আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি!"

তিনি সেই গুরু দায়িত্ব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, অমর মৃত্যুর মধ্যে ও পালন করে গিয়েছিলেন। তাঁর আসাধারণ সংগঠন-প্রতিভা, বীরত্ব, অসীমসাহসিকতা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা প্রীতির যে নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন, তা' ভাবীকালের অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরদিন অক্ষয় হয়ে গাঁথা থাকবে।

গুলীবর্ষণের বিরাম নেই। যুদ্ধ প্রচণ্ডতম রূপ নিয়েছে। দু'পক্ষই মরিয়া হয়ে লড়ছে। একদিকে বৃটিশের দম্ভ ও আত্মসম্মানের সংগ্রাম—অন্যদিকে কিছুসংখ্যক দেশপ্রাণ তরুণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রের রসদ কম। খুব হিসেব করে তাদের গুলী খরচ করতে হচ্ছে। মাস্টারদার ইচ্ছামত সকলে 'কণ্ট্রোল্ড্ ফায়ার' করে যাচ্ছে। বেপরোয়া গুলী-ছুটিয়ে কার্তুজশূন্য হ'লে মহাবিপদ! সমরক্ষেত্রে মাস্টারদার এই দূরদর্শিতা তাঁর চরিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

মেসিনগান-লুইস্‌গান সমানে অগ্ন্যুদ্‌গার করে চলেছে। মুক্তি-সেনাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রেরও বিশ্রাম নেই। প্রচণ্ডভাবে মেসিনগান, মেসিনগান-লুইস্‌গানের বিরুদ্ধে মাস্কেট্রি গর্জন করে চলেছে—থামে না। অবিরাম চলছে—টট্-টট্-টট্ !!

কনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা হরিগোপাল বল (টেগরা) ভীষণ উত্তেজিত ক্ষিপ্ত। যুদ্ধের নিয়মকানুন ভেঙ্গে বার বার সে সংযম হারিয়ে

ফেলছে। কখনও কখনও মাস্কেট্রি হাতে রুখে দাঁড়িয়ে রণহুঙ্কার দিয়ে উন্মত্তের মত ম্যাস্কেট্রি চালিয়ে যাচ্ছে। তার এই উগ্রতা তার মহাকাল ডেকে আনলো। এই অসতর্ক মুহূর্তে লুইসগানের একটি গুলী তার পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। বীর টেগ্‌রা অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে গুলী ছুড়ছে—মৃত্যু যন্ত্রণা তা'কে আরও হিংস্র করে তুলেছে যেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর শাসন এক ঝাঁক গুলী ছুটে এসে তার গলায় শহীদের জয়মাল্য পরিয়ে দিল। আর দাঁড়াতে পাবলো না সে—রক্তাপ্লুত তার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হাতের বন্দুক সে ছাড়েনি—দৃঢ়মুষ্টিতে তা' ধরে আছে—ছুটি খোলা চোখে এখনও হিংস্রদৃষ্টি—দেশপ্রেমে উজ্জ্বল তার কচিমুখ খানি। প্রাণের স্পন্দন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে, মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে সে কয়েকটি কথা বলে গেল—"সোনা ভাই (লোকনাথ বল)! আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত লড়বে! মাস্টারদা……" কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মত; মাস্টারদাকে তার শেষ কথা বলে যেতে আর পারলো না।

কী করুণ কী মর্ম্মস্পর্শী এই মহান্‌ মৃত্যু! জালালাবাদ পাহাড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বলি বীর টেগ্‌রা। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সে মৃত্যুঞ্জয়ী! বীর টেগরা অমর রহো!!

Long Live Tegra Long Live Revolution!!
ঘন ঘন শ্লোগানের উত্তপ্ততায় হাতের মাস্কেট্রি গর্জন করে উঠছে। শ্লোগানে শ্লোগানে জালালাবাদ কেঁপে উঠছে।

আরেকটি মহামৃত্যু! আরেকটি গুলী এসে বিদ্ধ হ'লো সর্বকনিষ্ঠ নির্মল লালার বুকে। গুলী খেয়েই সে শেষবারের মত প্রতিশোধ নেবার জন্য একবার উঠে দাঁড়ালো কিন্তু বালকবীর নির্মল সে আঘাত সহ্য করতে পারলো না—পরক্ষণেই তার অসাড় দেহ-লুটিয়ে পড়ল। "বন্দেমাতরম্‌"—তার মুখের শেষ কথা।

পর পর হু'টি কিশোর চিরবিদায় নিল—রক্তাপ্লুত হু'টি বীর কিশোর জালালাবাদের মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলো। এই তুই রুচিপ্রাণের মৃত্যুতে পাহাড় প্রকৃতি নেপথ্য-কান্নায় যেন গুমরে মরতে লাগলো।

তুই মহাযোদ্ধার বিয়োগে বিপ্লবীরা প্রতিশোধের স্পৃহায় আরও মরণ-পণ যুদ্ধ কবছে—ক্রোধে ক্ষোভে হিংসার আগুনে ঘন ঘন মাস্কেট্রির মুখ জ্বলে উঠছে। টেগ্রা-নির্মলের বীরের মৃত্যুতে তা'দের দেহমনে কঠিন সংকল্প অমিত শক্তির সঞ্চার করে গেছে।

দীর্ঘাকার স্ফীত বক্ষ, সবল বলিষ্ঠ ত্রিপুরা সেন যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্করের মূর্ত—প্রতীক। এই তুর্দান্ত সাহসী সৈনিক প্রতিহিংসায় যেন জ্ঞানহারা। শান্ত সুন্দর স্বভাবের ত্রিপুরা সেন রণক্ষেত্রে আজ যেন সাক্ষাৎ বিভীষিকা! সে উত্তেজনায় "লায়িং পজিশন্" ছেড়ে লাফিয়ে উঠে গুলী ছুড়তে লাগলো। বজ্র কঠিন মুষ্টিতে ধরা তার মাস্কেট্রি —ক্রোধাগ্নিতে তু'চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে। জালালাবাদ পাহাড়ে সহযোদ্ধাদের কাছে ও যে আজ এক বিরাট বিস্ময়! ভীরুতা ও কাপুরুষতা তা'কে কোনদিন প্রভাবিত করতে পারেনি কিন্তু এত সাহস, এতো বীরত্ব!

তুই মহাযোদ্ধার রক্তাক্ত দেহ পাহাড়ের গায়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। শত্রুর অবিরাম গুলী বর্ষণের মধ্যেও সে নির্ভীক। অবিচল দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে মূর্তিমান দৈত্যের মত। কিন্তু বিধাতার মৃত্যু পরোয়ানা তা'কে এক সময় হাতে নিতে হ'লো। কয়েকটি মেসিনগানের গুলী ছুটে এসে তার উন্নত স্ফীত বক্ষদেশে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল। মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মত বীর ত্রিপুরা ধরাশায়ী হলো। মৃত্যু-পথযাত্রী মৃত্যুর নিষ্ঠুর শাসন শান্ত সমাহিত দেহে মেনে নিল।

অন্যান্য সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ এই বীরের করুণ মৃত্যু ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলো। তার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা

সমস্ত অন্তঃকরণে তীব্র যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো—এক অব্যক্ত বেদনা গুমরে কেঁদে মরতে লাগলো।

কিন্তু রণক্ষেত্রে মায়া-মমতায় বিচলিত হবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই সৈনিকের। বিপ্লবী ভাইদের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও জালালাবাদের সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের মৃত্যু ভয়হীন এক আসুরিক শক্তির আধার করে তুলেছে।

সেনাপতির ভীমবিক্রম কম্যাণ্ড ভেসে আসছে—Fire ! Volley Fire ! Fire up your revolutionary Spirit'

সেনাপতির আদেশে সবাই যেন সম্মোহিতের মত লড়াই-পাগল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ পরিস্থিতি তাদের দেহমনে এতটুকু স্নায়বিক দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারেনি—লড়ছে, তারা বীরের মত মরণ-পণ লড়ছে।

চট্টগ্রাম—বিপ্লবের অগ্নি-ভাস্কর রূপ জালালাবাদ স্বাধীনতা-যুদ্ধ।

বর্বরতায় নিপীড়নে দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে তরুণেরা রুদ্রমূর্তিতে অধিকার চায়—স্বাধীন মানুষের অধিকার! মুক্তিসংগ্রামেব সেই সংকল্পে জীবন তাদেব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

“মাতৃভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা অধিকার
কামনা যেখানে পরিচয় নেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার।
যেখানে অস্ত্রাগারের অস্ত্রগুলি
অধিকার করে জাতীয় আত্মা ভৈরব ধ্বনি তুলি—
ঘোষিল মহান্ স্বাধিকার বলে—চেতনা-সাগরে দুলি
উঠে তরঙ্গ স্বাধীনতা বোধে প্রাণে অমৃত স্বাদ!”

জাতির আত্মিক বল জেগেছে। দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাই তো বিপ্লবীদের এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। জাতির অমিত-প্রাণ এই মুক্তিপাগল তরুণেরা বিদেশী দস্যুদের প্রভুত্বের ক্ষুধিত লালসাকে মৃত্যুর কালানলে পুড়িয়ে মারতে চায়। রাণাপ্রতাপ-শিবাজী-পৃথ্বীরাজ পুরুষ বীর আত্মা বিপ্লবীদের হৃদয় আজ জ্যোর্তিময় হয়ে উঠছে। অধীনতা থেকে স্বাধীনতার গৌরব-সিংহাসনে, মৃত্যু থেকে নতুন উজ্জীবনে জাতিকে নিয়ে যাবার অমৃত-সাধনার সাধক মাস্টারদা।

গুলীতে গুলীতে ছত্রাকার। জালালাবাদ তার শ্যামলীমা মুছে রুদ্র রুক্ষ সন্ন্যাসীর যেন গৈরিক বসন ধারণ করেছে। ছিন্নভিন্ন গাছ-গাছড়া। ক্ষত-বিক্ষত তার দেহ। বসন্তের গুটির মতন অগনিত ক্ষত তার গায়ে দাগ কেটে বসে আছে।

যুদ্ধের সংবাদ পাহাড়ের বুকেই শুধু ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলোনা, গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ পাহাড় ছাড়িয়ে শহরের মাথায়ও ছড়িয়ে পড়লো।

দু'ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে—চারিদিকে অন্ধকারেব নিষ্ঠুর শাসন চলছে। শত্রুপক্ষ এবার যেন দমে গেল। তারা বিপ্লবীদের যত সহজে শায়েস্তা করতে পারবে মনে করেছিল, এখন দেখছে কাজটা ততটা মোটেই সহজ নয়। পাহাড়ের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি থেকে তারা দুর্ধর্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। গুলীবর্ষণে বারবার তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মেসিনগান লুইসগানের মুখে তারা এতটুকু বিচলিত নয়। বরং শত্রুপক্ষই এখন চরম বিপর্যয়ের মুখে।

বিপ্লবীদের দ্বারা পশ্চাদ্দেশ থেকে প্রতি-আক্রমণের সম্ভাবনা ও তারা উড়িয়ে দিতে পারেনা। ক্যাপ্টেন টেট্, ডালাস্ স্মিথ্ ও লুইসের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। তাঁদের অসংখ্য সৈন্য হতাহত—ভীত সন্ত্রস্ত নিজেরাও। তাঁরা ঠিক করলেন, রাত্রির

অন্ধকারে পশ্চাদপসরণ করবেন। এই সিদ্ধান্ত সৈন্যদের নির্দ্দেশ দেওয়া হ'লো "Re-treat" করার জন্যে।

গুলী থেমে গেছে। বৃটিশ সৈন্যরা সংগ্রামে ক্লান্ত অপদস্ত। বিপ্লবী যুবকেরা শত্রুপক্ষ নীরব হওয়ার ক্ষান্ত হয়েছে।

বৃটিশ সমরনায়কেরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাহাড়ের এককোণ থেকে লুইস্ সাহেবের নেতৃত্বে একদল আক্রমণ চালিয়ে যাবে Vicker's Machinegun দিয়ে আর আক্রমণের সেই 'Fire cover'-এর সুযোগে অন্যান্য দল চুপি চুপি ট্রেনে উঠে পশ্চাদপসণের ব্যবস্থা পাকা করবে। বীর বটে!

হ'লো ও তাই। কিছুক্ষণ বিরতির পর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বিউগল্ বেজে উঠল—Vicker's Machingun-এর মুখ থেকে আগুনের পর আগুনের হল্‌কা ছুড়ে গুলী ছুটে আসতে লাগলো শ'য়ে শ'য়ে। বৃটিশ সৈন্যরা বুঝি মরণ-কামড় দিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়।

এবারের আক্রমণের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন জালালাবাদ পাহাড় গুলী দিয়ে চষে ফেলতে চায়। বলদর্পিত, অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের হিংস্রতাকে চরিতার্থ করবার জন্য লেলিহান-অগ্নিজিহ্বা বিস্তার করে ছুটে আসছে।

জেনারেল বল্ গুলীর মুখে গুলী দিয়ে জবাব দিতে আদেশ দিলেন। প্রচণ্ড লড়াই আবার শুরু হলো সাময়িক বিরতির পর। কত হাজার রাউণ্ড গুলী জালালাবাদের পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে তার সঠিক হিসাব আমাদের জানা নেই তবে আক্রমণের প্রচণ্ডতায় ও সময়ের হিসাব দেখে আনুমানিক হিসাব থেকে বলা যেতে পারে কম করেও আট নয় হাজার উভয়পক্ষের যোগফলে খরচ হয়েছে।

মেসিনগানকে স্তব্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর লোকনাথ বল। কম্যাণ্ডারের অবিরাম গুলী চালাবার আদেশ পেয়ে মুক্তিসেনারা আরো সক্রিয় আরো মারমুখী—হয়ে উঠলো।

মেসিনগান্ স্তব্ধ করতে না পারলে সমূহ বিপদ। কারণ আগেই বলেছি, আগ্নেয়াস্ত্রের রসদ তাদের শত্রুপক্ষের তুলনায় অতি নগণ্য, সীমিত। এই সীমিত শক্তির সঙ্গে লোকাতীত শক্তির প্রাণ-তরঙ্গে স্পন্দিত স্বদেশ—প্রেমের প্রাণসত্বার সজীবতা দিয়ে তারা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত। হঠাৎ এই সময় বিপ্লবী ডাক্তার বিধু ভট্টাচার্য্যের গায়ে আশে পাশে কয়েকটি গুলী এসে লাগলো। এই নিদারুণ সঙ্কটমুহূর্তে সে কৌতুক করে বলেছে—"আরে! কত আর হাঁদাবি? হাঁদাস্! যখন আশে-পাশে হাঁদাস্ কিয়ের লাগি?" কী প্রচণ্ডতম morale এই যুবকের!

মৃত্যুর জন্য যেন আকুল প্রতীক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এমন জায়গায় গুলী লাগছে না কেন যেখানে লাগলে সে সহাস্যে মরণকে আলিঙ্গন করতে পারবে, বলতে পারবে—'মরণরে তুঁহুমম শ্যাম সমনে!' পরে গুলী লাগার সংবাদটি দিয়ে কৌতুক করেই এই সদা হাস্যরসিক যুবক তার সেনাপতিকে জানালো, 'লোকাদা! লোকাদা! এতক্ষণে হাঁদাইছে!'

কত তীব্র মানসিক সজীবতা থাকলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এমন কৌতুক করা যেতে পারে—অবাক হয়ে যাই, আজকের দিনে আমাদের মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে। পাহাড় নদী দুস্তর ব্যবধান।

মৃত্যু বড় তাড়াতাড়ি যেন আসে। সেই মৃত্যুকে বড় নির্মম বড় নিষ্করুণ মনে হয় যখন এমন সব সাহসী তাজা প্রাণগুলোকে নিষ্ঠুরহাতে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিধুর বিদ্রূপ মৃত্যুর প্রতি তার তাচ্ছিল্য বোধ হয় সহ্য হলোনা বিধাতার।

একটি গুলী এসে তার বক্ষ ভেদ করে চলে বেরিয়ে গেল। একহাতে রাইফেল, অন্যহাতে বুক চেপে ধরে সে পড়ে গেল। অনেকগুলো গুলী তার দেহে বিদ্ধ হয়েছে—প্রচুর রক্তক্ষরণে ক্রমশঃ সে নিস্তেজ হয়ে আসছে। মৃত্যু তাঁকে গৌরবের হাতছানি দিয়ে

ডাকছে। পাশের সহযোদ্ধাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের প্রাক্ মুহূর্তে তার উক্তির মধ্যেও তার তীব্র রসিকমনের পরিচয় পাই—চোখে মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার এতটুকু বিকৃতির ছাপ নেই—শান্ত নির্ভীক। মৃত্যুকে সে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সানন্দে সাদরে।

সে বলে গেল—'নরেশ, চললাম। তুমিও আইও ········ তোমারে 'রিসিভ্' করুম্।'

মৃত্যু তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি—দিয়েছে মহানির্বাণ-মহাপ্রাণ। তার সাহস মৃত্যুর প্রতি এত ঔদাসীন্য, এত ভ্রূকুটি সংগ্রামী সাথীদের কাছে মূল্যবান সঞ্চয় ও আদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করে গেল।

গুলী এসে লাগলো বিনোদ দত্তের হৃদপিণ্ডের পাশে। বিরাট ক্ষত হাঁ করে আছে বুকের এপাশে—ওপাশে। রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। কিন্তু তাতে সে খুব বিচলিত নয়।

যন্ত্রণাকে সে এক মহাশক্তিতে চেপে অনবরত ফায়ার করে যাচ্ছে। এই গুরুতর আঘাত নিয়ে সেদিন সে বীরত্বের যে নজীর সৃষ্টি করে ছিল তার বোধ হয় কোন তুলনা নেই। কী দুঃসাহস! কী লৌহদৃঢ় মনোবল!! ভাবতে ভাবতে বারবার গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠে—শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

মৃত্যুর প্রতি আরেক তীব্র অনীহা দেখেছিলাম আরেক শহীদ বীর দীনেশ গুপ্তের মধ্যে। তার একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি—" ···যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দু'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? ········যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল, ভুল। মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।"(মাতার কাছে লেখা পত্র, আলিপুর জেল, ৩০-৬-৩১)।

বিনোদদত্তের এই অপরাজেয় মনোভাবের কাছে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। মৃত্যু তাকে গ্রাস করতে পারেনি। তার তাজা প্রাণটিকে বৃটিশের পৈশাচিক লালসা উপহারের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

আহত বিনোদ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে আহত হ'ল অর্ধেন্দু দস্তিদার গুরুতর ভাবে। পরে বন্দী অবস্থায় আহত অর্ধেন্দু হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।
আহত অবস্থায় হাসপাতালে এই তরুণটিকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি বিদেশী-দস্যুরা। ইতিপূর্বেও সে বোমা তৈরী করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়ে প্রায় মৃত্যুর পথ থেকে ভাগ্যক্রমে ফিরে এসেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়েও এই তরুণ বিপ্লবী সংগ্রামের মহান্ দায়িত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'আরাম হারাম হ্যায়',—এই সত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্রাম সুখকে সে উপেক্ষা করে ছুটে এসে অন্যান্যদের সঙ্গে যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। আবার আঘাতের পর গুরুতর আঘাত।

বিপ্লবী সংস্থার গোপন তথ্য ও সামান্যতম স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই মুমূর্ষু রোগীকে জেরার পর জেরা করে অমানবিক ব্যবহারের পরিচয় দেয়। মুমূর্ষু রোগীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রে নীতিবিরোধী। যারা কোন নীতিরই ধার ধারেনা তাদের কাছে ন্যায়-নীতি আশা করা দুরাশা—মাত্র। শত চেষ্টা করেও অর্ধেন্দুর কাছ থেকে একটি কথাও তারা বের করতে পারেনি।

যারা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাদের কাছে কিসের ভয়, কিসের প্রলোভন? সব কিছু তুচ্ছ করে বিপ্লবীর সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যু-বরণ করে সে এক আদর্শ স্থাপন করে গেল।

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলায় সাক্ষী দিতে এসে এ্যাসিষ্ট্যান্ট্ সিভিল্ সার্জন ডাঃ ঘোষ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা' পাঠ করে আমরা তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাই। ডাঃ ঘোষের বিবৃতিটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাত্র এখানে উল্লেখ করলাম:

"..........When Ardhendu was admitted he was dying and J, therefore, sent the requisition to the Magistrate as a matter of course......J was present by the side of the patient. At that time the Deputy Magistrate was there. The Magistrate asked where his village home was and Ardhendu decline to answer.........He was in a bad condition —his pulse could not be felt at the wrist but he could speak quite clearly and was fully conscious J understood that he declined to make any statement inspite of the repeated question of the Magistrate"

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অমানবিক ব্যবহার তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল কিনা এ্যাসিষ্ট্যান্ট্ সিভিল সার্জনকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেছিলেন "If he had been my private patient, I would not have allowed any interference with him."

সংগঠনের সর্বক্ষণের দক্ষ উৎসাহী কর্মী, সমাজসেবক এই তরুণ মাস্টারদার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল। আদর্শ বিপ্লবী একথা বললে ও তার সম্বন্ধে সবটুকু বলা শেষ হয় না। শান্ত প্রফুল্ল এই বিপ্লবী অসীম সাহসের সঙ্গে নিরলস পরিশ্রম করে গেছে কিন্তু কখনও তার মুখে এতটুকু বিরক্তি বা অবসাদের ছায়া পড়তে কেউ দেখেনি।

যুদ্ধ এক প্রচণ্ডতম রূপ নিয়েছে। শত্রুপক্ষ যে হারে গুলী ছুঁড়ছে তা যদি অধিকাংশ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হোত তা'হলে জালালাবাদ পাহাড়ে দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক রণহুঙ্কার বহু পূর্বেই স্তব্ধ হয়ে যেতো। নৈতিক বল ও স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় সঞ্জীবিত এতগুলো প্রাণ এতক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে থাকতো।

এই লক্ষ্যভ্রষ্টের প্রধানতম কারণ, মেসিনগান্-লুইস্গানের পজিশন্ বিপ্লবীদের নিখুঁতভাবে জানা ছিল বলে তারা পাহাড়ের গাছ-গাছড়ার আড়ালে উঁচু-নীচু ঢিবির গায়ে-গায়ে সুবিধাজনক পজিশন্ নিতে পেরেছিল এবং মেসিনগান্ লুইসগানকে কাবু করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু অতি উত্তেজনায় নির্ভীক এই তরুণদের কারও কারও অসতর্কতা তাদের মৃত্যুর শিকার করে দিয়েছিল।

গুলীতে লুটিয়ে পড়ল মধুসূদন দত্ত ও শশাঙ্ক দত্ত। অসংখ্য ক্ষতে তাদের রক্তের স্রোত বইছে। আর ও দুটি প্রাণ ঝরে পড়লো—আরও দুটি প্রাণকে মৃত্যুর শীতল হস্ত স্পর্শ করলো।

একের পর এক সৈনিক বীরের মতন মরণকে আলিঙ্গন করে যাচ্ছে।

আরও নিহত হ'লো নরেশ রায়, জীতেন্দ্র দাসগুপ্ত, মতিলাল কানুনগো, প্রভাস বল ও পুলিন ঘোষ। আহতদের মধ্যে আছেন বিনোদ চৌধুরী ও নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী।

নিহত ও আহতদের রক্তে লাল হয়ে গেল ধূসর মাটি, নিশ্চল-নিথর শহীদের রক্তাক্ত দেহগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় এখন অন্যদের নেই এই শহীদদের প্রাণের বদলা নিতে তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। শহীদদের রক্তের মূল্য তারা রক্তেই নেবে—মেসিনগানের বিরুদ্ধে তাই তাদের ম্যাস্কেট্রি অবিচল, অব্যর্থ।

এই শহীদদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে রেখে গেলাম। তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়-লিপি জানবার জন্য পাঠক সাধারণের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

নরেশ রায় ময়মনসিংহের এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবে দীক্ষা নেয়। সাহস ও কর্মদক্ষতায় সে

দলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছিল। আত্মসংযমী সরল এই ছেলেটি তার স্বভাবজাত গুনেই সহজে সকলকে আকৃষ্ট করে ফেলতো। দলের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনায় তার সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্য।

মতিলাল কানুনগো চট্টগ্রামের অধিবাসী। কলেজিয়েট স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র ছিল। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান মতিলাল। কিন্তু এত দুঃখকষ্টের মধ্যে ও তার মনোবল ছিল অসাধারণ দৃঢ়। সম্বলহীন জীবনের প্রাত্যহিক যন্ত্রণা তাকে কখনও বিপ্লবের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইতিপূর্বে পুলিশ-লাইন আক্রমণে ও সে অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রভাস বল ছিল লোকনাথ বলের খুড়তুতো ভাই। চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সুঠাম সুন্দর দেহ। একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই তার স্পষ্টবাদীতা ও তীব্র মানসিক সজীবতা—আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। একদিন তাকে বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট খেতে দেখে বিপ্লবী কালী চক্রবর্তী তাকে অসৎ সংসর্গ থেকে সরিয়ে এনে রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনবার জন্যে বললেন, "প্রভাস! তোমায় সিগারেট খাওয়া ছাড়তে হ'বে। বল, আমার কথা রাখবে কিনা?" এই সামান্য একটি অভ্যাস ত্যাগের পরীক্ষার দ্বারা তিনি তার মনোবল যাচাই করতে চেয়ে ছিলেন। প্রভাস তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বললো—"আমায় ভাবতে সময় দিন—আপনাকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে এখনই কথা দিয়ে পরে যদি সে কথা রাখতে না পারি তা'হলে তা' সিগারেট খাওয়ার পাপের চাইতেও বড় পাপ হ'বে।"

ঠিক দু'দিন পরে সে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললো—"হ্যাঁ, আপনাকে কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন সিগারেট খাব না

এবং বাজে লোকের সংশ্রবে থাকবো না। "—বলা বাহুল্য জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। অস্ত্রিলিয়ারী আর্মারি আক্রমণের প্রভাস অংশ গ্রহণ করে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলো।

চট্টগ্রামের 'ডবলমুরিং' থানার গোঁসাইডাঙ্গায় পুলিন ঘোষের বাড়ী ছিল। অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান পুলিন শৈশব জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে। স্কুলের ছাত্র-অত্যন্ত মেধাবী। স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের একজন উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক পুলিনকে মাঝে মাঝে জনস্বার্থে ভিক্ষারঝুলি কাঁধে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও দেখা গেছে। পুলিশ-লাইন আক্রমণে ও সে অংশ গ্রহণ করেছিল। জালালাবাদ সংঘর্ষের আগে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পথশ্রমে এত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, সে তা' সহ্য করতে না পেরে লুব্রিকেটিং তেল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে নিকটবর্ত্তী এক আত্মীয় বাড়ীতে স্থানান্তরের কথা জানালে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল—"সবাইকে বিপদের মুখে রেখে আমি আরাম ভোগ করতে কোথাও যাব না—মরিতো এখানেই মরবো।"

এই পুলিন ঘোষের চরিত্র-চিত্রন করতে গিয়ে বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ পরে যে মূল্যবান বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তা' উল্লেখ করছি এখানেঃ "পুলিন ছোট্ট একটি ছেলে; আমরা কিন্তু তাকে ডাকতাম 'Quick—Silver'—পারার মত তড়িৎ গতি ছিল তার। লোকনাথের পাশে ছিল পুলিন। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে লোকনাথের কাছে এই বর্ণনাটি শুনেছি।"

লোকনাথ বলেছে, "এমন একটা সময় গেছে যখন তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—কোথায় একটু জল পাবো? সব জলের পাত্রই খালি। তার পাশে পুলিন লোকনাথের অবস্থা বুঝে বলে,—লোকদা! আমার একটা কাঁচা আম আছে, আমটি

নিন্—খান্, তৃষ্ণা মিটবে।” লোকনাথ বললো, “এখন তুই রাখ, পরে দেখা যাবে।' ভাগ করে দু'জনেই খাব না হয়।”

অবিরত গুলী চলছে। একটু অসাবধানতা সামান্য নড়াচড়া ও বিপজ্জনক। কার কোন মুহূর্তে গুলী লাগবে কে জানে! মেসিনগানের কার্তুজের বেল্ট একটা শেষ হলে আর একটা বদলাতে সামান্য সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যে লোকনাথ ভাবল কাঁচা আমটির সদ্ব্যবহার করবে। লোকনাথ যেমনি পুলিনের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে তাকে ডাকতে, ঠিক তক্ষুণি মেসিনগানের গুলী এসে পুলিনের সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা করে দিল। পুলিন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—হাতের বন্দুক পাশে পড়ে রইল। লোকনাথ আমাকে বলেছে, তখনও পুলিনের হাতের মুঠোতে কাঁচা আমটি ধরা ছিল। আম সমেত হাত-খানা লোকনাথের দিকেই যেন সে বাড়িয়ে দিয়েছে।·····ত্রিশ বছর পরেও আমাকে এই করুণ কাহিনীর বর্ণনা দিতে লোকনাথের চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছিল।”

বালক বন্ধু পুলিনের কতখানি দরদ—তাদের প্রিয় লোকদার প্রতি কতখানি আন্তরিকতা! নিজের জন্য সযত্নে রাখা কাঁচা আমটি সে লোকদাকে দেবে—লোকাদা যদি খায় তা'হলেই সে খুশী। যুদ্ধের অধিনায়কের দৈহিক শক্তি অটুট রাখবার প্রয়োজনীয়তা একজন সৈনিক অপেক্ষা বেশী—এই উপলব্ধি থেকেই পুলিন লোকনাথকে কাঁচা আমটি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে বলেছিল।

“লোকনাথ আমাকে আরও বলেছে—পুলিনের হাতে আমটি রক্তে একেবারে ভিজে গিয়েছিল। শেষ বিদায়ের সময় পুলিন হাত বাড়িয়ে ‘লোকাদাকে’ আমটি খেতে দিচ্ছে—কি করে লোকনাথ পুলিনের এই শেষ মহৎ ইচ্ছের অবমাননা করবে?

অতি সযত্নে, পুলিন যেন ব্যথা না পায়, লোকনাথ তার হাতের মুঠো খুলে আমটি নিল। লোকনাথের দুটি চোখ জলে

ভরে গেল। লোকনাথ আমাকে নিজমুখে বলেছে—"আমি কোনদিন ভ্রূক্ষেপ না করে রক্তমাখা সেই আমটি খেয়েছি।"

জালালাবাদে লোকনাথের জীবনের—এই একটি বাস্তব নাটক ঘটে গেল। কেউ জানতেও পারেনি যুদ্ধক্ষেত্রের এই করুণ নাটকের কথা। উপন্যাসে এরকম কল্পনা করা যায়, কিন্তু এই ঘটনা অতি বাস্তব।"

যুদ্ধ চলছে। সহজে কেউ—হার মানতে চাইছে না—শেষ রক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখে নিতে চায়। ইংরেজরা চাইছে শেষ আঘাতে প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি করে বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে অন্যথায় শ্মশানের শান্তি রচনা করতে। অপর পক্ষে চট্টগ্রামের সত্যিকারের বিপ্লবী জীবনের প্রাণ-সম্পদ ভরা দুরন্ত তরুণেরা বেপরোয়া। তাদের কতকগুলো ম্যাস্কেট্রিকে অজস্র মেসিনগানের গুলী এখনও স্তব্ধ করতে পারেনি, উপরন্তু বৃটিশেরই সঙ্গীন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। শত্রুপক্ষের হতাহত কত জানি না—বিপ্লবীদের মধ্যে এগারজন জালালাবাদ পাহাড়ের কোলেই শেষ বিশ্রাম নিয়েছে—আহত অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারও পরে মৃত্যুবরণ করে। এই মোট বার জন অমর শহীদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হ'লো :

১। হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা)
২। নির্মল লালা
৩। ত্রিপুরা সেন
৪। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য
৫। প্রভাস বল
৬। শশাঙ্ক দত্ত
৭। মধুসূদন দত্ত

৮। পরেশ রায়
৯। পুলিন ঘোষ
১০। মতি কানুনগো
১১। জীতেন্দ্র দাসগুপ্ত
১২। অর্ধেন্দু দস্তিদার

আহতদের মধ্যে এই তিনজন:

১। অম্বিকা চক্রবর্তী
২। বিনোদ দত্ত
৩। বিনোদ চৌধুরী

বিদ্রোহী বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা অথবা খতম করার সমস্ত চেষ্টা বৃটিশের অবশেষে চরম ব্যর্থতায় শেষ হলো। শত্রুসৈন্যরা আগ্নেয়াস্ত্র ক্লান্ত নীরব। জালালাবাদের দুর্ভেদ্য বিপ্লবীদের দুর্গ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করে। বিপ্লবীদের চোখের সামনে অদূরে দাঁড়ানো ট্রেনটি সৈন্য ভর্তি হয়ে আত্মরক্ষার চরম তাগিদে শহরে ফিরে গেল। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজের পরাজয়ের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু এতবড় পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে কোথাও তাদের আত্মরক্ষার জন্য পশ্চাদপসরণ করতে হয়নি। ক্ষুদ্র একটি বিদ্রোহী বাহিনীর সামান্য সংখ্যক মাস্কেট্রির বিরুদ্ধে মেসিনগান্‌, ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস্‌গান ও ভিকার্সগানের ইত্যাদি মারণাস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত প্রায় আধ ব্যাটেলিয়ান্‌ বৃটিশ সৈন্য রণক্ষেত্রে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের এই একমাত্র নজীরই ভারতের বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়। এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্য তারা আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক অনেক সাফাই গেয়েছে কিন্তু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তাদের স্বীকার করতে হয়েছে যে:

"The engagement lasted for about two hours. During the first hour the raiders from this hill maintained an almost continuous fusillade accompanied by shouts of Bande Matram to which Capt. Taits force replied with heavy fire......While the fire was going on, Mr. Farmer's party with their Lewis gun had taken corner behind a hill to the South of that occupied hill by the raiders but they did not open fire as they could see nobody on account of the intervening jungle"

ঘন জঙ্গলে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হওয়ায় তারা বিপ্লবীদের কাউকে দেখতে পায়নি—আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এমন নির্লজ্জ দুর্বল যুক্তি কোন্ উর্বর মস্তিস্কের সৃষ্টি জানি না। আত্মরক্ষার সুবিধার জন্যই তো মিঃ ফারমার জঙ্গলের আড়ালে পজিশন্ নিয়েছিলো—সাহস থাকলে তো ফাঁকা জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করতে পারতো!

তারপর আবার রিপোর্টে দেখতে পাই:

"Capt. Taitt explained the position to him (Col. Dallas Smith) the necessity for his withdrawl to the town and Col. Dallas Smith Sent Mr. Lewis with a small party and a Lewis gun to the top of the hill on the left of the defile leading to Jalalbad hill."

এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে ক্যাপ্টেন্ টেটের আদেশে তাঁর সৈন্য দু'বার পাহাড়ে উঠবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে, বিপর্যাস্ত হয়েছে—তাই বুঝি তিনি আত্মরক্ষার তাগিদে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন? নিঃসন্দেহে বলতে পারি—হাঁ, সেইজন্যই।

আরও দেখতে পাচ্ছি—"They then advanced to another

hill further on and fired again untill the raider's fire had completely died away. They then returned to the train and Col. Dallas Smith and the whole force went back to Chittagong, Which they reached about 11 P. M."

এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে চলে যাওয়ার স্বীকারোক্তি থেকে আমাদের এই ধারণা করতে অসুবিধা হয়না যে, তারা নাজেহাল হয়েই স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। আর বিপ্লবীদের গুলীবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার ঘটনা নিছক মিথ্যার অবতারণা ছাড়া কিছুই নয়। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বার বার লিখেছি যে, বিপ্লবী বাহিনী দুর্ধর্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। মৃত্যুভয় কাকে বলে তারা তা' জানে না। মেসিনগান্, লুইস্‌গান্, ভিকার্সগা-নের বিরুদ্ধেও তারা অবিরাম ম্যাস্কেট্রি চালিয়ে গেছে। বৃটিশ সৈন্যকে পালিয়ে যেতে দেখে তীব্র ভাষায় কটূক্তি করেছে। বৃটিশের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোকে বরং চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বার বার স্তব্ধ করে দিয়েছে। আর যদি মেনেই নিই যে বৃটিশের কাছে তারা পরাজয় স্বীকারের ইঙ্গিত দিয়ে গুলীবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিল তা'হলে কেন বৃটিশ সমর নায়কেরা জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে বিপ্লবীদের বন্দী বা হত্যা করলো না—তারা তো বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতেই চেয়েছিলেন। তাহলে? কেন সেই পরম সুযোগ না নিয়ে নিজেরাই রাতের অন্ধকারে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমের দোহাই দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে পালিয়ে গেলো? বিদ্রোহীদের ধরে নিয়ে যেতে পারলে তো বরং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুকম্পায় তাদের পদোন্নতি হতো! সত্যকে ঢাকতে গিয়ে এমনই মিথ্যার বেসাতি করলো যে তা' মূর্খতায় পরম হাস্যাস্পদ বিবরণে পরিণত হয়েছে।

জালালাবাদ যুদ্ধের কাহিনী ক্যাপ্টেন্ টেটের মুখে কিছুটা

এবার শোনা যাক্। ধূর্ত টেট্ নিজেদের ব্যর্থতা, কাপুরুষের মত নর্দমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ও পরিশেষে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের অপমান কর ঘটনাবলী কৌশলে পরিহার করে যে বিবৃতি দিয়েছে তা' হ'লো ঃ

"২২শে এপ্রিল দুপুর প্রায় একটার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আমায় টেলিফোন করে পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্টের বাংলোয় এক কনফারেন্সের জন্য আহ্বান করলেন। সেখানে গিয়ে আমি শুন্‌লাম যে, 'হাটাজারির' রাস্তা বরাবর ছয় মাইল দূরে যে পাহাড় আছে সেখানে একদল আক্রমণকারীর (raiders) সন্ধান পাওয়া গেছে —খবরটির সত্যতা সম্পর্কে যখন আরও সঠিক ভাবে জানা যাবে তখন আমায় আবার ডেকে পাঠান হ'বে।

প্রায় ৪টার সময় আমায় জানান হ'ল যে, খবরটি ঠিক। স্থির হ'লো শহরে যত ফৌজ আছে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে নিয়ে আক্রমণকারীদের বন্দী করার জন্য যেতে হ'বে। ···· শহরে যত সৈন্য ছিল সবাইকে নিয়ে ৪-২৩ মিনিটের সময় সারকিট্ হাউস্ থেকে রওনা হ'লাম।

আমার সঙ্গে একজন মুসলমান গুপ্তচর ও একজন পুলিশ সাব্-ইন্‌স্পেক্টরও ছিল। হাটাজারির রাস্তা দিয়ে ৬½ মাইল দূরে গিয়ে আমরা থামলাম।

সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল মি ফারমার আরও একজন ফৌজ নিয়ে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন—সেই ফৌজের ভিতর ছিল এ, বি, রেলওয়ে ব্যাটেলিয়ানের একটি লুইস্‌গান্ সেকশন্ ও ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের কয়েকজন সৈন্য, যে গুপ্তচরটি ও পুলিশ সাব্-ইন্‌স্পেক্টারটি আমাদের সঙ্গে ছিল তারা আক্রমণকারীদের অবস্থান দেখিয়ে দিল—আমরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। আমার দলটি একটি নালার পাশ দিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল আর মিঃ

ফারমারের দলটি ঘোরা পথ দিয়ে এগিয়ে গেল। নালাটির শেষ-প্রান্তে এসে এক উন্মুক্ত স্থানে পৌঁছবার পর গুপ্তচরটি যে পাহাড়ে আক্রমনকারীরা ছিল সেই পাহাড়টি দেখিয়ে দিল।

আমরা আমাদের শক্তির সমাবেশ ঠিক করে নিয়ে যখন উন্মুক্ত স্থান দিয়ে সোজাসুজি এগিয়ে গেলাম তখন সেই পাহাড় চূড়া—থেকে প্রায় গোটা পঞ্চাশলোক হঠাৎ আমাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে লাগল—আমাদের উভয়ের ভিতর দূরত্ব ছিল প্রায় ২৫০ গজ।…… আমি তারপর 'সুর্ম্মভ্যালি লাইট্ হর্স' বাহিনীর একটি দলকে এক পাহাড়-চূড়ায় অবস্থান নেওয়ার জন্য পাঠালাম ·…যে পাহাড়টিতে আক্রমণকারীরা ছিল সেই পাহাড় থেকে এই পাহাড়টির দূরত্ব ছিল ৫০/৬০ গজ্। অপর দলটি পাঠালাম ১০০ গজ্ দূরে (জালালাবাদ পাহাড় থেকে)—আর আমি রইলাম এই দুই দলের মাঝামাঝি একটি স্থান বেছে নিয়ে।

এবার সেই (জালালাবাদ) পাহাড় লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গুলী-বর্ষণ শুরু করলাম। প্রায় ৪-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত আমরা গুলী চালিয়ে ছিলাম। সে হেতু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ছিল যে সন্ধ্যার পূর্বেই সৈন্যদের চট্টগ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে তাই আমি সেই হুকুমানুযায়ী সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম।

তখন প্রায় ৭-১৫ বেজে গেছে এবং বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা দশটা পর্যন্ত আমি কর্ণেল ডালাস্ স্মিথের সঙ্গে রইলাম, তারপর চট্টগ্রামে ফিরে গেলাম। পরদিন ভোর হতেই আমরা আবার ফিরে এসে সেই পাহাড়ের উপর উঠলাম —উঠে সেখানে ১০টি মৃতদেহ ও আরও দুজনকে আহত দেখতে পেলাম।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর কুখ্যাত হেমগুপ্তের বিবরনীতে দেখতে পাই:

"প্রায় ৪-৩০/৪-৪৬ মিঃ সময় আমরা ঝরঝরিয়া বটতলিতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম।……একটি মস্‌জিদ অতিক্রম করে রাস্তার

পাশ দিয়ে আমরা জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ'লাম। ক্যাপ্টেন্ টেট্ গোটা দলটিকে কয়েক অংশে বিভক্ত করেন। ক্যাপ্টেন্ টেট্ আমি ও সুর্মাভ্যালি লাইট্ হর্স বাহিনীর চারজন এবং ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর চারজন একটি অংশে ছিলাম। আমাদের গুপ্তচরের নির্দ্দেশানুযায়ী দুটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। এই রাস্তা ধরে আমরা এক উন্মুক্ত সমতল স্থানে এসে উপস্থিত হ'লাম যেখান থেকে জালালাবাদ উঠেছে।

সেখানে পৌঁছানমাত্রই সেই জঙ্গল পরিবৃত পাহাড় চূড়া থেকে কে যেন হেঁকে উঠলো: হল্ট্!—তারপরেই আক্রমণকারীরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে লাগলো। আমরা দৌড়ে গিয়ে একটা নালার মধ্যে আশ্রয় নিলাম।······মাঝে মাঝে আক্রমণকারীদের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা গুলীবর্ষণ চলে।

অন্ধকার হয়ে আসছিল, তাই আমরা যে পথে এসে ছিলাম আবার সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করলাম।"

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবীনায়ক অনন্তলাল সিংহের মূল্যবান মন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি:

"জালালাবাদ যুদ্ধে বৃটিশের এই শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস মুছবে না-মুছতে পারে না। বারোজন শহীদের তাজা রক্তের অক্ষরে লেখা এই সত্য ইতিহাস বৃটিশের মুখে পরাজয়ের কালিমা লেপন করে দিয়েছে, তা' বৃটিশ লেখকরা যত রকমেই মিথ্যা প্রমানিত করতে চেষ্টা করুক না কেন, সেই রাত্রেই যে—'the whole force went back to Chittagonge'—এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় তাদের নেই।"

যুদ্ধ শেষ। বিপ্লবীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে বৃটিশ সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে তাদের পলায়নকে বিপ্লবী বীর সন্তানেরা প্রতিহিংসা ও সাথী হারানোর ক্রুদ্ধ ক্রোধে তীব্রভাবে

ধিক্কার জানালো। জালালাবাদ এখন রণক্লান্ত। ক্ষতবিক্ষত শান্ত-নিস্তব্ধ। যেন সেখানে এখন শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে। বিপ্লবীদের তাজা রক্তে-রঞ্জিত কাপালিক জালালাবাদ।

মাস্টারদা এবার দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন—"বৃটিশ সৈন্য পরাস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় আমাদের জালালাবাদ পাহাড়ে বৃথা কালক্ষেপ করা সমুচিত হবে না। আমাদের এখন এই স্থান পরিত্যাগ কবে যাওয়া উচিত।"

"লোকনাথ তোমার সঙ্গে কজন সাথীকে নাও। মৃত বন্ধুদের প্রত্যেকের কাছ থেকে রিভলবার ও কার্তুজ সংগ্রহ কর"—বলেই আবার একটু থেকে বললেন—"প্রত্যেক আহত বন্ধুকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবে তাদের বাঁচার আশা আছে কি না। যদি সঠিক ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, দারুণ কষ্ট পাচ্ছে, বাঁচার কোন আশা নেই, তবে তাকে চিরশান্তি দিতে হ'বে; ভাবপ্রবণতা যেন বাধা না দেয়—তার বুকে গুলী করবে নির্দ্বিধায়। কিন্তু তার আগে Double Sure হ'বে যে, তার বাঁচবার আর আশা নেই।"

সামরিক নীতি অনুযায়ী এই কঠিন আদেশ দিলেও বীর সৈনিকদের জন্য তাঁর বুক এক অব্যক্ত বেদনায় কেঁদে কেঁদে গুমরে উঠছিল। আহতদের কাছে তাঁরা গেলেন কিন্তু তাদের নিরস্ত্র করতে পারলেন না—এখন ও জ্ঞান আছে—বাঁচলেও বাঁচতে পারে। নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর সারা মুখ রক্তে ভেসে গেছে—কপালের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। অত্যধিক রক্তক্ষরণের ফলে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। মাস্টারদা তাঁকে কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। একজন প্রবীণ নেতাকে জালালাবাদে ফেলে যেতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না কিন্তু দুর্গম পথে কাঁধে

করে বয়ে নিয়ে যাওয়া একান্তই অসম্ভব। মাস্টারদা নতজানু হয়ে সহনেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর পাশে বসলেন। সর্বাধিনায়ক তাঁর সহনেতাকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ভাষা দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন :

"ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো
হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়—
শুধু সমর্পণ।
শুধু সুখ হ'তে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হ'তে গীতি,
তরী হ'তে তীর
খেলা হ'তে খেলাশ্রান্তি
বাসনা হ'তে, শান্তি
নভ হ'তে—নীড়।"

অম্বিকাদা অতিকষ্টে চোখ মেলে দেখলেন। সঙ্গের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ মাস্টারদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ব্যথা বেদনায় ভরা করুণ সেই চাহনি—বিচ্ছেদ-ব্যথায় যন্ত্রণা কাতর তাঁর মন। দীর্ঘ সংগ্রামের সাথীদের কাছ থেকে শেষ বিদায়ের করুণ মুহূর্ত তাঁর হৃদয়তন্ত্রীর তারগুলোকে যেন টেনে টেনে ছিড়তে লাগলো। এতগুলো প্রাণ নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল তাঁরা ক'জন আহত হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়ে আছেন আর বাকী রণক্লান্ত সৈনিকেরা কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে—অন্ধকার গগন সে পথ তিনি যেন আর ভাবতে পারছেন না। একরাশ দুশ্চিন্তা তাঁর মাথায় যেন ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মাস্টারদা উঠে দাঁড়ালেন। সময় তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—কাতর হয়ে কালক্ষেপ করার সেই অবকাশ তাঁদের এখন নেই। অম্বিকাদা শেষবারের মত মাস্টারদার দিকে বিষাদ দৃষ্টিতে তাকালেন, সে দৃষ্টিতে যেন লেখা ছিল—

"হে মহা সুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
মুছায়ে নয়ন নীর
করো আশীর্ব্বাদ।"

যুদ্ধজয়ের গৌরবের আনন্দে মাস্টারদা ফিরতে পারছেন না আজ। হারানো সাথীদের বেদনায় অন্তর বিহ্বল। সময়ের মাত্র সামান্য ব্যবধান—কয়েক মিনিট পূর্বেও যে তাজা প্রাণগুলো সিংহ বিক্রমে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে, যাদের হাতের ম্যাস্কেট্রির এক একটি গুলী প্রতিহিংসার পুঞ্জীভূত ঘৃণার আগুন নিয়ে শত্রু-সৈন্যের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে ছুটে গেছে, সেই রণোন্মত্ত তরুণেরা নিথর নিশ্চল পড়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। পরম শান্তিতে মহাকালের কোলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। সংগ্রামের সাথী সেই সহযোদ্ধাদের প্রাণহীন দেহগুলোকে অস্থানে অনাদৃত অবহেলায় ফেলে যাওয়ার যে কী বেদনা তা' মাস্টারদা এখন হৃদয়ের স্পন্দনে অনুভব করছেন, সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে বললেন—"আমাদের শ্রেষ্ঠতম সহকর্ম্মীদের ফেলে যাচ্ছি চিরদিনের জন্য। বীর সেনানীদের সবাই "গার্ড অব্ অনার" দাও।"

বীর হৃদয়ের বেদনা স্তব্ধ, ভাষাহারা প্রতিটি মুক্তিসেনা অশ্রু-সজল চক্ষে দাঁড়িয়ে অমর শহীদদের শেষ অভিবাদন জানাল।

উদ্‌গত অশ্রুকে সবলে সংযত করে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো চট্টগ্রামের বীর সেনানীরা। নিকষকালো আঁধার-পাহাড়-প্রকৃতির প্রহরীদের হাতে মৃত্যুঞ্জয়ী. শহীদ ও আহত সঙ্গীদের তুলে দিয়ে যাত্রা—নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সীমাহীন পারাবার। তবু কর্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করার উপায় নেই—"চরৈবেতি" এগিয়ে চলার ডাক্ এসেছে, কিন্তু ব্যথাতুর হৃদয় তবু কেন পিছু টানে? পরম প্রিয় শবদেহগুলোর কী প্রচণ্ড আকর্ষণ!

জালালাবাদ পাহাড় থেকে অধিকতর সুসংবদ্ধ হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার আশা ও পরিকল্পনা নিয়ে মাস্টারদার নির্দ্দেশে বিপ্লবীরা স্থান ত্যাগ করলেও সম্পূর্ণ দলটি ক্রমে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কারণ অতবড় দল কোন এক জায়গায় একত্রে আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। শত্রুর চর জাল পেতে আছে তাদের ধরিয়ে দিয়ে মোটা টাকা পুরস্কার লাভের জন্য। অধিকাংশ ভারী আগ্নেয়াস্ত্র তারা ভেঙ্গে অকেজো করে ফেলে দিলো ধরা পড়ার আশঙ্কায়।

মাস্টারদার সহচরদের নির্দেশ দিলেন যে, যারা পুলিশের কাছে পরিচিত নয়, তারা যেন নিজ নিজ পিতা মাতার কাছে ফিরে যায় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নির্দেশমত পুনরায় হাজির হয়।

অন্যান্যরা অপেক্ষাকৃত নির্জন নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে থাকবে সিদ্ধান্ত নিল।

মাস্টারদা তার ষোলজন সদস্যের দল নিয়ে স্বগ্রামে রওনা হ'লেন।

মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাকামী বীর বিপ্লবীদের অমর অবিস্মরণীয় কাহিনীর রক্তাক্ত অধ্যায় বুকে নিয়ে পিছনে পড়ে রইল জালালাবাদ। ক্ষয়হীন স্মৃতির এক দুর্বহ যন্ত্রণায় পড়ে আছে রক্তস্নাত জালালাবাদ। বাইরে জমাট অন্ধকার ভিতরে পাথর চাপা বেদনা! উৎপীড়ন

ও শোষণের বিরুদ্ধে দর্পিত সাম্রাজ্যবাদীদের শোচনীয় পরাজয়ের সে সাক্ষী। দুঃসাহসিক মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের অমর ভাস্বর কীর্তির নিশান বুকে সে যেন আজ গর্বিত। সংগ্রামী জালালাবাদ! তোমায় জানাই বিপ্লবী অভিনন্দন!!

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হ'বে হারা?'

সেই নিঝুম কালরাত্রির জালালাবাদ পাহাড়ের ভয়াবহ পরিবেশে আবার কিছুক্ষণের জন্য ফিরে যাচ্ছি। আহত মৃতকল্প তিনজন বিপ্লবী সৈনিক এখনও সেখানে পড়ে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। চারদিকে ঝোপ-ঝাড় সাথীদের হিমশীতল বিক্ষিপ্ত দেহগুলোর পাশে পড়ে আছে তিনজন রক্তাক্ত যন্ত্রণা কাতর। সেই তিনজনের কথাই এবার বলি।

নিঝুম নিশুতি রাত। অম্বিকাদার চেতনাহীন দেহে আবার জ্ঞান ফিরে আসতে লাগলো। চাপ চাপ রক্তে চোখের পাতা দু'টি জমে গেছে। কোন রকমে অবশ হাতে চোখ দু'টি পরিষ্কার করে তাকালেন কিন্তু অন্ধকারে কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না! এক পশ্‌লা বৃষ্টি কখন হয়ে গেছে জানি না—সমস্ত শরীর কাদা ও রক্তে মাখামাখি হয়ে বীভৎস রূপ নিয়েছে। অনেক কষ্টে মৃতদেহগুলোর পাশ থেকে নিজের অবসন্ন দেহকে টেনে তুললেন। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা তাঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠলো। যুদ্ধ-মৃত্যু-বিদায়—তাঁদের সঙ্গীদের পর্য্যায়ক্রমে জালালাবাদের ঘটনাবলী।

চিন্তিত বিমর্ষ তিনি। এখান থেকে যেভাবেই হোক তাঁকে চলে যেতে হ'বে। ঘৃণা বৃটিশের শৃঙ্খলে তিনি ধরা দেবেন না কিছুতেই, মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালেন। কোমরে রিভলবারটি গুঁজে নিলেন। ম্যাস্কেটা রইল পড়ে। এক-পা এক-পা এগোতেই কার গোঁঙানি শুনতে পেলেন। শব্দ লক্ষ্য করে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন—সে অর্দ্ধেন্দু। অভিভূত হয়ে পড়ল অর্দ্ধেন্দু অম্বিকাদাকে কাছে পেয়ে। যেন নূতন শক্তি ফিরে পেল মনে। অম্বিকাদার সাহায্যে সে উঠে দাঁড়ালো। তার তলপেটে গুলী লেগেছে—প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। শরীর ভীষণ দুর্বল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তীব্র যন্ত্রণা তলপেটে মোচড় দিয়ে উঠল। কয়েক পা গিয়েই পেটে হাত চেপে বসে পড়লো সে। আর চলতে পারছে না।

ধীরে ধীরে অম্বিকাদা'কে বললো—অম্বিকাদা'! আমি আর পারছি না—আমার শরীরে আর একটু ও শক্তি নেই, আপনাকে বাঁচতেই হবে। আপনি এগোতে থাকুন। Sentiment-কে এখন বড় করে দেখলে চলবে না। আমার জন্য ভাববেন না। আপনি আর-দেরী করবেন না। মাস্টারদাকে বলবেন; আমি তাঁর কথা মনে রেখেছি—'Liberty or Death'—স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু!

সজল চোখে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বাস দিলেন অম্বিকাদা। সম্মুখে চলতে গিয়ে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে তিনি পড়ে গেলেন। অনুমানে বুঝে নিলেন রাত বেশী নেই। আলো ফুটে ওঠার আগেই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে হবে—লুকিয়ে পড়তে হ'বে কোথাও। দেহমনে যন্ত্রণা ও অবসাদ নিয়ে তিনি হাতড়ে হাতড়ে দেহটাকে টেনে টেনে পাহাড় থেকে নামতে লাগলেন। হাত-পা ছড়ে গেল অনেক জায়গায়। অনেক কষ্টে পাহাড় থেকে নেমে একরকম টল্‌তে টল্‌তে কিছুটা পথ গিয়ে এক মুসলমান চাষীর বাড়ীতে গিয়ে সাময়িক আশ্রয় ভিক্ষা করলেন, সকাল হয়ে গেছে—চলতেও আর পারছেন না। ভাগ্যের উপর ভরসা করেই তিনি চাষী বাড়ীতে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

চাষীটি তাঁর দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠলো। শতছিন্ন পোষাকে চাপ চাপ রক্ত—কাদায় মাখামাখি। তার সন্দেহ হ'তেই অম্বিকাদা আত্মগোপনের ব্যর্থ চেষ্টা না করে সব ঘটনা খুলে বললেন।

তার সহানুভূতি লাভের জন্য তাকে দরদ দিয়ে বোঝাতে লাগলেন গ্রাম্য ভাষায়—"দেশের লাই, তোঁয়ারার্ ব্যাগ্‌গুনোর লাই আঁরা ইংরাজর্ হঙ্গে যুদ্ধ কইর্‌গ্যি -হিতারারে দেশত্‌তুন্ দুঁরাইত্ পাইল্লে তোঁয়ারার্ আর এত কষ্ট থাইক্‌ত্‌ন। আঁই আর চলিত্ ন পারিব্। কোয়ালত্ গুলী লাইগ্যে—তিনদিন ন খাই ও। আঁই আর যাইত্ ন পারির্ কোডেও—তুঁই অনে আঁরে ধরাই দিলেও দিত্ পার আর নইলে দেশর্ ভালার্ লাই আঁরে বাঁচাইত্—ও পার।"

—দেশের জন্য তোমাদের সকলের জন্য আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি—তাদের দেশ থেকে দূর করতে পারলে তোমাদের আর এত কষ্ট থাকবে না। আমি আর চলতে পারছি না কপালে গুলী লেগেছে—তিনদিন খাই-ওনি। আমি আর কোথাও যেতে পারছি না—তুমি এখন আমাকে ধরিয়ে দিলেও দিতে পার অথবা দেশের ভালোর জন্য আমাকে বাঁচাতে ও পার।

চাষীটি অভিভূত হয়ে পড়লো। বললো—"ক্যা থাইকত ন দিতাম্? তঁর কন ডর্ নাই। তুঁই আঁর এ্যাডে থাক। তোঁয়ারা দেশর্ লাই এত কষ্ট করর্ আর আঁই তোঁয়ারার্ লাই এ্যাক্‌কানা থাকনর্ জাগা দিত্ ন পাইর্‌গ্যম্?"

—কেন থাকতে দেব না? তোমার কোন ভয় নেই। তুমি আমার এখানে থাক। তোমরা দেশের জন্য এত কষ্ট করছ আর আমি তোমাদের জন্য একটু থাকবার জায়গা দিতে পারবো না?

অম্বিকাদা যেন অবাক হয়ে গেলেম। এই উত্তর তিনি আশা করেননি। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

গ্রামের এক ডাক্তারের চিকিৎসায় তাঁর ক্ষত সেরে উঠতে লাগলো। চাষীটির গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক পরিচর্য্যায় তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রায় সুস্থ হয়ে তিনি বিদায় নিয়ে মাস্টারদাদের সন্ধানে রওনা হ'লেন।

২৩শে এপ্রিলের সকাল থেকেই চট্টগ্রামের উপর বৃটিশের অত্যাচারের রোলার আবার নূতন শক্তি নিয়ে চলতে শুরু করলো। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের ধরে কারারুদ্ধ করতে লাগলো। শহরের সর্বত্র কড়া মিলিটারী পাহারা বসেছে। ইঞ্জিনে লুইস্‌গান বসিয়ে রেললাইন পাহারা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিরীহ মানুষের উপর জুলুম শুরু হ'লো।

আরও বেলা বাড়তে একটি স্পেশাল ট্রেন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জালালাবাদের উদ্দেশ্যে আবার রওনা হ'ল। কুকুরের মত রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গতরাত্রে যারা মুষ্টিমেয় বিপ্লবীসেনার

হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে আত্মরক্ষা করতে শহরে ছুটে এসেছিল, আজ তাদের নিরীহ মানুষের উপর কী দাপট্! আর ট্রেনভর্ত্তি হয়ে পরাক্রম দেখাবার জন্য পুনর্যাত্রা!

বিরাট সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেললো। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন পাহাড়ের সর্বাঙ্গে। নীরব নিশ্চুপ অরণ্য প্রকৃতি। থম্ থমে এক ভৌতিক পরিবেশ। জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে চারদিক থেকে সশস্ত্র সৈন্যদল পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠতে লাগলো। সেই বধ্যভূমিতে উঠে তারা কি দেখেছিল তা' পুলিশ কর্মচারী হেমগুপ্তের দেওয়া রিপোর্ট থেকেই শুনি:

"........ পাহাড় থেকে কোনো সাড়াশব্দ আস্ছে না দেখে আমরা উপরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে উঠা মাত্র প্রথমেই আমার নজরে পড়ল অর্ধেন্দু শেখর দস্তিদার—সে আহত হয়ে পড়েছিল—সে জল চাইল, আমি তাকে জলের বোতল থেকে খানিকটা জল দিলাম।,

পাহাড়ের আরও উপরে উঠে আমরা দশটি মৃতদেহ দেখতে পেলাম, আর দেখলাম মতিলাল কানুনগো পড়ে আছে আহত অবস্থায়। সে তখনও বেঁচে ছিল।

আমার কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার ওয়েল্ডন্, ডি, আই, জি, ফার্মার, কর্ণেল্ ডালাস্ স্মিথ্ ও আরও অনেকে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। আমরা সেখানকার যাবতীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করে রাখলাম এবং মৃতদেহের জামার পকেটে তল্লাসী করে দেখলাম। ইতিমধ্যে ডাঃ ওয়েল্ডন্ অর্ধেন্দুকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সাঁজোয়া ট্রেনে রাখলেন।

তিনি মতিলালকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু তাকে সেখান থেকে সরানো হ'ল না কারণ তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল।

আমি আসার দু'ঘণ্টা পরে এস্, ডি, ও এবং সিভিল্ সার্জ্জন

সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। তারপরে এলেন পুলিশ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট, একজন ফটোগ্রাফার ও আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার বিশেষজ্ঞ ও দু'জন ডি, আই, বি, অফিসার।·········এগার জনের সাবরই ফটো তোলা হ'লো এবং তাদের আঙ্গুলের ছাপও নেওয়া হ'লো—তারপর তাদেব দাহ করা হ'লো।"

মতি কানুনগোর দেহে তখনও প্রাণ ছিল কিন্তু বাঁচার আশা-কম বলে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা কি মানুষ জাতি-হিসাবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ করতে পারতো না? মরার আগেই তাকে নিষ্ঠুবের মত জলন্ত চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অমানুষিক ব্যবহার এক ক্ষমাহীন অপরাধ। এত বড় নৃশংসতা চিরদিন বৃটিশ সভ্যতায় কলঙ্কের ছাপ হয়ে আঁকা থাকবে।

পর পর মৃতদেহগুলো সাজিয়ে বুকে নম্বর এঁকে দেওয়া হ'লো। পরিচয় গ্রহণ শুরু হ'লো। দক্ষ গোয়েন্দারা মৃত তরুণদের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে লাগলো, কিন্তু দেশের অগনিত মানুষের কাছে তারা তাদের ব্যক্তিগত পবিচয় অনেক আগেই হারিয়েছে। জীবনের সকল পরিচয় মুছে ফেলে বিশাল ভারতের একটি মাত্র গৌরবময় পরিচয়েই নিজেদের আবদ্ধ করে গেছে—'ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি'।

পুলিশ ও মিলিটারীর যাবতীয় তদন্তের কাজ শেষ হ'লে মৃতদেহগুলো সৎকারের ব্যবস্থা হ'ল। কুখ্যাত দারোগা হেমগুপ্তেব এ ব্যাপারে যেন উৎসাহ বেশী। স্বদেশী তরুণদের বিজয়োল্লাসে চিতায় তুলতে পারলে বিদেশী প্রভুদের 'পিঠ চাপড়ানি' লাভ হবে —প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ পদোন্নতি ও ঘটতে পারে। এই হেমগুপ্তের মত বিদেশী শাসকদের পা-চাটা খয়ের খাঁদের জন্যই পরদেশী দস্যুরা আমাদের বুকের উপর বসে আমাদেরই নির্বিবাদে দাড়ি উপড়ে গেছে। এই কুলাঙ্গার দেশদ্রোহীদের জন্যই যুগে যুগে আমরা নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয়ে এসেছি।

এই কুখ্যাত হেমগুপ্ত বিপুল উৎসাহে পর পর এগারটি চিতা সাজিয়ে ফেললেন চৌকিদারের সাহায্যে।

অন্তিম শয্যায় শায়িত দশজন মৃত ও একজন অমৃর্ধত। অর্ধমৃত মতিলাল কানুনগো। মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শনের ক্রিয়ায় সে আচ্ছন্ন। এগারটি ক্ষত-বিক্ষত রক্তাপ্লুত দেহে ইংরেজের আসুরিক দম্ভকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে অম্লান মুখে শেষ শয্যায় নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিচ্ছে। ইতিহাস যুগ যুগ ধরে এই বীর সন্তানদের দেশ-প্রেমের মহিমা ঘোষণা করবে। ভাবী কালের তরুণ সমাজ উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করবেঃ

'জালালাবাদের শ্মশান-চুল্লী আমাদের বুকে জ্বলে—
তরুণপ্রাণের অরুণ-দৃষ্টি নব আলো উজ্জ্বলে।'

সূর্য এখন অস্তাচলে। বেলা শেষের সূর্য্যের ম্লান স্নিগ্ধরশ্মি মৃত্যুঞ্জয়ী নিঃস্বার্থ এই বীর দেশপ্রেমিকদের তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। এই নিদারুণ শোকে তাকেও আজ বড় ম্লান বড় করুণ মনে হচ্ছে।

সূর্য্য পশ্চিম-দিগন্তে দু'—হাতে কান্নায় যেন মুখ ঢাকলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চট্টল-সন্তানদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব একটি অধ্যায়ের' যবনিকাপাত ঘটলো কিন্তু অগনিত তরুণ প্রাণে বিপ্লবের নূতন আলোর উজ্জ্বল রেখা টেনে দিয়ে গেল।

এগারটি চিতাকে সম্মুখে রেখে গুর্খা সৈন্যরা দাঁড়িয়ে। ভারতীয় অফিসারেরা মাথা নীচু করে নীরব। ইংরেজ সমবনায়কেরা মুক্তি পূজারী এই দুর্ধর্ষ তরুণদের অপূর্ব বীরত্ব—ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় বীরত্ব ও আদর্শের মহত্ত্বকে বোধহয় স্বার্থবুদ্ধির তাগিদে অশ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত বোধ করছিল।

দাউ-দাউ করে আকাশ লাল করে এগারটি মহান্ চিতা জ্বলে উঠলো। জালালাবাদের শীর্ষদেশের মহাশ্মশানে এগারটি মহান্

জীবন ধীরে ধীরে অনুপম বহ্নি শিখায় ভস্মে পরিণত হ'ল। ইংরেজের শোষণ ও বঞ্চনা হ'তে দেশকে মুক্ত করার জন্য এত যে সংগ্রাম এত যে কৃচ্ছ্রসাধনা—আগুনের তীব্র লেলিহান শিখায় তার নিঃশব্দ পরিসমাপ্তি। এই মহাযজ্ঞে মহামৃত্যু লাভ করে তারা চিরশান্তি লাভ করুক। সব্ চাওয়া সব পাওয়ার যেখানে শেষ কথা, সেই মৃত্যুর পর আর কিছু নেই।

জালালাবাদের এই বিষণ্ণ রাত্রির শোক বার্তা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে জীবনের সমস্ত স্পন্দনকে যেন মুহূর্তে কে স্তব্ধ করে দিল! নিষ্প্রদীপ শোকে মূহ্যমান প্রতিটি ঘর। ঘরে ঘরে মা-বোনেরা বুক ফাটা হাহাকারে আছড়ে পড়ছে। মহাশোকের মহামৌনতায় সমস্ত প্রকৃতি এক আশ্চর্য গম্ভীর। নিশ্চুপ নিঃশব্দ।

প্রতিটি শোক-কাতর মুখে সেদিন ছিল যেমন অসীম বেদনা, ছিল তেমনি বীর সন্তানদের শৌর্য-বীর্যের অসীম গর্বের সান্ত্বনা। দু'চোখে জ্বলে উঠেছিল প্রতিহিংসার আগুন—সে মুখে ভেসে উঠেছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দুর্জয় সংকল্প।

মহাতীর্থ জালালাবাদের চিতাবহ্নি নিভে গেল।
শহীদদের চিতাভস্মে পাহাড়ের বুকে লেখা রইল—

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

জালালাবাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ের পর ফেণী সংঘর্ষ। স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে বিপ্লবীদলের অসীম বীরত্বের আরেক দৃষ্টান্ত—বিপ্লবের ইতিহাসের অধ্যায়ে আর কয়েকটি পৃষ্ঠার সংযোজন এই ফেণী সংঘর্ষের কাহিনী। এই সংঘর্ষের পটভূমিকায় বিচ্ছিন্ন বাহিনীর সেই চার-জন বিপ্লবীসেনা—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ওজীবন ঘোষাল।

এই সংঘর্ষের সূত্রপাতের আগে মাস্টারদাদের নেতৃত্বে মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার পরের কয়েকটি দিনে আবার ফিরে যাই।

আগেই বলেছি এই চারজন অনেক চেষ্টা করেও ভাগ্যবিড়ম্বনায় মূলবাহিনীর মধ্যে আর ফিরে যেতে পারেননি। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে পৌঁছালেন বিপ্লবী রজত সেনের বাড়ীতে। কিন্তু সেখানেও তাঁরা নিশ্চিত হয়ে আশ্রয় নিতে পারেননি। ভোরের আগেই পুলিশ খবর পেয়ে বাড়ীটি ঘিরে ফেলে। তাঁরা মহাপ্রমাদ গণলেন। গৃহস্বামীর বিচক্ষণ তৎপরতায় তাঁরা বাড়ীর একটি অব্যবহৃত, ভাঙ্গা-চোড়া জিনিষপত্র—টেবিল-চেয়ারে ভর্তি ষ্টোর রুমে আত্মগোপন করে রইলেন।

পুলিশ এসে ঘর-ঘর তল্লাসী চালাতে লাগলো। সেই ষ্টোররুমের মধ্যেও কয়েকজন পুলিশ এসে ঢুকলো। মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান।

চারজনই খুব সতর্ক হয়ে কোমরের রিভলবার হাতে তুলে নিলেন। ধরা যদি পড়তেই হয় তো কাপুরুষের মত ধরা দেবেন না। তার আগে শেষ গুলীটিও তাঁরা ব্যবহার করে বাধা দেবেন।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। বুকের মধ্যে উত্তেজনা তোলপাড় করছে।

কিন্তু না, পুলিশের সন্দেহ বেশীক্ষণ ঐ ঘরে রইল না। তারা হতাশ হয়ে ঘেরাও তুলে ফিরে গেল। একটি সঙ্কটের অবসান ঘটলো। এখন কিছুক্ষণ স্বস্তির বিশ্রাম নেওয়া চলবে।

শহরের মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারী ছেয়ে গেছে। তাই সেখানে থাকা তাঁরা আর নিরাপদ মনে করলেন না। শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন।

তাঁরা উৎসাহ ও উত্তেজনায় মন থেকে সমস্ত অবসাদ মুছে ফেলে নূতনভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্য-সৌধ শক্তির দম্ভকে আঘাত করবার জন্য বদ্ধ পরিকর হ'লেন।

পুলিশ-মিলিটারীর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার জন্য অতি

সাধারণ ছেড়া জামা-কাপড় পরে গ্রাম্য মানুষটি হয়ে কুমিল্লা শহরের উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে লাঠি ও মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে একটি লণ্ঠন। খুব সতর্কভাবে রাখা আছে প্রত্যেকের কোমরে রিভলবার। ছোট ছোট পুট্‌লি নিয়ে তাঁরা সেদিন দীর্ঘ সাড়ে-সাত মাইল পথ অতিক্রম করে ভাটিয়ারী ষ্টেশনে এসে পৌঁছালেন।

ট্রেন আসার সময় হয়েছে। একজন টিকিট কাউণ্টারে গিয়ে চারখানা কুমিল্লার টিকিট চাইলেন। ষ্টেশন মাস্টার বাঙালী। তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো দূরে দাঁড়ানো আরও তিনজনের হাব-ভাবে। সে কুমিল্লার টিকিট নেই এই অজুহাতে লাকসামের টিকিট ইস্যু করে দিল। কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভের জন্য এই ষ্টেশন মাস্টারটির ভূমিকা পরবর্তী রিপোর্ট থেকেই বোধগম্য হ'বে। রিপোর্টটি দিয়েছে চাঁদপুরগামী ঐ ট্রেনের গার্ড জে, বি, পেরেরা—

"·········২২শে এপ্রিল রাত ৯টার সময় চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুরগামী ৩নং আপ্‌ ট্রেনে আমি গার্ড ছিলাম। সেদিন ভাটিয়ারী ষ্টেশন-মাস্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন অশ্বিনী ঘোষ। তিনি আমায় বললেন যে, এমন চারজন লোক গাড়ীর প্রথম কামরায় গিয়ে উঠেছে যাদের সম্পর্কে তাঁরও সন্দেহ হয়।

তাদের সন্দেহ করার কারণ তাদের মধ্যে একজন টিকিট কিনতে এসেছিল আর বাকী তিনজন আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে কুমিল্লার টিকিট চাইলে তিনি তা'কে লাকসামের টিকিট দেন। সেই ষ্টেশন-মাস্টার আমাকে টিকিটের নম্বরগুলো পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তিনি আমায় বললেন যে, তিনি ঐ কয়জন সম্বন্ধে সেই লাইনের সমস্ত পুলিশ ষ্টেশনে তার করে খবর পাঠিয়েছেন।

তিনি আমায় দূর থেকে সেই গাড়ীটি দেখিয়ে দিলেন এবং আমায় আরও বললেন, পথে যদি কেউ তাদের গাড়ী পরীক্ষা করার জন্য আসে তা'হলে যেন তাদের আমি দেখিয়ে দিই।"

বিপদ যখন আসে যেন পর পর চক্রান্ত করেই আসে।

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যেন তাঁদের দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। অনিশ্চিত জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যে তাঁরা দুর্জয় মানসিক বলে এগিয়ে চলেছেন।

ট্রেন এসে ফেণী ষ্টেশনে থামলো। বৃটিশ ভক্ত অশ্বিনী ঘোষের চতুরতার শিকার হ'লেন এই চারজন ছদ্মবেশী বিপ্লবী। গাড়ী থামতেই একদল পুলিশ কামরায় উঠে নম্বর মিলিয়ে যাত্রীদের টিকিট চেক করতে লাগলো। অবশেষে ষ্টেশন মাস্টারের দেওয়া গোপন নম্বরের টিকিটগুলো তারা পেল। কিন্তু বেশভূষা ও চাল-চলনে সরলতা ও চোখেমুখে গ্রাম্য নিরীহ মানুষের ছাপ দেখে পুলিশ সাব্ ইন্স্পেক্টরের মনে সন্দেহ তেমন দানা না বাঁধলেও কর্তব্যের টানে সে জবানবন্দী নেওয়ার জন্য চারজনকে কামরা থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

পুলিশ বেষ্টিত হয়ে তাঁরা এলেন সহকারী স্টেশন মাস্টারের ঘরে। চারিদিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে ট্রেন ভর্তি গুর্খা সৈন্যের দল—তাদের অবশ্য এ ব্যাপার জানার কথা নয়। কাঁটাতারে ঘেরা প্লাটফর্ম।

এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে আশংকা, ভয় এক একটি মুহূর্ত—এক্ষুনি তল্লাসী শুরু হ'বে। কোমরে তাঁদের প্রত্যেকের দু'টো করে রিভলবার লুকানো আছে। কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন এই মুহূর্তে?

সঙ্গের বোচকাগুলো তল্লাসী হ'চ্ছে—এরপর?—নিশ্চয়ই তাদের দেহ সার্চ হ'বে! তখন? বিচলিত চিন্তিত তাঁরা—দারুণ উৎকণ্ঠা প্রত্যেকের মনে। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাঁদের সেই মানসিক অস্থিরতা! আশঙ্কা তাঁদের অমূলক নয়।

তারপরের ঘটনা মামলার জাজ্‌মেণ্টে আছে—

"The Inspector Fazul Baset says that after the four suspects had been taken inside the room, he sat down on a chair by the doorway and told

the S. T. to search their persons. Immediately before that the eldest looking of the four said, he wanted to go out to make water, so before searching him he was sent outside escorted by the Havildar and two Constables."

সার্চ করার আদেশ পেয়ে এস, আই, এগিয়ে গেল জীবন ঘোষালের দিকে। বিপ্লবীদের সর্বাঙ্গে যেন চূড়ান্ত সংঘর্ষের উত্তেজনায় বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। আর ভাববার অবকাশ নেই। এস, আই, জীবন ঘোষালের কোমরে হাত দিতে যাচ্ছে এমন সময়—

"………One of the other two pulled out a revolver from under his shirt and fired in the direction of the Inspector. This was followed immediately by a second shot and he jumped through the doorway and ran and hide in the first class waiting room. When he returned after an interval according to him, of two or three minutes—he found the Sub-Inspector and the two Constables Manindra Pal and Yakub Ali had been shot ….. The S. I. goes on to say that at the same time one of the three suspects started to rush and out of the room and as he run past him. S. I. jumped upon him whereupon fugitive shot him inside and fell down on the floor unconscious and did not see what happened after that …..".

বারুদের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। আকস্মিক আক্রমণে পুলিশ হতভম্ব; কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পুলিশের এই হতচকিত ভাব বিপ্লবীদের পলায়নের সুযোগ করে দিল। ঘর থেকে তিনজনই তড়িৎ বেগে

লাফিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

গণেশ ঘোষ ইতিপূর্বেই প্রস্রাব করার অজুহাতে হাবিলদার ও দু'জন কনষ্টেবলের প্রহরায় বাইরে এসেছেন। তিনি কি করলেন তা' প্রহরারত একজন কনষ্টেবলের (যতীন্দ্র মোহন রায়ের) সাক্ষ্য থেকেই শোনা যাক:

" ....As he (Ganesh Ghosh) sat down, there was a report from the direction of the Asstt. Station Master's room followed by another report and he got up and made off towards the north. The Havildar and Constables pursued him and he turned and fired at them and then ran on. Jogendra Roy got up and ran after him again and the fugitive halted near the goods godown and fired at him again. Jogendra then looked round to see if the Havildar and Constable Torrab Ali were following him, but finding that they had given up the pursuit, he retreated in fear to the Station building. There he found the Sub-Inspector and one Constable Manindra Pal and Yakub Ali lying wounded. Manindra had a revolver in his hand which he said he had wrested from one of the suspects".

অর্থাৎ যখনই সে (গণেশ ঘোষ) বসেছে, তখনই সহকারী ষ্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে একটি গুলীর আওয়াজ ভেসে আসে এবং পরমুহূর্তেই আবার আরেকটি এবং সে অসতর্ক মুহূর্তে সে উঠে ছুট দেয় উত্তর দিকে। হাবিলদার ও কনষ্টেবলরা তাকে ধাওয়া করলে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলী বর্ষণ করে আবার ছুটতে

থাকে। তখন সে গুদাম ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যোগেন্দ্রর দিকে গুলী ছোঁড়ে। যোগেন্দ্র তখন দাঁড়িয়ে পড়ে হাবিলদার ও কনষ্টেবল তোরাব আলি তাঁকে অনুসরণ করছে কিনা দেখতে থাকে কিন্তু তাদের কাউকে না দেখে সে পশ্চাদপসরণ করে ষ্টেশন ঘরে চলে আসে। সেখানে সে সাব-ইন্‌স্পেক্টর্ মণীন্দ্র পাল ও আহত অবস্থায় ইয়াকুব আলিকে দেখে। মণীন্দ্রের হাতে একটি রিভলবার ছিল এবং সে বলেছে যে সে ঐ রিভলবারটি একজন আক্রমণকারীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

কনষ্টেবল সীতারাম তেওয়ারী তার সাক্ষ্যে বলেছে—

"........The three suspects rushed out of the room and made off towards the south. He ran after them for some distance but tripped over a signal wire and fell, The fugitive fired two shots at him so as he lay there for sometime not daring to get up. Then he crawled back to the station ....."

সিগ্‌ন্যালের তারে হোঁচট্ খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সীতারাম তেওয়ারী। পলাতকদের গুলী ছুঁড়তে দেখে সীতারামের আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে যাবার যোগাড়। ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে রইল— শুয়ে শুয়ে বোধহয় সীতা ও রামের নাম জপ করছিল। পলাতকরা চলে যাবার পরও উঠে হেঁটে আসার মতন সাহসও তার ছিল না—কেঁচোর মত বুক টেনে টেনে হাজির হ'ল ষ্টেশনে। বীর বটে!

এই বীরপুঙ্গবদের বেকুব বানিয়ে দিয়ে চারজনই পালিয়ে গেলেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এতবড় একটি দুঃসাহসিক অভিযান ঘটে গেল ফেণী ষ্টেশনে। যাত্রী পূর্ণ প্লাটফর্ম-পুলিশ-দোকান-পাট ইত্যাদির দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে এই দুর্ধর্ষ চারজন অভিযাত্রী সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করল। বৃটিশ প্রশাসনের ভিত্তিতে আরেকবার তাঁরা নাড়া দিলেন। তারে তারে লোকের

মুখে মুখে এই সংঘর্ষের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন জীবন ঘোষাল। বেটনের আঘাতে তার মাথা কেটে গেছে—দর দর করে রক্ত ঝরছে। অতবড় আঘাত নিয়েও সে অনেকটা পথ ছুটে চলে এসেছে।

অন্ধকার রাত। ছোটার পথে আছাড়ও খেয়েছে। ক্লান্ত ও আহত দেহ নিয়ে আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল পথ চলছে—সঙ্গে আছেন অসুস্থ গণেশ ঘোষও। তাঁর গায়ে জলবসন্তের গুটি দেখা দিয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি সমানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান গুলোতে যোগ্যতম ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কত সুদৃঢ় মানসিক বল ও সাম্যতা থাকলে অসুস্থতার মধ্যেও এত সুকঠিন দায়িত্ব পালন করা যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহান্ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ।

দুর্দ্দান্ত সাহসী অনন্ত সিংহ আবার ঘটনার দুর্বিপাকে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর কি হলো ?—তিনি দু'হাতে রিভলবার ও পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন প্লাটফরমের দক্ষিণ দিকের মোড দিয়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পড়তো পড় একেবারে কাঁটাতারের বেড়ার উপর। অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর খেলা !!

কোন ক্রমে কাঁটাতার থেকে নিজেকে মুক্ত করে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত জামা-কাপড় ছিড়ে একাকার। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা তাঁর কাছে বোধহয় কিছুই নয়। বিপ্লবের মহান্ দায়িত্বে তিনি বলীয়ান—দৈহিক কষ্ট অতি তুচ্ছ।

গভীর অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে কখনও বা খাল-ডোবা পার হয়ে তিনি একা নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী পথ চলেছেন।

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি-নিথিশে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !'

চারজন দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী—ভাগ্যের নিষ্ঠুর শাসনে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'পথে চলেছে। আঁধারের যাত্রীরা আবার আঁধার ঠেলে নেমেছে

পথে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্গম পথ। ঘর থাকতেও তারা ঘর ছাড়া—পথ থাকতেও তারা পথহারা পথিক। কোথায় যাবে কি করবে এই চিন্তায় তারা দিশাহারা। ভাগ্যের কুটিলচক্র তাদের ঠেলে দিয়েছে পথে। বিধাতার অমোঘ শাসন উপেক্ষা করার উপায় নেই, পথ তাদের চলতেই হ'বে। যত দুর্গমই হোক। পথ তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে—চল, এগিয়ে চল।

'কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথমাঝ ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।'

অন্ধকারে পথ চলতে কষ্ট হলেও অন্ধকারই এখন তাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ। এই অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফেণী শহর থেকে বহুদূরে তাদের চলে যেতে হ'বে। সকাল হ'লেই পুলিশ এতদঞ্চল তাদের সন্ধানে তোলপাড় করে ফেলবে। সুতরাং ক্ষুধা-তৃষ্ণা ক্লান্তিতে পা না চললেও পথ তাদের চলতেই হ'বে। দীর্ঘ প্রায় ৩ ঘণ্টা অবিরাম হেঁটে তিনজনের দলটি একটি পাহাড়ী অঞ্চলে এসে পৌঁছালেন। নির্জন, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে এখানে বিশ্রাম নিতে লাগলো।

অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। শতছিন্ন কর্দমাক্ত রক্তাক্ত চেহারা এক একজনের। গণেশ ঘোষের অবস্থা আরও শোচনীয়—জলবসন্তের আবির্ভাবে চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পথ চলা শুরু হ'লো। অভুক্ত তৃষ্ণা কাতর দেহ আর যেন নিজেকে টানতে পারছে না। নিদারুণ অবসাদ নিয়ে আরও কয়েক মাইল হেঁটে অবশেষে নিরুপায় হয়ে এক গৃহস্থের দারস্থ হ'তে হ'ল তাদের। তাঁর বদান্যতায় তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও সাময়িক বিশ্রামের সুযোগ ঘটল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার গা ঢাকা দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো রেল-ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। তারা ষ্টেশনে পৌঁছে একটি স্থানীয় দোকান থেকে লুঙ্গি গামছা নিয়ে পোষাক বদল করে নিয়ে যথাসময়ে গাড়ীতে চড়ে বসলো। যাবে তারা আপাততঃ সিলেট এবং সেখান থেকে সোজা কলকাতার বিপ্লবী কেন্দ্রে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই ইতিমধ্যে পুলিশী-সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কামরায় সন্দেহভাজক যাত্রীদের তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ছদ্মবেশী চারজন বিপ্লবী মুসলমানের পোষাকে গাড়ীর এককোণে মেঝেয় বসে নির্বিবাদে বিড়ি টেনে যেতে লাগলো। তাদের সাবলীল সহজভঙ্গী ও ছদ্মবেশ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছিল।

সিলেটে এসে গণেশদা আবার পাড়ি দিলেন কলকাতায়। কলকাতায় পরবর্তী পরিকল্পনা রচনায় তাঁর দল 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলো।

দলের অন্যতম সেনানায়ক অনন্ত সিংহ কি করলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় গেলেন পরবর্তী সময়ে তা' তাঁর মুখেই আমরা এবার শুনবো ঃ

"সারারাত ধরে হাঁটলাম·········ভোর হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ·········অবসন্ন ক্লান্ত শরীর—ছিন্ন-ভিন্ন জামা-কাপড়ে কাদা ও রক্তের দাগ। রিভলবারে কার্তুজ নেই, পিস্তলের ইজেক্টা ভাঙ্গা। ক্ষুধায় কাতর, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে—অবশ দেহ নিয়ে পড়ে রইলাম পাহাড়ের গায়ে অনেকক্ষণ।

ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। অকেজো আগ্নেয়াস্ত্র দু'টোকে ফেলে দিয়েছি। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো চওড়া কাপড়ের কৌপীন পরনে। পাগলের মত ভান করে পাড়ি দেওয়া ছাড়া নিরাপদে যাবার অন্য কোন সম্ভাব্য উপায় ছিল না। গায়ে কাদা-মাটি মেখে চুলগুলো সব এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলাম।

পথ দিয়ে যেতে যেতে গাছের লতা ও ঘাস চিবিয়ে তার

রস দিয়ে তৃষ্ণার জর্জরিত শুকনো জিভয়ে ভিজিয়ে রাখতে লাগলাম —কখনও বা ঘোলা জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছি। পথের ধারে আধা-খাওয়া একটি আম পড়েছিল—ক্ষুধার জ্বালায় তাই তুলে নিয়ে মহানন্দে চুষতে লাগলাম। মাথার উপর প্রখর রোদ। ভরা দুপুরে মাঠের ধারে এক চাষীর কাছে সাহস করে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম—বোবা কালার মত আকারে ইঙ্গিতে তাকে আমি যে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তা' বুঝিয়ে দিলাম। লোকটির দয়া হ'ল—তৎক্ষণাৎ সে তার খাওয়ার তরমুজটা আমায় দিয়ে দিল। আমি গোটা তরমুজটা খেয়ে ফেললাম······· ।

কিছু দূর যাবার পর একদল ছেলে এসে পেছনে লাগলো। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি ছেলে মহানন্দে এই অর্ধ-উলঙ্গ পাগলটিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। নিজেকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল যে, মাঝে মাঝে রাগে দুঃখে চোখে চল এসে যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে তাদের উৎপীড়ন সহ্য করে হাঁটতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত প্রায় আধঘণ্টা পরে, শ্রান্তি ও নিরুৎসাহ হয়ে অশান্ত বালকের দল রণে ভঙ্গ দিল। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পথের ধারে এক বাড়ীতে গিয়ে খাবার চাইলাম। পাড়ার কতকগুলো ছেলে আবার আমার পেছনে লাগলো। একটি ছোট্ট মেয়ে এসে ছেলেগুলোকে খুব করে ধমক দিয়ে শান্ত করলো। আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হয়ে পড়লাম। এইটুকু দয়া, এই সামান্য সহানুভূতিটুকুর জন্যই প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে সহস্র দুর্বিপাকের মধ্যেও আকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি মেয়েটির কাছে খাবার চাইলাম। সে একটা কলাপাতায় করে আমার জন্য ভাত-তরকারী নিয়ে এলো, কিন্তু ভয়ে সে আমার কাছে এলো না। করুণাঘন দৃষ্টি—বেদনা, দয়া ও সহানুভূতির সে যেন এক জীবন্ত প্রতিমা!

এই প্রথম পেটভর্তি খাবার জুটলো। আবার উঠে হাঁটতে লাগলাম। কোথাও নদী বা নালা সাঁতরে পার হয়ে গেলাম।

তখন বিকেল হয়ে এসেছে, হাঁটতে হাঁটতে বিলোনিয়া বাজারে এসে উপস্থিত হয়েছি। বিশেষ কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই আমি বাজারটি পার হয়ে যেতে পেরেছিলাম। আর কিছুদূর হাঁটার পর অন্ধকার হয়ে এলো। রেল-লাইনের ধার দিয়ে চলেছি। জনমানব নেই—শুধু পাহাড় ও জংলা ঝোপ-ঝাড়। শেয়ালের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। গায়ে কিছু নেই—যেটুকু আছে তা'ও ভিজে গেছে। এই পাহাড়ী অঞ্চলে শীত লাগছে। আর হাঁটতে পারছিলাম না অন্ধকারে। একটা বড় গর্তের মধ্যে গুড়ি গুড়ি দিয়ে সে রাতে পড়ে রইলাম ঐ নির্জন বিপজ্জনক জঙ্গলের ধারে।……

পরদিন আবার পথকে সঙ্গী করে চললাম। অনেকদূর আসার পর একটি চাষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। 'আইও আইও আমার গরু যায় গিয়া'—বলে সে আমাকে তার সঙ্গে যেতে বললো। ………তা'কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম।………সে তার বাড়ীতে আমায় তিনদিন আশ্রয় দিল।………চাষীর এক আত্মীয়ের সহযোগীতায় প্রায় চৌদ্দ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে 'চৌদ্দগ্রাম' বাজারে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম।………সেখান থেকে কুমিল্লাগামী একটি বাসে চড়ে এসে পৌঁছলাম কুমিল্লায়। সেখানে শ্রদ্ধেয় কামিনী দত্ত ও তাঁর পরিবারবর্গের কাছে সেই সঙ্কট মুহূর্তে যে সাহায্য পেয়েছি- তা ভুলবার নয়।

কুমিল্লা থেকে রওনা দিলাম কলকাতা। ঘোরা পথে ও নানা ছদ্মবেশে ও পরিচয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বাকী তিনজন সাথীর সঙ্গে মিলিত হ'লাম।"

স্বাধীনতার উন্মাদনায় এই বিপ্লবীরা দারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন বিপ্লবের অহমিকায় দুরন্ত অদম্য শক্তিতে এগিয়ে গেছে। সুখের লালসায় জীবনের কঙ্কালকে কখনও দুর্বলের মত আঁকড়ে ধরে কাপুরুষের মত বাঁচতে শেখেনি। তাদের অতুলনীয় দেশপ্রীতি, অসীম সাহস ও বীরত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের শুধু গৌরবই

নয়, ইতিহাসের স্মরণীয় শিক্ষাও। মাস্টারদার বিপ্লবের ডাকে তারা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। যেন নিশির ডাক—যে শুনেছে তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই হ'বে।

ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুখে নিমজ্জিত হয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা তারা ভুলতে পারেনি এবং পারেনি বলেই জীবনের চলার পথে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা অম্লান হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছে। শৌর্যদীপ্ত ক্ষাত্রতেজ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রুর গুলীর মুখে। মাস্টারদার দীক্ষায় দীক্ষিত তারা—সে দীক্ষা ত্যাগের, সে দীক্ষা জীবন্ত দেশ প্রেম ও অমিত সাহস ও বীরত্বের। দুর্বলের ঠাঁই নেই—ভীরুতার ক্ষমা নেই সেখানে। বিপ্লবীদের কানে কানে তাদের সর্বাধিনায়কের এই মন্ত্রই সতত উচ্চারিত হয়েছিল—

'সকল মহৎ কর্ম্মে, পরম প্রয়াসে,
সফল চরম লাভে—দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা
মিথ্যা সর্বভয়।"

মাস্টারদা তাঁর ষোলজনের একটি দল নিয়ে তাঁর স্বগ্রামে নোয়াপাড়ায় এসেই শুনলেন ইতিমধ্যে দু'দুবার তাঁদের বাড়ী তল্লাসী হয়ে গেছে। তিনি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিনের অর্ধাহার অনাহার ও অত্যধিক পথশ্রমে তাঁরা সবাই ভীষণ ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত। নূতন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে মন যেতে চাইলে ও পা অনড়। দীর্ঘদিনের পর তাঁদের পেয়ে বাড়ীর সবাই আজ উৎফুল্ল। তিনি তাই অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই সেইদিন রয়ে গেলেন।

তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেন মহাশয় এই ভ্রাতৃস্নেহে সকলের স্নানাহারাদির সুব্যবস্থার প্রতি শুধু সতর্ক দৃষ্টিই রাখেননি

—নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে সতর্ক সজাগ থেকে প্রহরায় রত ছিলেন। এই রণক্লান্ত সৈনিকদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ, দেশের প্রতি ভালবাসা ও সংগ্রামী অনুজদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজের জীবন বিপন্ন করা এবং পুলিশের কাছে অকথ্য-নির্যাতন লাঞ্ছনা ভোগ শুধু বিপ্লবী দেশপ্রেমী মানুষও সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অঞ্জলী তাঁকে প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাইরে থেকে বিপ্লবের তিনি নীরব সাধনা করে গেছেন—স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে নিরলস পরিশ্রম পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে অলক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন।

শুধু তিনি একা নন, তাঁর পরিবারের প্রতিটি মানুষের অবদান আছে -আছে জাতির এই মুক্তি আন্দোলনে অক্লান্ত সেবা ও আদর্শ আত্মত্যাগ। শত লাঞ্ছনা অবমাননা নীরবে সহ্য করেও তাঁরা বিপ্লবের সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে যথাশক্তি ইন্ধন জগিয়ে গেছেন। আমরা তাঁদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজ স্মরণ করে বাস্তবিকই গৌরববোধ করছি।

একদিনের আরাম-স্মৃতি নিয়ে মাস্টারদারা চলে গেলেন কোয়েপাড়া গ্রামের বিপ্লবী বন্ধু বিনয় সেনের বাড়ীতে। এই দুর্দিনে বিনয় সেন শঙ্কাহীনচিত্তে তাঁদের বরণ করে নিলেন। এই প্রীতি এই সেবাপরায়ণতা ভুলবার নয়।

এখানে নিভৃতে বিপ্লবীদের মন্ত্রণাসভা বসল, নূতন কর্মোদ্যগের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে গভীর শলাপরামর্শ চলতে লাগলো।

নির্মল সেন সবাইকে সম্বোধন করে বললেন—"বিপ্লবীদের জীবনে আরাম লাভের অবকাশ নেই—আমরা ব্যক্তিগত জীবনকে ভালবাসিনি—জাতির জীবনকে ভালবাসতে শিখেছি মাস্টারদার কাছে। ক্লান্তি-শ্রান্তি চলার পথে সাময়িক বিরতি চাইছে—স্বীকার করি দেহের প্রয়োজনে তা'র প্রয়োজন আছে কিন্তু সেই অবকাশ অবসর আমাদের কোথায়? সময়ের প্রতিটি অংশ আমাদের কাছে

মূল্যবান। সুতরাং আমাদের থামলে চলবে না—আমাদের নূতন কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে যেতে হ'বে। যে পথের দিশারা আমরা, যে পথ আদর্শের অমল আলোতে উদ্দীপ্ত—সে পথ আমাদের ডাক দিয়েছে—'একলা চলরে'।"

মাস্টারদা তাঁরই বক্তব্যের জের টেনে বলতে শুরু করলেন—"ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক তোমরা, তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই আজ আমি সুস্পষ্ট জানতে চাই—তোমরা এই মুহূর্তেই নূতন কর্মকাণ্ডে হাত দিতে প্রস্তুত কি না! স্মরণ কর—১৮ই এপ্রিলের কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা, সকলে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছ—দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত দেশমাতৃকার পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে। আঘাতের পর আঘাত হেনে ইংরেজের শক্তির দম্ভকে ধূলিস্যাৎ করার ব্রতই তো তোমরা গ্রহণ করেছিলে। শুধু আঘাতের মধ্যেই আমরা সার্থকতা খুঁজবো, ভাবীকালের পথযাত্রীদের জন্যই আমরা সাফল্যের পথ রচনা করে যাব—শুধু এই কথাই তো তোমাদের এতকাল বলে এসেছি। 'জালালাবাদ মহাতীর্থের' ধূলো আমরা গায়ে মেখে এসেছি। যাদের আমরা জন্মের মত রেখে এলাম, স্মরণ রেখো তাদের।

আজ যে বেঁচে গেছি সে বাঁচবার জন্য নয়। দীপ থেকে দীপ জ্বেলে, জীবন থেকে জীবন সঞ্চার করে আমরা পথ চলবো। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জালালাবাদেব প্রত্যেকটি শহীদ এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছে—আমরা পথ চলবো। বুকে বজ্রশেল নিয়ে রক্তাক্ত কিশোর বীর টেগ্‌রাও বলে গেল—'সোনা ভাই, আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্য্যন্ত লড়বে।' কাজেই আর বিশ্রামের কথা আসে না—কর্ম বিরতির প্রশ্নও নয় আমি জানি, পথ আর পথ। চলা আর চলা। সাহসে বুক বাঁধো—নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হও। মনে রেখো, তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক—জালালাবাদের বিজয়ী সৈনিক।"

মাস্টারদা আবার বলতে শুরু করলেন—"আমরা একক যাত্রা শুরু করেছি। বৃহত্তর ভারত নয়, বিরাট বাংলা আমাদের কর্মক্ষেত্র নয়, আমরা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি চট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্র। এখানের আঘাতের ঢেউ দূরের সহধর্ম্মী বিপ্লবী প্রাণে নিশ্চয়ই একটা সাড়া জাগাবে। লাহোরে যতীনদাসের অনশনে মৃত্যুর নির্মম যাতনা দূরান্তে এই চট্টলার বুকে বসেও আমরা কত গভীরে অনুভব করছি। তেমনি একটি জেলার সসীম ক্ষেত্রে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাফল্য ও জালালাবাদের রণভেরী নিশ্চয়ই বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রেরণা যোগাবে। আমি চট্টগ্রামে বসেই চট্টগ্রামেব তরুণ প্রাণের স্বপ্নকে রূপ দিতে এইখানেই শেষ শয্যা পাতবো। যদি এখানে থাকা একান্ত অসম্ভব হয়, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাইরে গিয়ে কর্মক্ষেত্র রচনা করতে পার। আমি চাই চূড়ান্ত সাফল্য না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের আগুন অনির্বাণ থাকুক। ভিক্ষায় বা দর-কষা-কষি করে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। জীবন দিয়েই তো জীবন পেতে হয়।"

এখানে বিপ্লবী নায়ক বারীন ঘোষের বাণী স্মরণীয়—"We did not mean or expect to liberate our country by killing a few Englishmen. We wanted to show people how, to dare and die."

মনে রেখো মহান্ বিপ্লবী মদন লাল ধিংড়ার বাণী। তিনি বিচারকালে ইংলণ্ডের ওল্ড বেইলি আদালতে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

"The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves"

অর্থাৎ বর্তমানে ভারতবর্ষকে একটি মাত্র শিক্ষাই লাভ করতে হ'বে, তা'হ'লো মৃত্যুবরণের শিক্ষা এবং সে শিক্ষা দেবার ও একটি

মাত্র পদ্ধতি—মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুভয়হীন হ'বার প্রেরণা দান।

মাস্টারদার বক্তব্য সকলে গভীর ভাবে অনুধাবন করলো।

লোকনাথ বল বললেন—'মাস্টারদা, আপনি আমাদের আরব্ধ সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক। আপনার আদেশ ও নির্দেশই* আমাদের কর্ম-গীতা। আমরা সর্বক্ষণ আপনার আদেশের অনুবর্তী হয়েই আছি। আমাদের এখনকার মত করণীয় কি তা' আপনি ও নির্মলদা আমাদের নির্দেশ করুন।'

মাস্টারদা বললেন—'আমি ও নির্মলবাবু মোটামুটি ভাবে যা' স্থির করেছি, ধীরে ধীরে তাই তোমাদের বলছি। আমাদের ভাবী কর্মপন্থার আভাস এতেই তোমরা পাবে।'—এই বলে তিনি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলেন—

১। ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির এই চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের কথা প্রচারপত্রের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা

২। সংঘ গঠন

৩। অর্থ সংগ্রহ

৪। পূর্বাহ্ণে সরকারী কর্মতৎপরতার সংবাদ সংগ্রহ

৫। নূতন নূতন প্রোগ্রাম নিয়ে জেলার ভিতরে ও সুযোগ মত বাইরে শাসক ইংরেজকে আঘাত করে যাওয়া

৬। সম্প্রতি গ্রামের মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে বা পৃথকভাবে আত্মগোপন করে থাকা

৭। বিচ্ছিন্ন কর্মীদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ সাধন

৮। আহ্বান মাত্র পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা

বিপ্লবী কর্মীরা আর অলস মুহূর্ত কাটাতে চাইছে না। মরণপণ

আবার কোন এক নূতন প্রোগ্রাম এখনই তারা হাতে নিতে চায়। আবার দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বৃটিশ বাহিনীর উপর।

নেতা নির্মল সেন তরুণ বিপ্লবীদের অধৈর্য্য দেখে বললেন—'পলাতক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি, অনন্ত কাজ পড়ে আছে সামনে। হুজুগের মুখে কোন কাজ করা উচিত নয়। প্রস্তুতির প্রয়োজন, সেইজন্য চাই ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা।'

পলাতক জীবনের বেশ কিছুদিন কেটে গেল। শহর থেকে গ্রাম পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। মিলিটারী-পুলিশ তল্লাসীর নামে বাড়ীঘর তছনছ করে দিয়ে যেতে লাগলো। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের এই নারকীয় অভিযানে সহাযোগিতা ও উল্লাসের সীমা নেই। পুলিশের চেয়েও এই সাহেবদের দাপট যেন বেশী।

এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য এই তরুণদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লো—উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছে। তারা মাস্টারদার কাছে অনুমতি ভিক্ষা চাইলো। পাহাড়তলীর শ্বেতাঙ্গপাড়া তারা আক্রমণ করবে।

মাস্টারদা নিরলস কর্মবীর। কর্মজীবনে কর্মসমাপ্তিই তাঁর একমাত্র ব্রত। তার আগে বিশ্রামের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বুঝেছেন, জালালাবাদের বিজয়ী এই বীর তরুণদের আর ধরে রাখা যাবে না। আর রাখবেনই বা কেন? আঘাতে আঘাতে বৃটিশ সরকারকে পর্য্যুদস্ত করার সংকল্পই তো তাঁরা নিয়েছেন। যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, সেই যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিশিখা

অনির্বাণ-জ্বালিয়ে রাখতে হবে বৈকি! রক্তের অক্ষরে তাঁরা শপথ নিয়েছেন যে! বৈরাগ্যের পথে মুক্তিসাধনে তাঁদের বিশ্বাস নেই। সোজা হিসেব—'ব্লাড্ ফর্ ব্লাড'। মাস্টারদা অনুমতির সবুজ সংকেত দিলেন—

"ভাঙরে হৃদয়—ভাঙরে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর—।"

এই আত্মত্যাগী তরুণদের শৌর্য, বীর্য, সাহস ও চরিত্রবলের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুর অলক্ষ্যে বিপ্লবের বহ্নিশিখা স্বতঃই জ্বলছিল। ইংরেজদের কাছে এরা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী কিন্তু দেশবাসীর কাছে? তাদের কাছে কি এদের সত্যকার আদর্শ ফুটে উঠেছিল? না।

পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ যখন এদের জীবন, অনাহার—অনিদ্রায় ক্লান্ত শ্রান্ত এই তরুণেরা যখন সামান্য একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দরজায় দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে; অনেকেই নিরাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়—বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ কেউ তাদের ধরিয়েও দিয়েছে। 'কালাবপোলের সংঘর্ষে' এই চরমহঠকারিতার পরিচয় দেওয়া আছে।

এই দুঃখ, এই দুর্দশা, দেশবাসীর এই কৃতঘ্নতা তবু তাদের নিরাশ করেনি। প্রতিকূল ঝড়ের উজান বুকে ঠেলে তারা সুকঠিন সংকল্প সাধনে এগিয়ে গিয়েছে। নিস্পৃহ দেশসেবার পথে তাদের নিঃসঙ্কোচ আত্মবিলুপ্তিই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করে রাখবে।

'কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্র তীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই
দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ি।"

৬ই মে। রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী—এই ছ'জন পাহাড়তলীর শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'লো। পরণে অতি সাধারণ পোষাক কিন্তু বস্ত্রাভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা সযত্নে রক্ষিত আছে। তাদের হাব-ভাব ও চাল-চলনে সন্দেহের উদ্রেকের কারও কোন কারণ নেই।

পরিকল্পনামত শ্বেতাঙ্গপাড়ার কাছাকাছি গিয়ে দেখে—আক্রমণ অসম্ভব। সমস্ত পাড়াটি মিলিটারীর সতর্ক পাহারায় সুরক্ষিত। ঐ দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণ রচনা করা ছ'জনের একটি গ্রুপের পক্ষে অসম্ভবই নয়, বাতুলতামাত্র। অগত্যা হতাশায় ভাঙ্গা মন নিয়ে তারা ফেরার পথে পা বাড়াল।

ফেরার পথে সোজা গ্রামে নির্দ্দিষ্ট আস্তানায় তারা না ফিরে শহরের পথে রজত সেনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লো। আসল উদ্দেশ্য যখন সফল হ'লো না তখন হাতের সময়টুকু খরচ করে ঘুরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে পথ ঘুরিয়ে নিল। সত্য কথা বলতে কি, এখন ভাগ্য তাদের এক দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে চললো।

দীর্ঘ পথ শ্রমে ক্লান্ত এই তরুণেরা রজতদের বাড়ীতে এসে পৌঁছাতেই সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। মা বিনোদিনী

দেবী এই অভুক্ত ক্লান্ত সন্তানদের আদরযত্নে ভরিয়ে তুললেন। এই সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি দেশমাতৃকার এই সেবকদের নানা কাজে যে কতরকমে সাহায্য করেছেন তা' বলে শেষ করা যায় না। সেজন্য তাঁকে সহ্য করতেও হয়েছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনেক।

ছেলেরা সব খেতে বসেছে, এমন সময় রজতের ছোট ভাই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো—'পুলিশ! পুলিশ আসছে'। মুখে ভাত তুলতে হ'লো না—থালার ভাত থালায় পড়ে রইল।

অভুক্ত অবস্থায় তারা উঠে দ্রুত কর্ণফুলীর দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। দুঃসহ বেদনায় মায়ের বুক ফেটে যেতে লাগলো। সন্তানেরা অনাহারে ফিরে গেল!

রজতের পিতা রঞ্জনবাবুর ব্যবস্থায় একখানি ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে ছ'জন যুবক পাড়ি দিলো কর্ণফুলী নদী। পুলিশও ছুটতে ছুটতে নদীর কিনারায় এসে হাজির। সাব্-ইন্স্পেক্টর আব্দুল আজিম হক্ দেখতে পেলো একখানি ডিঙ্গি নৌকা তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। নির্দেশ মত পুলিশেরা প্রস্তুত হয়ে নৌকা নিয়ে পলাতক যুবকদের অনুসরণ করতে করতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আগের ডিঙ্গিটি পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেছে। পুলিশ তাদের পিছু পিছু আসছে তীব্রগতিতে। ব্যবধান অনেক হ'লেও যুবকদের দুশ্চিন্তা কাটেনি। প্রাণপণ গতিতে তারা দাঁড় টেনে ডিঙ্গি ছুটিয়ে চলেছে—মনে তাদের দুর্বার সংকল্প:

'......টানিয়া রাখিতে হ'বে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হ'বে হাল,
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হ'বে তরী।'

তীরে এসে ডিঙ্গি নৌকা ভিড়লো। ছ'জন যুবক তড়িৎ-

গতিতে লাফিয়ে পড়ে ডিঙ্গি নৌকা থেকে মাঠের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ভাগ্য তাদের পিছু টানছে।

আপাততঃ তারা পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেলেও পরে স্থানীয় অধিবাসীদের চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হ'লো। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে কাদের বিরুদ্ধে তারা হাত মেলালো? তাদের বিবেক কি এতটুকু দংশন করেনি যে, যাদের তারা ধরিয়ে দিচ্ছে তাবা যে তাদেরই আপনজন—দেশপ্রেমিক।

এই বিশ্বাসঘাতকতা কালারপোল সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটালো। কতকগুলো তাজা প্রাণকে তারা রক্তে ভিজিয়ে দিলো। কিন্তু ওরা তো বীরের মত প্রাণ দিয়েছে—দেখিয়ে দিয়েছে যে, ওরা মারতেও জানে মরতেও জানে। বুকের পাঁজরে বিপ্লবের হোমানল জ্বেলে, মৃত্যুকে জয় করে তারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে।

এই বিশ্বাসঘাতকদের আমরা চরম ঘৃণায় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছি। নরকের শাসন তাদের দেশদ্রোহীতার যোগ্য পুরস্কার!

ছ'জন যুবককে ছুটতে দেখে কালারপোলের একজন মুসলমান যুবকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং সে তাদের পিছু ধাওয়া করলে একজন যুবক তাকে গুলী করে ভূপাতিত করে। নিকটস্থ চায়ের দোকান থেকে আরেকজন ছুটে গেলে তাকেও গুলীবিদ্ধ করে ফেলে দেওয়া হ'লো। বিপ্লবী যুবকেরা বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য বড় রাস্তা ছেড়ে এবার মেঠো পথ ধরে ছুটে চললো। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা অনেকেই জড়ো হয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট্ রহিম আলীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদের পশ্চাদধাবন করলো। কিন্তু বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়তে থাকায় জনতা অনেক পিছনে পড়ে রইলো। সেই অবকাশে তারা অদৃশ্য হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

ইতিমধ্যে পশ্চাদধাবনকারী পুলিশদল এসে পড়ে। জনতার

সাহায্যে পুলিশ বিপ্লবীদের অনুসরণে ছুটতে থাকে। দু'পক্ষেই ধাবমান অবস্থায় সংঘর্ষে গুলী বিনিময় হ'তে থাকে। সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধৃত হয়। আহত বাকী চারজন পালিয়ে ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে।

জনতার চরম বিশ্বাসঘাতকার মর্মান্তিক পরিণতি এই 'কালার-পোল সংঘর্ষ'।

এই সংঘর্ষের শেষ অধ্যায় আমরা সরকারী বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

"ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার, ইন্‌স্পেক্টর ম্যাক্‌ডোনাল্ড, সাব্-ইন্‌স্পেক্টর আব্দুল আজিম, সাব্-ইন্‌স্পেক্টর হেমগুপ্ত—এই ক'জন, ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল ফৌজের আটজন সৈন্য ও চারজন কন্‌ষ্টেবল দ্বারা গঠিত আর একটি বাহিনী নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে 'উত্তর দেওয়ান' নামক গ্রামে উপস্থিত হ'লো। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট্ আব্দুস্ সাত্তারের কাছ থেকে আরও খবর পেয়ে শিকলবাহা খালের পশ্চিম পাড়ে গিয়ে আরও কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় দেড়-মাইল পথ হেঁটে তারা ফকিরমণির হাটে পৌঁছালো। সেখান থেকে আহম্মদ্ মিঞা নামে জনৈক গ্রামবাসীর নির্দেশ মত তারা আরও পোয়া মাইল পথ হেঁটে গিয়ে জুলদা নামক একটি জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

গ্রামবাসীটি একটি পুকুর পাড়ের বাঁশ ঝোপের দিকে দেখিয়ে দিতেই তারা দেখতে পেলো ঝোপের ভিতর একটা জায়গায় চারজন যুবক জড়ো হয়ে শুয়ে রয়েছে। আহম্মদ্ মিঞা 'ওই যে সেই লোকগুলো'—বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সেই যুবকেরা গুলী ছুঁড়তে শুরু করলো। ডি, আই, জি-র দলও নির্দেশ পেয়ে প্রত্যুত্তরে গুলী ছুঁড়তে লাগলো।

তিন-চার মিনিট ধরে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় চললো। তারপর ঝোপ থেকে আর কোনো গুলীর শব্দ পাওয়া গেল না। ডি, আই, জি, ও অন্যান্য সবাই তখন এগিয়ে গেল এবং দেখতে পেলো তিনজন যুবক মারা গেছে এবং চতুর্থজন গুরুতররূপে আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আব্দুল্ আজিম ও হেমগুপ্ত মৃতদের মধ্যে দু'জনকে—রজত সেন ও মনোরঞ্জন সেনকে সনাক্ত করলো। আহত যুবকটিকেও তারা দেবপ্রসাদ গুপ্ত বলে চিনতে পারলো। কিন্তু বাকী মৃত দেহটিকে তারা সনাক্ত করতে পারেনি। দেবপ্রসাদ গুপ্ত বললো যে, মৃতের নাম স্বদেশ রায়। ঘণ্টা খানেক পরে দেবপ্রসাদ গুপ্ত মারা গেল।"

একদিকে বিপুল জনতা ও সশস্ত্র বাহিনী আর অন্যদিকে মাত্র ছ'জন যুবক। কী বিরাট আয়োজন মাত্র ছ'জনের বিরুদ্ধে! বৃটিশ শক্তির সঙ্গে অমিত বিক্রমে লড়াই করেছে কালারপোলে মাত্র চারজন যুবক!!

স্বাধীনতাকামী চারটি বীরপ্রাণ। স্বাধীনতার বলি চারটি দেশপ্রাণ।

ময়না-তদন্তে দেখা গেছে, মৃতদের প্রত্যেকের দেহের দু' একটি গুলীর চিহ্ন স্বেচ্ছাকৃত। আত্মসমর্পণ করেনি, পরাজয় স্বীকার করেনি—তারা বীরের মৃত্যুবরণ করে রক্তে দেশমাতৃকার চরণ রাঙিয়ে গেল।

জালালাবাদের পর কালারপোল। সংগ্রামের ইতিহাসে আরেকটি রক্তোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন। এক অপ্রত্যাশিত সংগ্রাম অমর শহীদদের গৌরবের বিজয় মুকুট পরিয়ে দিল।

'অমৃতের পুত্রমোরা, কাহারা
শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি' আত্মারে কে
জানিল অক্ষয়!'

মাস্টারদার প্রাণের দ্বারে যারা স্নেহার্থ অতিথি হিসাবে একদিন উপস্থিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই বুকের তাজা রক্তের প্রস্রবনে বিধৌত করে দিয়ে গেছে দেশ জননীর চরণতল। এই সব অগ্র পথিকদের স্মরণ-চিহ্নে মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে জালালাবাদ, কালারপোল। বহ্নিমান এই মুক্তিসংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় শোনিত ধারায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

ইংরেজ শাসনের মর্যাদাকে চট্টগ্রামের অগ্নিপূজারীর দল দিনের পর দিন লাঞ্ছিত করে তুলতে লাগলো। পরাজয়ের গ্লানি ও পরাক্রমের দম্ভে বৃটিশ শাসকেরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলো। অত্যাচারের বল্গাহীন পৈশাচিক উল্লাস ছুটে চললো অগণিত জনতার উপর। বিপ্লবীদের দেশের বুক থেকে নির্মূল করার জন্য বৃটিশ সরকার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। মাস্টারদাকেও তাঁর সহনেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা দপ্তরের চেষ্টার ক্রটি নেই। কিন্তু এই বিপ্লবীদের উপর জনসাধারণের ছিল অশেষ শ্রদ্ধা, বিপুল বিস্ময়। এই দুর্জয় দুঃসাহসী বীরসন্তানদের ধরিয়ে দেবার মত দুঃসাহস আছে কার?

বৃটিশের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। বিস্ময় ও শঙ্কায় সকলে তা'তে অভিভূত হয়ে পড়ে। ১৯৩০ সাল, ২৮শে জুন। গোয়েন্দা বিভাগের হেড-কোয়ার্টার কলকাতার ১৫ নং ইলিসিয়াস্ রো-তে এক যুবক কয়েকটি চিঠি নিয়ে হাজির। চিঠিগুলো গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের কাছে

লেখা। সুস্পষ্ট মোটা মোটা হরফে পরিষ্কার করে লেখা প্রেরকের নাম—অনন্ত লাল সিংহ।

গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা যেন ভূত দেখে চমকে উঠলেন। চোখে ভুল দেখছেন না তো! তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্ধর্ষ নায়ক অনন্ত লাল সিংহ! যাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য তাঁদের সমস্ত চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে! স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নলিনী মজুমদার ও ইন্‌স্পেক্টর কুমারনাথ বোসের তখনও বিস্ময় কাটেনি।

দৃপ্তকণ্ঠে যুবক বললো—"আমি অনন্ত লাল সিংহ, আমায় গ্রেপ্তার করুন"।

যাই হোক, তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন তা' জানবার কৌতূহল পাঠকবৃন্দের হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা মূল চিঠির ইংরেজী কপিও তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে সন্নিবিষ্ট করেছি। এই চিঠিখানি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানতম ব্যক্তি আই, জি, মিঃ লোম্যানের কাছে লেখা।

Dear Mr. Lowman,

I shall meet you on the 28th June 1930. It is sure that you will never miss that Opportunity to arrest me then and there. Yes I am also quite ready for it. Never think it, please, that I am going to surrender. When a person surrenders ?—When he becomes quite helpless and finds no Other means to protect him then and there only he yeilds.

Am I helpless now ? No, certainly not. I have arms to protect me, ample money to spend in time of need ; many helpers help me, and good many

shelters in Bengal, Outside Bengal, as well as outside India to abscond.

Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing 'my arrest and why? Do you think, I am repentant for any of my actions? No, never, I am not a bit sorry. Then is it a mandate on me by my authority? No, it is my personal matter and absolutely private.

I am,
Revolutionary,
Ananta Lal Singh

প্রিয় মিঃ লোম্যান,

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো। আমি নিশ্চিন্ত যে আমাকে গ্রেপ্তার করার সেই অপূর্ব সুযোগ তুমি কিছুতেই হারাবে না। হ্যাঁ, আমিও সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কখনও মনে করো না যেন আমি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি। কখন মানুষ আত্মসমর্পণ করে?—যখন সে একান্তই অসহায় হয় এবং আত্মরক্ষার অন্য কোন পথ না দেখে তখনই কেবল সে নতি স্বীকার করে।

আমি কি এখন অসহায়? না, নিশ্চয় না, আত্মরক্ষার জন্য আমার অস্ত্র আছে; প্রয়োজনে ব্যয় করবার জন্য প্রচুর অর্থ আছে; আমাকে সাহায্য করবার অনেক লোক আছে এবং বাংলা, বাংলার বাইরে তথা ভারতের বাইরেও আত্মগোপন করার মতন আশ্রয় আমার আছে।

এখন আমি আমার সাথীদের সঙ্গে নিরাপদে পলাতক জীবন

যাপন করছি। কিন্তু তথাপি কেন আমি গ্রেপ্তার বরণ করছি? তুমি কি মনে করছো যে আমি আমার কোন কাজের জন্য অনুতপ্ত? না, কখনও না, আমি এতটুকুও দুঃখিত নই। তবে কি কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ? না, ইহা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়।

বিদ্রোহী
অনন্ত লাল সিংহ।

'অমৃতবাজার পত্রিকা,' 'বসুমতী' দৈনিক জ্যোতি' (চট্টগ্রাম) 'স্টেটস্‌ম্যান'—পত্রিকা সমূহের সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার কপি:

Deaa Sir,

I am Ananta Lal Singh and in my name the District Magistrate of Chittagong has declared rupees five thousand (Rs 5.000) as reward for my arrest.

I have posted one letter to Mr. Lowman, I. G. and the Copy of the letter is annexed here with. I shall do every thing accordingly as written in the letter. Please publish the letter addressed to Mr. Lowman within the 28th June, 1930 and oblige.

Thanking you in auticipation,
I am,
yours truly,
Ananta Lal Singh.

প্রিয় ,মহাশয়,

আমি অনন্তলাল সিংহ এবং আমার নামে চট্টগ্রামের জেলা সমাহার কর্তা গ্রেপ্তার করবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

আমি আই, জি, মিঃ লোম্যানকে একখানি পত্র ডাকে পাঠিয়েছি এবং সেই পত্রের অনুলিপিও এই পত্রের সঙ্গে প্রযুক্ত হ'লো। সেই পত্রে যা' লেখা আছে আমি তদনুরূপ পালন করবো। অনুগ্রহ পূর্বক মিঃ লোম্যানকে লেখা পত্রখানি ২৮শে জুন, ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রকাশ করে বাধিত করবেন। ধন্যবাদসহ—

আপনার বিশ্বস্ত
অনন্ত লাল সিংহ।

অনন্তলাল সিংহকে কড়া পাহারায় চট্টগ্রাম জেলে পাঠান হ'লো। সেখানে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'—মামলার বিচারাধীন আসামীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ায় সেই বন্দীরা মানসিক সজীবতা ফিরে পেল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বে জেলের বাসিন্দারা অভিভূত, বিস্মিত।

চন্দননগরের বিপ্লবী আস্তানা। কলকাতার নিকটবর্ত্তী অথচ কলকাতার ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসের বাইরে এই গোপন আস্তানার গুরুত্ব তখন ছিল অনেক। যুগান্তর দলের নিষ্ঠাবানকর্মী শশধর আচার্য্য ও সুহাসিনী দেবীর নকল সংসারে পলাতক বিপ্লবীরা

আত্মগোপন করে রইলেন। বহুদিন নিরুপদ্রবে ছিলেন এঁরা—'লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত।

কিন্তু বাংলার বিভিন্ন মহল তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আবার বাংলার বিপ্লবী সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। সুখী গৃহকোণ তাদের জন্য নয়—নিশির ডাকের মত সংগ্রামের ডাকে তারা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে—সর্বস্ব ত্যাগ করে আজ দেশপ্রেমিক বীর সন্ন্যাসী।

বেশ নিশ্চিন্তেই চারজন বিপ্লবী চন্দননগরের গোন্দল পাড়ার গুপ্ত আস্তানায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। সে সুখ বেশীদিন তাঁদের কপালে সইলো না। সংগ্রামই যাঁদের জীবন, সুখ তাঁদের জন্য বোধহয় নয়।

সেদিন ১লা সেপ্টেম্বর। কোন এক বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এবং ডেপুটি কমিশনার বার্টালি ও ম্যাকেণ্টি প্রচুর পুলিশ ও মিলিটারী নিয়ে মোটর যোগে কলকাতা থেকে চন্দননগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

গভীর রাত। ছ'খানা গাড়ী ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকার ভেদ করে। গুপ্ত আস্তানার বাসিন্দারা জানেন না এক বিরাট বাহিনী অতিদ্রুত ছুটে আসছে তাঁদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত লৌহবেষ্টনী রচনা করতে। নিশাচরের মত ভয়ংকর দৃষ্টি নিয়ে ছ'খানা মোটর চন্দননগরে এসে পৌঁছালো।

নিঝুম নিস্তব্ধ চন্দননগর। কোথাও যেন প্রাণের এতটুকু সাড়া নেই। শুধু জমাট অন্ধকারের কঠিন শাসন। ঘুমিয়ে আছে সারা শহর, ঘুমিয়ে আছেন গোন্দল পাড়ার বিপ্লবী চতুষ্টয়:

গাড়ী যেখানে থামলো সেখান থেকে এই আস্তানা বেশকিছুটা দূরে। কিন্তু আর গাড়িতে গেলে ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দে যদি বিপ্লবীরা সতর্ক হয়ে পড়েন এই আশংকায় সশস্ত্র টেগার্ট-বাহিনী অতি সন্তর্পণে পদব্রজে এগিয়ে চললো।·····

বিপ্লবীরা যখন পুলিশের আগমন টের পেলেন, তখন

আস্তানার চারিদিকে সুরক্ষিত বেষ্টনী পুলিশ রচনা করে ফেলেছে। তাঁরা প্রমাদ গণলেন। অতিক্রুত তাঁরা দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন। হাতে উদ্যত পিস্তল ও রিভলবার।

বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে একটি পুকুর ছিল। পালাতে গেলে একমাত্র এই পথেই পালাতে হ'বে—অন্য সমস্ত পথে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত শিকারের আশায় বসে আছে সশস্ত্র বাহিনী। অথচ নষ্ট করার মত সময় নেই। যা' কিছু করতে হ'বে এক্ষুনি। প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের সংকেত নিয়ে অপেক্ষা করছে।

অতি সতর্কে চারজনে পাঁচিল টপকে বাইরে এসে পড়লেন। বুকে হামাগুড়ি দিয়ে পুকুরের পাড় ধরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। পুকুরের পাড়ে তেমন ঝোপ-ঝাড়ও নেই যে নিজেদের আড়াল করে এগিয়ে যাওয়া যায়।

টর্চ্চের তীব্র আলো ঘুরে ঘুরে ফিরছে। এই অবস্থায় কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই একজন সার্জ্জেণ্টের টর্চ্চের আলো এসে পড়লো পলাতক যুবকদের গায়ে। আর যায় কোথায়! 'সঙ্গে সঙ্গে সার্জ্জেণ্টের রিভলবার গর্জে উঠলো। বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রও মুহূর্তে গর্জে উঠলো। দেখতে দেখতে একসংঘর্ষ বেধে গেল।

টর্চ্চের তীব্র আলোয় তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে—গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেক। শত্রুপক্ষ পাঁচিলের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে টর্চ্চের আলোয় নিশানা ঠিক করছে। এক ঝাঁক গুলী এসে জীবন ঘোষালের প্রাণ তৎক্ষণাৎ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রক্তাক্ত শহীদের দেহ পাড় থেকে গড়িয়ে পুকুরের জলে পড়ে গেল। রক্তে জলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মাত্র কয়েকটি যুবকের এই অসম-সংঘর্ষ বেশীক্ষণ স্থায়ী ছিল না। আনন্দ গুপ্তেরও পায়ে বুলেট এসে লেগেছে। লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ যেন অদ্ভুতভাবে অক্ষত রয়ে গেছেন—তীক্ষ্ণ সামরিক জ্ঞান ও দক্ষতাই বুঝি এর একমাত্র কারণ।

লোকনাথ বল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও পারলেন না। চারিদিক থেকে পুলিশ মিলিটারী তাঁদেব ঘিরে ফেললো। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত বন্দী হ'লেন।

ভোরবেলা জীবন ঘোষালের প্রাণহীন দেহ জল থেকে তুলে আনা হ'লো।

হঠাৎ যেন একটা কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে গেল। সমস্ত কিছু যেন এক ঝাপটায় 'ভেঙ্গে-চুরে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

শহরের পুলিশের সতর্কতা এড়িয়ে নির্জন আস্তানায় বিপ্লবেব সাধনায় পড়লো ছেদ—ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল অন্যদিকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে তীব্র জীবন-সাধনা তাঁরা শুরু করেছিলেন, তার গতিপথ স্তব্ধ হয়ে গেল। শুরু হ'লো আরেক জীবন যা' তাঁরা চাননি কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এসে গেল—সেই বন্দী জীবনের শুরু।

রাজ-বন্দীদের হাতের মুঠোয় পাওয়া মাত্রই শুরু হয়ে গেল অবিরাম অকথ্য নির্যাতন। তাঁদের শৃঙ্খলিত দেহ সবুট পদাঘাত, রাইফেলের কুঁদো ও বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

কয়েকটি দেহেব উপব যেন উন্মত্ত পাশবিক তাণ্ডব চলতে লাগলো।

নিজেদের জিঘাংসাকে চরিতার্থ করবার জন্য পুলিশদের মধ্যে দেহ ক'টাকে নিয়ে জোব টানা-টানি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'লো। এত নৃশংস অত্যাচারেও বন্দীরা তাঁদেব বিপ্লবের সাধনার অবমাননা করেননি। সু-কঠিন মানসিক প্রস্তুতির কাছে সরকারের সব প্রচেষ্টা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল—বন্দী বিপ্লবীদের মুখ থেকে একটি গোপন তথ্যও আবিষ্কার করতে পাবেনি।

দলের নেতা হিসাবে গণেশ ঘোষের উপরই নির্যাতন চলে বেশী। একজন প্রথমশ্রেণীব রাজ বন্দীর উপর কোন সভ্য জাতির এই অসভ্য বর্বর আচরণ কল্পনাতীত।

একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মচারী অকথ্য-ভাষায় গালিগালাজ

করতে করতে গর্জন করে উঠলো—'Answer our questions —answer you must. otherwise, we shall make you feel what is what'

কিন্তু গণেশ ঘোষের কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কি! প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় তিনি তীব্র কণ্ঠে জবাব দিলেন—'I have nothing to say—nothing! nothing!! nothing!!!'

নির্ভীক স্পর্ধিত ধ্বনিতে সমস্ত কক্ষ গম্ গম্ করে উঠলো।

অন্য বন্দীদের মধ্যেও যেন মুহূর্তে এই স্পর্ধা ও বিপ্লবীমনের উদ্দীপ্ত বিবেকের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। তাঁরা সংকল্পে অচল অটল। নির্যাতন যত বাড়তে লাগলো তাঁরা যেন দেহমনে তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণায় আরও কঠিন আরও অবিচল হয়ে উঠতে লাগলেন।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে নৃশংস অত্যাচারের রোলার চালিয়ে যখন ব্যর্থ হ'লো। তখন পুলিশ রক্তাক্ত দেহের তিনজন বন্দীকে হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি পরিয়ে ভ্যানে তুললো।

চন্দননগর থেকে হুগলী যাওয়ার পথে অগনিত জনতা তাঁদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানালো। সেই বিপুল জনতার চোখে বিপ্লবীদের জন্য ছিল প্রাণের ভালবাসার অভিব্যক্তি—আর ছিল, অত্যাচারী পশুশক্তি বৃটিশের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও হিংসার আগুন।

হুগলী থেকে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো সুদূর চট্টগ্রামে।

তিনজন চলে গেলেন কারাগারের লৌহ কপাটের অন্তরালে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে তাঁরা পড়ে রইলেন। পাষাণচাপা-হৃদয় নিয়ে শুধু ভাবছেন একজন সহযোদ্ধার কথা। জীবন ঘোষাল—চন্দননগরের মাটিতে যে রক্তাক্ত দেহটি পড়ে রইলো। বিপ্লব-বহ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ নিভে গেল।

মাত্র সতের বছরের একটি তরুণ প্রাণ। অদ্ভুত মনোবল ও আদর্শ নিষ্ঠায় যে অসাধারণ। ধণী পরিবারের সুখও স্বাচ্ছন্দ্যের

উন্মুক্ত পথ ত্যাগ করে পরাধীনতার লাঞ্ছনা ও শোষিতের আর্তক্রন্দনে ব্যাকুল হয়ে জীবন একদিন ঘর ছেড়েছিল। দেশমাতৃকার চরণে বিপ্লবের শোনিত-চন্দন মাখিয়ে আত্মত্যাগের জীবন্ত আদর্শ রেখে গেল। মৃত্যুহীন অমর পায়ে ভারতবাসী চিরদিনের প্রণাম জানাল—

'মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার,
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়।'

চট্টগ্রাম জেলকে এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মী ধৃত হয়ে এই জেলে বিচারাধীন আছেন। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ বিদ্রোহী নায়কদের সঙ্গে আছেন আরও অনেক দেশপ্রেমিক বীর সন্তান। এই বিপ্লবীদের নিয়ে পুলিশ ও মিলিটারী যেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় জেল প্রহরীদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে না পেরে বাইরে থেকে শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট ও প্রহরী আনা হ'লো অনেক। জেলের বাইরে মিলিটারী পাহারা—ভিতবে দবজায় দবজায় গেটে প্রহবীর পর প্রহরী সুবেষ্টিত, সুরক্ষিত। ঘন ঘন বড় বড় অফিসারদেব পরিদর্শন তো আছেই।

জেলের মধ্যেই আদালত বসানো হয়েছিল প্রথমে এই ভয়ে, পাছে জেল থেকে বাইবেব আদালতে বন্দীদের আনা-নেওয়াব পথে কোনো অঘটন না ঘটে। পরে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় বাধ্য হয়ে জেলের ভিতরের আদালত তুলে দিয়ে চট্টগ্রাম কোর্টে স্পেশাল-ট্রাইবুনালের কর্তৃত্বাধীনে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলাব বিচারের নামে বিচারের প্রহসন শুরু হ'লো। ট্রাইবুনালের সভাপতি কুখ্যাত সেসন্ জর্জ ইউনিসাহেব। বন্দীদের আদালতে এত সতর্ক

প্রহরায় আনা হ'তো যে তা' শুনলে অতিরঞ্জিত মনে হয়। আদালতে আসামীদের বসবার ঘরটি বাঘের খাঁচা অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত ছিল। চারিদিকে লৌহ-আবেষ্টনী—ভিতরে পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীরা। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী। পরিপূর্ণ আদালত—এত লোক, তবু এত ভয়!

প্রত্যহ বন্দীদের আসা-যাওয়ার পথে অগণিত গুণমুগ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতো। শুধু এই মহান্ বিপ্লবীদের একটু চোখের দেখা দেখবার জন্য অন্তরের কী গভীর ব্যাকুলতা! প্রত্যহ কাতারে কাতারে মানুষ তাদের বিক্ষুব্ধ অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য পথের দু'পাশে সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়িয়ে থাকতো। বিপ্লবীদের অন্তর ও মানুষের এই ভালবাসায় এই ব্যাকুলতায় গর্বে ভরে উঠতো

এইভাবে দিনের পর দিন চলেছে। বিচারের যাবতীয় খবর চট্টগ্রামের দৈনিক সংবাদ পত্র "পাঞ্চজন্য"-তে প্রকাশিত হ'তো। "পাঞ্চজন্য" হাজার হাজার কপি বিক্রী হ'তো। "পাঞ্চজন্যে" বিস্তারিত খবর ছাপা হ'তো বলে জনতার মধ্যে অসীম আগ্রহের সৃষ্টি হ'তো এই কাগজ সংগ্রহ করার জন্য। অন্যান্য কাগজ প্রকাশিত হ'তো কলকাতা থেকে সংক্ষিপ্ত খবর নিয়ে। বৃটিশ সরকারের তাই রক্তচক্ষুর শাসানি গিয়ে পড়লো "পাঞ্চজন্য"-এর উপর। তৎকালীন যুগে এই কাজগটি জন-জাগরনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকার সৃষ্টি করেছিল।

"চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন"—মামলার ব্যয়বহুল খরচ চালানো এক দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্যাতনে শঙ্কিত হয়ে অনেকেই ইচ্ছা সত্বেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হয়ে আসতে পারেনি। সুযোগ্য আইনজীবীদের উপর নানাভাবে সরকার চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো যা'তে তাঁরা বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করতে না পারেন।

কিন্তু সরকারী ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এই মামলার প্রাথমিক

সংকটে প্রথমে সমর্থনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু।

তারপর এলেন আরও কয়েক জন আইনজীবী যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে স্মরণ করতে হয়ঃ

ব্যারিস্টার যামিনী ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিনোদ সেন, শ্রীযুক্ত রজনী বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাতুল রায় ও শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেন।

চট্টগ্রামেব বাইবের যে সব আইনজীবী বিপ্লবীদের সমর্থনে সুযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র শাসমল, শ্রীযুক্ত অখিল দত্ত, শ্রীযুক্ত কামিনী দত্ত ও শ্রীশ্রীশ চন্দ্র বসু।

বিচারেব নামে আদালতে বিচারের ঘৃণ্য প্রহসন চলছে। একদিকে বিচার চলছে আর অন্যদিকে পলাতক বিপ্লবী কর্মীরা জেলায় নূতন ঘাঁটি তৈরী করে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে চলেছে। জেলের ভিতর থেকে মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে। জেল ভেঙ্গে পালানোর এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা প্রায় শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যায়। জেল কর্তৃপক্ষ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলেব ভিতব মাটির নীচে সঞ্চিত যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদ-মশলা উদ্ধার করে।

এত অর্থব্যয়, পাবিশ্রম ও কঠিন সতর্কতা অতর্কিতে বিফলতায় পর্য্যবসিত হ'লো ঠিকই কিন্তু বিদ্রোহী চট্টলাব দুর্দ্দম হৃদয়গুলো তা'তে বিন্দুমাত্র হতাশায় দমেনি। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওতপেতে রইলো। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"—এই দুর্জয় সংকল্পে তারা দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন রইলো।

জেলার বিখ্যাত খেলার মাঠ 'নিজাম পল্টন'। বার্ষিক ক্রী প্রতিযোগিতায় সভামণ্ডপে জেলা জর্জ মিঃ ইউনি, এস, পি, সুটার ও গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা উপ চারিদিকে পুলিশ ও মিলিটারী সুরক্ষিত প্রহরা

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। চারদিকে অপেক্ষমান জনতা। বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের নির্ভীক ও দৃঢ় সংকল্প মন—রিভলবার হাতে সুযোগের অপেক্ষার শুধু মুহূর্ত গুণছে।

হঠাৎ দ্রাম্-দ্রাম্-দ্রাম্—তিনটি গুলীই আসানুল্লার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দুঃসাহসী বালক হরিপদ ধরা পড়লো। চললো তার উপর অকথ্য নির্যাতন। ইলেট্রিক শক্ ও নখের ভিতর সূঁচ ফুটিয়ে নির্মম ভাবে অত্যাচার চালিয়ে স্বীকারোক্তির ব্যর্থ চেষ্টা চললো। দিনের পর দিন চললো এই অমানুষিক নিপীড়ন। কিন্তু বালক হরিপদ অতুলনীয় সহনশক্তির পরিচয় দিয়ে নিজের আদর্শ তথা বিপ্লবের মন্ত্রকে অমলিন রেখেছে। একটি কথাও পুলিশ আদায় করতে পারেনি।

এই অত্যাচারের কিছু কিছু পরিচয় বালক—বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের মুখেই শুনি: "আঁরে তক্তা চাবা দিইয়ে। তক্তাব মধ্যে কেঁডা কেঁডা আছিল। তক্তা চাবা দিইয়েরে ক'ন' কুড়ি-পঁচিশ মিনিট রাখ্যিল্"।- (আমাকে তক্তা চাপা দিয়েছে। তক্তার মধ্যে কাঁটা কাঁটা পেরেক ছিল। তক্তা চাপা দিয়ে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট রেখেছিল)। শুধু তার উপরই অত্যাচার হয়নি তার মা-বাবাকেও মারের হাত থেকে রেহাই দেয়নি বর্বর সরকার:

"মারে আর বাবারে এ্যাত মাইরগে্ যে, হিতানা বেহুঁস্ হই পোরি গ্যেয়ে গৈ।"- (মাকে এবং বাবাকে এত মার মেরেছে যে, তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান)। এদের বাড়ী-ঘরও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

হরিপদের যন্ত্রনার আর যেন শেষ নেই।

"তারপর নুনপানি অঁত্তর কোরি আঁর মাথার আর গার ঘা-র উদ্দি ছিঁড়ি ছিঁড়ি দে-র্। আঁই গা পোড়ানিতে টিকিত্ন পারির্।" —(তারপর নুনজল আমার মাথার ও গায়ের ক্ষতে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমি গা-জ্বলুনিতে থাকতে পারছি না)।

আঁর গা'-র্ বোও্ত জাগাত্ কাডি কাডি গ্যেয়ে গৈ। হাত্-টাত্ ফুলি এক্কেবারে্ ডব্ল্ হই গ্যেয়ে গৈ। ··· ক-র্-চৌ-র কিছু ন'দে'। হুদা উগ্‌গা জাইঙ্গা পিঁধাই রাইখ্যে।"—(আমার গায়ের অনেক জায়গা কেটে গেছে। হাত-টাত ফুলে একেবারে ডবল্ হয়ে গেছে।··· কাপড়-চোপড় কিছু দেয়নি। শুধু একটি জাঙ্গিয়া পরিয়ে রেখেছে)।

বালক হরিপদের বীরত্বে ও স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে 'জ্যোতি'-পত্রিকা লিখল:

"চৌদ্দ বৎসরের বালক এক হরিপদ নাম
গুলী করে আসানুল্লায় পাঠায় স্বর্গধাম।
সূঁচ ফোটা, ব্যাটারী চার্জ আর বেত্রাঘাত
সঙ্গীনের খোঁচাতে তার করায় রক্তপাত।
এভাবেতে অত্যাচার চলে বালক উপর।
ভাষায় প্রকাশেন ইংরেজ কতই বর্বর।
প্রতিবারে বালক উচ্চৈস্বরে কয়,
'বৃটিশের ক্ষয় হোক, মাস্টারদার জয়'।

(চট্টগ্রাম জ্যোতি প্রেস হইতে শ্রীবসন্ত কুমার দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত)

চিরাচরিত দাসত্বের বিরুদ্ধে অতন্দ্র সৈনিক? চির বিদ্রোহী মাস্টারদার এই তো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি জ্বালাতে পেরেছিলেন বিদ্রোহের অনির্বান-প্রদীপ, গণমানসের চেতনায় তিনি জাগাতে পেরেছিলেন স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খা-এ চিরস্থায়ী জয়ই তো বিপ্লবীর একমাত্র কাম্য।

১লা মার্চ, ১৯৩২ সাল। বিচারের প্রহসন শেষ। সকাল ৯টায় বন্দীদের আদালত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হ'লো। প্রত্যেকের হাতে হাত-কড়া পরান। পুলিশের এত ভয় সে সুরক্ষিত আদালত?

দুর্গের সতর্ক প্রহবাব মধ্যেও বন্দীদেব হাত-কড়া পরাতে হয়েছে!

গম্ভীর পদক্ষেপে তিনজন বিচারপতি যথাসময়ে এসে উপস্থিত হ'লেন। রায় সম্পর্কে কি দেশবাসী কি বন্দীদের কারও আশা-আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ নেই, কাবণ সকলেই জানে আসামীপক্ষের সুদক্ষ আইনবিদ্দের সমস্ত অকাট্য যুক্তি ব্যর্থ হ'বে—ইংবেজ শাসন ন্যায় নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দমননীতির স্বার্থে আইনকে ব্যবহার করবেই। এবং তাই হ'লো।

বিচাবপতি মিঃ ইউনি ১৩ জনেব দণ্ডাদেশ পড়ে শোনালেন ঃ

১। গণেশ ঘোষ

২। অনন্ত লাল সিংহ

৩। লোকনাথ বল

৪। সুবোধ কুমাব চৌধুবী

৫। লাল মোহন সেন

৬। ফণীন্দ্র লাল নন্দী

৭। রণধীব দাশগুপ্ত

৮। সুবোধ চন্দ্র রায়

৯। সহায় রাম দাস

১০। সুখেন্দু বিকাশ দস্তিদার

১১। আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত

এই এগাব জনেব যাবজ্জীবন সশ্রম কাবাদণ্ড।

১২। নন্দলাল সিংহ—২ বৎসর সশ্রম কাবাদণ্ড।

১৩। অখিল বন্ধু দাস—৩ বৎসর বোরস্টাল জেলে কারাদণ্ড।

বায়দান শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে "বন্দেমাতবম্" ধ্বনিতে আদালত কক্ষ কেঁপে উঠলো। বিদ্রোহীদের মনে এতটুকু হতাশা বা বিষাদের ছায়া পড়েনি গৌরবদৃপ্ত পদক্ষেপে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে আদালত কক্ষ ত্যাগ করে জেলে ফিরে এলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শেষ অধ্যায় শেষ। ন্যায় বিচারের নামে স্বাধীনতাকামীদের কণ্ঠরোধের জন্য শাসকশ্রেণীর আরেক ঘৃণ্য নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ এই মামলার রায়।

চট্টগ্রামে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে—সে আগুনের তাপ এসে লেগেছে ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুর, কলকাতায়। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অগ্নিশিখা ক্রমশঃ স্থান হ'তে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলার বিক্ষুব্ধ যৌবন জঙ্গীশাহী ইংরেজকে দিশেহারা বিচলিত করে তুলতে লাগলো। বিপ্লবী—বাংলার অভাবনীয় গণচেতনায় তারা প্রমাদ গণলো।

শাসক শ্রেণীর সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে মাস্টারদার সুসংহত নেতৃত্বে সংঘটন দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করে চললো। মাস্টারদা ব্যাপকভাবে গেরিলা আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন দেশবাসী সাহায্য ও অকুণ্ঠ সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলো তাঁর দিকে।

শাসক গোষ্ঠী দিনের পর দিন আরও নির্মম হ'তে লাগলো। পুলিশ-মিলিটারীর অকথ্য অত্যাচার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুললো। এত অত্যাচার এত নির্মমতার মধ্যেও দেশপ্রেমী সংগ্রামী দেশবাসী বিপ্লবীদের সাধ্যমত সমস্ত রকম সাহায্য দিয়ে যেতে লাগলো। মাস্টারদা দেশবাসীর দৃঢ় সমর্থনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বৃটিশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানালেন এক একটি সশস্ত্র প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

চাঁদপুর। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তী রিভলবার হাতে প্রস্তুত। তাঁরা শুধু সুযোগের অপেক্ষায়।

রাত প্রায় শেষ। শীতের রাত। কুয়াশায় অন্ধকার আরও বেশী গাঢ়, জমাট। কুয়াশার ঘোলাটে মোহজালে দুই বিপ্লবীর অভিপ্সীত লক্ষ্য ভুল হ'লো। স্টীমার ঘাটের পথে ইন্স্পেক্টর-জেনারেলকে মারতে গিয়ে রিভলবারের পর পর কয়েকটি গুলী গোয়েন্দা ইন্স্পেক্টর তারিনী মুখার্জির বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর? ঘটনাস্থল থেকে ১৪ মাইল দূরে রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তী ধরা পড়ে। চললো অমানুষিক অত্যাচার। লৌহদৃঢ় মনোবল তাঁদের ভাঙ্গে তা' সাধ্য কার!

এলো তারা কলকাতার সেণ্ট্রাল জেলে। বিচারে রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ড ও কালী চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হ'লো।

দলের শ্রেষ্ঠ কর্মী ও সংগঠকদের মধ্যে এই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস একজন। তার কর্মনৈপুণ্য বিস্ময়কর। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলো সে।

"বই পড়ে এই কয় মাসে প্রায় এক লাইব্রেরী বই পড়ে শেষ করে ফেলেছি। পৃথিবীতে যে এত জিনিস জানবার আছে তা' আগে জানতাম না।......ভারী ভাল লাগে পড়তে......।" —কালী চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে জেলের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এ কথা বলেছিলো।

তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন্দ্রদের সঙ্গে বরমাগ্রামের পথে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষ হয়। তারকেশ্বরের গুলীতে দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য গুরুতর আহত হয়।

আরেক সংঘর্ষ ধলঘাটের বুকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুবিশ্রুত সেই ধলঘাট। ধলঘাটের ধূসর মাটিতে আজও রক্তের ফোঁটা মিশে আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত কাহিনী এখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে। বিপ্লবীদের বহুসাধনার সিদ্ধ পীঠ এই ধলঘাট।

ধলঘাটের নবীন চক্রবর্তীর বাড়ী। নেতা নির্মল সেন, অপূর্ব সেন সহ আরও কয়েকজন বিপ্লবী সেনা এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। সারাদিনই তাঁরা দোতলায় একটি চোরা-কুঠরীতে প্রায় ঘর বন্দী হয়েই আত্মগোপন করে আছেন। বাইরে বের হ'বার উপায় নেই। বলা তো যায় না যদি কেউ দেখে সন্দেহ করে?

কিন্তু বিধি বাম। গৃহস্বামীর সব রকম সতর্কতা ও প্রযত্ন সত্বেও ইংরেজের চর টের পেয়ে গেল। খবর পৌঁছে গেল মুহূর্তে থানায়। থানা থেকে জরুরী বার্তা ছুটে গেল পুলিশের সদর দপ্তরে।

এক মুহূর্ত আর দেরী নয়। ক্যাপ্টেন ক্যামারণের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বাহিনী ছুটে আসতে লাগলো। গাড়ী নিয়ে ক্যামারণের সশস্ত্রদল নবীন চক্রবর্তীর বাড়ীর একটু দূরেই এসে নামলো।

সতর্ক প্রতিটি পদক্ষেপ। সামনে রিভলবার হাতে ক্যামারণ—পিছনে সারিবদ্ধ রাইফেলধারী সিপাই। সকলের অলক্ষ্যে বাড়ী ঘিরে ফেললো।

খট্-খট্-খট্। ক্যামারণ সদর দরজায় কড়া সজোরে নাড়তে লাগল। দোতলার একটা ঘুল-ঘুলি দিয়ে অপূর্ব যেন বাইরে উঁকি মেরে দেখলো।

সর্বনাশ! সমস্ত বাড়ী ঘিরে ফেলেছে! ছুটে গেল সে নির্মল সেনের কাছে।

খট্-খট্-খট্-খট্। ক্যামারণ কড়া নেড়েই চলেছে। নবীনবাবু দিশাহারা। কি করবেন তিনি? আশ্রিত ভাইদের বাঁচাবেন কি করে?

নেতা নির্মল সেন তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য—তারা প্রস্তুত। যে যার পজিশন্ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শুধু নেতার হুকুমের অপেক্ষা। রিভলবারের বুকে আঙ্গুল বসানোই আছে।

দড়াম্-দড়াম্-দড়াম্। দরজায় সিপাইদের সবুট লাথির শব্দ। দরজা এখুনি ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং আর দেরী নয়। উপরের ঘরের জানলা দিয়ে তিনি ফায়ারের আদেশ দিলেন।

রিভলবারের মুখ জ্বালিয়ে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুটে এলো। সিপাইরাও জানালা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে। গুলীর প্রচণ্ড শব্দে প্রতিবেশীরা হতচকিত। বাইরে বেরিয়ে সব দেখে ভয়ে তাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল।

নির্মল সেন দোতলার সিঁড়ির মুখে দরজার দিকে রিভলবার

তাক করে দাঁড়িয়ে।

তাঁকে ওখানে দাঁড়াতে দেখে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো ছ'জন সহযোদ্ধা। না, নির্মলদা, আপনি সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। মরতে হয় আগে আমরা মরবো।

নির্মল সেনের সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে।—We are all Soldiers.

Take your positions—যাও!

নেতার কড়া হুকুম। ছুটে তারা চলে গেল জানালার কাছে।

দড়াম্—দরজা ভেঙ্গে পড়ে গেল।

ক্যামারণ সদলবলে উপরে উঠে আসছে। ক্যামারণের আগে ছ'জন সিপাই। তাকে গার্ড করে আছে।

দোতলার সিঁড়িতে উঠতেই—দুম্-দুম্—গুলী খেয়ে একটি সিপাই লুটিয়ে পড়লো।

ক্যামারণের রিভলবার গর্জে উঠলো তৎক্ষণাৎ কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা' লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো।

নির্মল সেনের চোখে আগুন জ্বলছে। গর্জে উঠলেন তিনি—ক্যামারণ! তুমি—

বুম্-বুম্ Oh God! Save my—

মাথার খুলিতে গুলী লেগেছে। সিঁড়ি থেকে ক্যামারণ গড়িয়ে পড়ে গেল। তার শেষ কথা আর শেষ হ'লো না। উপর থেকে গুলী ছুঁড়ে একপক্ষ আরেক পক্ষকে উপরে উঠতে বাধা দিচ্ছে—নীচ থেকে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সশস্ত্র সিপাইরা উপরে উঠতে চাইছে।

বুম্-বুম্-বুম্—দু'পক্ষই মরিয়া। নিহত হ'লো আরও কয়েকজন সিপাই।

দুদ্-দুম্—সিপাইয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য।

আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। রক্তে সমস্ত বুক ভেসে যাচ্ছে। শেষ শক্তি দিয়ে আরেকবার ট্রিগার টানলেন। ব্যস্! নির্মল

সেন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বিপ্লবীদের একজন দক্ষ নায়ক চিরশয্যায় শায়িত। শান্ত সমাহিত। নিহত বিপ্লবী ভাই অপূর্ব সেন। মৃত্যু যেন কিছুই নয়—মৃত্যুকে এরা কত সহজে বরণ করে নিতে পারে!

'ওদের শাসন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে
বুকের রক্ত গোলাপ হয়ে—
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।'

শ্রদ্ধেয় নির্মল সেন সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। শহীদ নির্মল সেন মাস্টারদার সর্বচিন্তা, সর্বকার্যের অতি অন্তরঙ্গ সহকর্মী। তাঁর স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহারে দূরের মানুষকেও কাছে টেনে আনতো। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান পরামর্শ বিপ্লবীদের কাছে এক মহাসম্পদ ছিল। স্বভাবনম্র এই মানুষটি কখনও নিজেকে বড় করে তুলে ধরতে চাইতেন না—সকলের অলক্ষ্যে থেকে তিনি দিনের পর দিন শত বাধা বিপত্তির মধ্যে সংগঠনকে

সুদৃঢ় করে গড়ে তুলেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রসিক, মিষ্টভাষী, শান্ত কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে আমরা সম্পূর্ণ অন্য এক চরিত্রের মানুষ হিসাবে দেখি। অর্ডিন্যান্স আইনের কবলে পড়ে তিনি দীর্ঘ চার বৎসর বিনা বিচারে আটক ছিলেন। অন্যান্য নেতারা যখন জেলেন লৌহকপাটের অন্তরালে, তিনিই তখন মাস্টারদার পাশে থেকে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখে বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কর্মবীর নির্মল সেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়ান প্রত্যেকেরই মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

"যতই মনে পড়ে, নির্মলদা বলেছিলেন, Chittagong town এর বুকে একটা আগুন জ্বালিয়ে যাবেন, ততই সমস্ত অন্তর মথিত করে উৎসারিত হয়—"মরণেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল, প্রাণভরা আশা সমাধি পাশে।" (প্রীতিলতার ডায়েরী থেকে) মাস্টারদা বেদনাখিন্ন কণ্ঠে বললেন—"আজ আমার বড় দুর্দিন। আজ আমার ডানহাত খানিই ভেঙ্গে গেল। যে সময়ে নির্মল বাবুরই প্রয়োজন সর্বাধিক, ঠিক সেই সময়েই তাঁকে হারালাম।"

তারপর আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—কুমিল্লার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এলিসন্‌ হত্যা ও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো সাহেবকে আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করা। পুলিশ এই দুই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীদের কোন হদিসই পায়নি। অত্যাচারী শাসক হিসাবে এলিসন্‌ কুখ্যাত ছিল। তার লাঞ্ছনা ও পীড়নে রাজনৈতিক কর্মীরা ও তাদের সমর্থক পদমর্যাদাসম্পন্ন বহু ব্যক্তির জীবনও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী বিশ্বস্ত কর্মী শৈলেশ রায়ের অব্যর্থ গুলীর আঘাতে এলিসনের রক্তাপ্লুত দেহ চিরতরে লুটিয়ে পড়ে।

মদের দোকানের ভিতর ডুর্নো সাহেবকে আক্রমণ করে চট্টগ্রামের সরোজ গুহ ও নোয়াখালির রমেন ভৌমিক। ভাগ্যক্রমে ডুর্নো প্রাণে বেঁচে যায় কিন্তু কর্মজীবনের শেষ হয় এইখানেই।

বৃটিশের সদম্ভ শাসনের দুই অত্যাচারী কলঙ্কিত নায়কের শক্তহাত এইভাবে জঙ্গী কর্মীরা গুঁড়িয়ে দিল। চিরতরে স্তব্ধ করে দিল তার সমস্ত ঔদ্ধত্য।

নির্মল সেন বলেছিলেন—"মাস্টারদার শেষ কাজটি এখনো বাকি, সেটি হ'ল 'ফিমেল্ অ্যাক্শন্'। মেয়েদের দিয়ে একবার শক্তির খেলা দেখানো।"

অপূর্ব সংগঠন শক্তির একটি উজ্জ্বল রত্ন শহীদ রামকৃষ্ণ। অগ্নিযুগের ইতিহাসের এক দীপ্তিমান বহ্নি। মাস্টারদার ভাবশিখা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। প্রীতিলতার শস্ত্রগুরু শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের নৈতিকমান অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিল। এই দলে কোন মেয়েকে সদস্য করা সম্পর্কে তখন কড়া নিষেধ ছিল। যুক্তি ছিল, মেয়েদের দলের ভিতর আনলে তাতে দলের ছেলে ও যুবকদের মধ্যে চিত্ত বৈকল্য আসা স্বাভাবিক তাই দলের কড়া নির্দেশ ছিল, বিপ্লবী সদস্যরা নিজেদের মাও তেমন শ্রদ্ধেয় আত্মীয়দের সংগে ছাড়া অন্য মেয়েদের সংগে মেলমেশা করবেনা। কথাবার্তাও যথাসম্ভব বলবে না। দলের সদস্যরা দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সংগে এই নির্দেশ পালন করত।

বীর কন্যা প্রীতিলতা তখন চট্টগ্রাম ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে সম্মানের সহিত ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকার ইডেন কলেজে আই, এ,তে ভর্তি হয়েছে। তার সম্পর্কিত বড় ভাই একজন তখন বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট কর্মী। সেই ভাই যখন নানা নিষিদ্ধ বিপ্লবী "বই এনে পড়ত প্রীতিলতা তার বড় ভাইকে বলে, দাদা আমরা তোমাদের ওসব কাজ পারি না? "তার দাদা জবাব দেয়," না, মেয়েদের দ্বারা ওসব কাজ চলে না। গুলী চালাতে হবে, মারামারি করতে হবে—কত কঠিন সব কাজ, তোমাদের মত নরম মেয়েদের দিয়ে সে সব কাজ কি করে হবে?" প্রীতিলতার নাম ছিল, "রাণী"। "সে বলে, ইতিহাসে দেখেছি ঝাঁসীর রাণী ঘোড়ায়

চড়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমার নামও রাণী" আমিও পারব রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মত লড়তে।...... না ও না, আমাকে তোমাদের দলে—স্বাধীনতার জন্য আমিও তাদের মত মরতে পারব।"

স্বাধীনতার জন্য ছোটবোনের এই আত্মত্যাগের আকুতি বিপ্লবী বড় ভাইয়ের মনে প্রশ্ন জাগায়। অথচ কড়া নির্দেশ রয়েছে দলের। অনেক ভেবে বড়ভাই নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কথাটি একদিন দলের প্রধান মাস্টারদাকে বলে। প্রীতির সব কথা শুনে তিনিও কড়া নির্দেশ কিছুটা শিথিল করেন। নিজের আপন বোন এবং ঠিক তেমন সম্পর্ক বিশিষ্টা মেয়েদের দলের কিছু কাজ দেওয়া চলে—এই সিদ্ধান্ত তিনি জানান। তারা নিষিদ্ধ বই পড়বে, তাদের অলঙ্কার দিয়ে পার্টির অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে ও পার্টির গোপন বই ও অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে। মাস্টারদা নিজে তাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ নির্দেশাদি দেবেন। এই নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত যে সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত হয়েছিল, তা বিপ্লবীদলের সকলেই এবং দেশবাসীও পরে উপলব্ধি করেছিল। দলে মেয়েদের আনার সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন শহরে চারপাঁচজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ছাত্রী বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদেব কারও কারও সংগে মাস্টারদা দেখাও করেণ। তারা সকলেই তখন নানাভাবে সাহায্য করেছিল।

অগ্নিযুগের বীরাঙ্গনা নারীদের মধ্যে অন্যতমা এই বিদ্রোহিনী। যেমন স্নিগ্ধ চেহারা তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। চোখে ভরা যেন কিসের দীপ্তি। ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়ার সময় প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার যুব আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্টা হয়। প্রীতিলতা শুধু মেধাবী ছাত্রী সুলেখিকাই ছিলো না—লাঠিখেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় ও সিদ্ধ হস্তা ছিলো। ঢাকার দীপালী সংঘের সে ছিল বিশিষ্টা সভ্যা। বি, এ, পাশ কারর পর তাকে কিছুদিন শিক্ষয়িত্রীর

জীবিকায় নিযুক্তা থাকতে হয়েছিলো পারিবারিক আথক সমস্যার সুরাহার জন্য। পরে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিপ্লবের অগ্নিঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বর্বরদের আড্ডাখানা পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব। এই প্রমোদশালাকে ইতিপূর্বে গুঁড়িয়ে দেবার এক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এইবার আরেকবার আঘাতের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। পরবর্তী ঘটনা অগ্নিযুগের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়—নারী নেতৃত্বেব এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

শ্বেতাঙ্গ বর্বর শাসকের অমানুষিক অত্যাচারে চট্টগ্রামের নারী সমাজও লাঞ্ছিতা, জর্জ্জরিতা। মাস্টারদা তাই নারীব নেতৃত্বে ঐ বর্বরদের উচিত শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ডাক পড়লো প্রীতিলতার। দুর্জয় সঙ্কল্প বুকে জীবনেব নির্মাল্য নিয়ে প্রীতিলতা উপস্থিত। মাস্টাবদা তাঁব সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

"এতগুলো বীর ভাই থাকতে আমার উপব কেন এই গুরু দায়িত্ব?"—কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে প্রীতিলতা জানালেন। মাস্টাবদা —"না বোন, বীর যুবকের অভাব আজ নেই বাংলায়, বালেশ্বব থেকে কালারপোল পর্যন্ত এঁদেরই দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে গড়ে উঠুক প্রীতিলতা, এটাই যে আমি চাই। তোমাব এই অভিযানে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর নারীর আত্মদানেব কাহিনী আরম্ভ হোক—আরম্ভ হোক নূতন এক অধ্যায়। ইংরেজ দেখুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক যে, এ দেশেব মেয়েরাও আজ আর পিছিয়ে নেই।"

মাস্টারদার আদেশ সে মাথা পেতে নিলো। মনে কুলপ্লাবী আনন্দ, চোখে মুখে বিবাট পরিতৃপ্তিব উজ্জ্বল আভাষ। তার কাছে এলো চির-বাঞ্ছিত শুভক্ষণ মরণের জয়ভেবী বাজিয়ে।

সামরিক পোষাকে সুসজ্জিতা পুরুষ বেশী প্রীতিলতা। দু'চোখে

সাফল্যের দৃপ্ত বিশ্বাস। প্রণাম করে সে বললো—"মাস্টারদা জন্মের মত যাই, আশীর্ব্বাদ করুণ, আপনার ইচ্ছার পূর্ণতা সম্পাদনে আমি যেন অযোগ্যা না হই।"

সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে মাস্টারদা বললেন—'এস বোন। বিজয়গর্বে দৃপ্তা ভগিনীব গৌরব নিয়ে ফিরে এসো।'

১৯৩২ সালেব ২৪শে সেপ্টেম্বর। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে ৮জন যুবক রাত দশটায় ইউরোপীয়ান ক্লাবের কাছে এসে পৌঁছালো। ভিতরে টেবিলে টেবিলে পানোন্মত্তদের স্ফূর্তির ফোঁয়ারা ছুটছে। চলছে স্ত্রী-পুরুষেব বিকৃত রুচির নাচ। নেশাব ঘোবে সব বিভোর। ঘৃণ্য নির্লজ্জ নগ্নতাব এক বীভৎস দৃশ্য!

ইউরোপীয়ান ক্লাবের বাইরে আঁধার ঘেবা কিন্তু ভিতরে আলোর কী রোশনাই। বাইবে আলোর তীব্রতা না থাকায় সুবিধাই হ'লো। অন্ধকারের ছায়া মাড়িয়ে পায়ে পায়ে প্রীতিলতা তার সহযোদ্ধা ভাইদের নিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেললো।

বাইরে রইল কয়েকজন পাহারায়। অন্যদের নিয়ে দলনেত্রী ঝটিকা গতিতে ক্লাবঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো। ঝাঁপিয়ে পড়লো মাতাল ফিরিঙ্গিগুলোর উপর।

আচমকা এতগুলো লোককে সশস্ত্র অসহায় ভিতরে ঢুকে পডতে দেখে ও বোমার আওয়াজে ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু কবে দিল। পালাবে কোথায়? সব দরজা তো আগলানো। প্রীতিলতা গর্জে উঠলো—একটি ফিরিঙ্গী কুত্তাও যেন পালাতে না পারে।– ফায়ার!

মুহূর্তে বোমার বিস্ফোরণ ও প্রচণ্ড গুলীবর্ষণে প্রমোদশালা রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল। চীৎকার আর্তনাদে ও বোমা-গুলীর প্রচণ্ড আওয়াজে এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হ'লো।

ইতিমধ্যে একজন সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার

গুলী বিনিময় হ'লো।

দুর্ভাগ্য! প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার সিকিউরিটি গার্ডের গুলীতে আহতা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তাঁর কাজ শেষ। মাস্টারদার দেওয়া গুরু দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই বীরাঙ্গনা পালন করেছে। প্রতিশোধের জ্বলন্ত হিংসায় ইউরোপীয়ান ক্লাব খুনের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে প্রীতিলতা।

অধিনায়িকা প্রীতিলতা সকলকে এবার ফিরে যেতে বললো। মহেন্দ্র চৌধুরী ছুটে এসে জানালো—মিলিটারী আর্মাড করে ছুটে আসছে। মহেন্দ্র ছুটে তাদের প্রীতিদিকে মাটি থেকে তুলতে গেলো।—ওঠো তাড়াতাড়ি, ধরা পড়বে যে!

কিন্তু দলনেত্রী প্রীতিলতা স্মিত হাস্যে জানালো—'না ভাই'। "মৃত্যু আমায় ডাক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তূর্য্য।" এই রিভলবারটা নিয়ে যাও। এটা মাস্টারদাকে দিও আর তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। আমার আদেশ, আর এক মুহূর্তেও এখানে দেরী করো না। এগিয়ে যাও।"

কান্নাভরা বুকে দলনেত্রীর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে মহেন্দ্র চৌধুরী পা বাড়ালো।

পুলিশের হাতে ধরা পড়ে পাছে অপমানিতা লাঞ্ছিতা হ'তে হয় এই আশংকায় প্রীতিলতা পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্ খেয়ে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে।

প্রীতিলতার ডায়েরীতে লেখা ছিল—"I sacrifice myself in the name of god whom I have adored for years."

মৃত্যুর আগের দিন সে মাকে যে চিঠি লিখেছিলো তা' বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক। লিখেছিলো :

"মাগো তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হ'লো তুমি শিয়রে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছো আর তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছো?

আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম তুমি তোমার বড় আবদারের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটা কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম! তোমার চোখের জল মোছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে! তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছবার জন্য বুকেব রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে না।

একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝো না তুমি। তোমাব কথা এক মুহূর্তের জন্য আমি ভুলিনি মা! প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছ—"ওগো, তোমারা আমার রাণীশূন্য রাজ্য দেখে যাও।

তোমার সেই ছবি আমার দুচোখের উপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলি আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী তন্ত্রীতে কান্নার সুব তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যর জন্য স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি। তুমি কি তা'তে আনন্দ পাও না?

কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলাভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা!!

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আব কেঁদো না মা! যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইবো।

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছো, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছো—আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি! তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হ'তে পারলো কি করে? ক্ষমা করো মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো।"

তার আত্মদানে বাংলার নারী সমাজ সচেতন ও আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের ঘুম চোখে নিয়ে প্রীতিলতা চোখ বুজেছে চিরদিনের জন্য। 'বীর্যবত্তার পথে মৃত্যুদূতকে সাক্ষী রাখিয়া ভগিনী প্রীতিলতা যাত্রা করিল অমর লোকে, যেখানে বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদরা মেলা বসাইয়াছে। সেই কাহিনীই তো বাঙালী অনন্তকাল গর্বের সঙ্গে স্মরণ করিবে। বাংলার তরুণ-তরুণীব স্বপ্নলোকে ললাটে রক্ততিলক পরিয়া যাহারা ভীড় করিবে, চট্টলাব এই বীরাঙ্গনা তাহাদের পার্শ্বেই আপন মহিমার কীর্তিতে চিরভাস্বর হইয়া থাকিবে।'

এই বীরাঙ্গনা সম্পর্কে মাস্টারদার একটি মূল্যবান উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি 'বিজয়া'—শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'পনের দিন পূর্বে আমি তাহাকে স্বহস্তে যোদ্ধৃ বেশে সজ্জিত করিয়া মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়াছি। সে স্বহস্তে অমৃত পান করিয়া অমর

হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার অভাব ও বিসর্জন ভুলিতে পারিতেছি না।'

পরম প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা এই পাষাণ দেবতাকে কতটা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, এই উদ্বেলিত হৃদয়ের কান্নাভরা করুণ ভাষাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কর্তব্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগী এই সন্ন্যাসী বিপ্লবীদের একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের কর্মবহুল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে এমনি গভীর অনুভূতি সত্যই অপূর্ব, মহানুভবতার এক মহান পরিচয়।

অগ্নিযুগের সব্যসাচী সূর্যসেনকে বৃটিশ সরকার তন্ন তন্ন করে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি সে শাসকশ্রেণীর সাধের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন? তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কারের পরিমাণ পাঁচ হাজার থেকে বাড়িয়ে দশ হাজারে আনা হয়েছে। বিপ্লবের এই অগ্নিহোতাকে তাদের ধরতেই হ'বে।

১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী চট্টল বিপ্লবের ভাগ্যাকাশে এক দুর্দিন। বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কিত ইতিহাসের অধ্যায়ে আরেকটি দিনের সূত্রপাত।

মাস্টারদা তখন গৈরলা গ্রামের এক গোপন আস্তানায়। আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে। সঙ্গে আছে আরও বিপ্লবীরা ব্রজেন সেন, মনি দত্ত, সুশীল সেনগুপ্ত, কল্পনা দত্ত ও শান্তি চক্রবর্তী। বিপদের সমূহ সম্ভবনা সত্বেও এই গৃহকর্ত্রী এঁদের নিরাশ্রয় করে হিংস্র বৃটিশ হায়েনার মুখে ঠেলে দেননি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ঠেকাবে কে? নিয়তির অমোঘ বন্ধন লঙ্ঘন করে কার সাধ্য?

নেত্রসেন—বিশ্বাসঘাতকতার সেই কলঙ্কিত নায়ক। দুশ্চরিত্র পানাসক্ত এই লোভী দেশদ্রোহী অর্থের লালসায় লালায়িত হয়ে উঠলো। দশহাজার টাকা! পাশের বাড়ীতেই সেই দশহাজার টাকার লোভনীয় মাথাটি! ভাবতে ভাবতে অর্থগৃধ্নু এই মহাপাতকের মন নেচে উঠলো। সঠিক খবর তার কাছে। শুধু গিয়ে পৌঁছে দেওয়া গোয়েন্দা অফিসে।

ব্রজেন সেন এই নরাধমেরই ভাই—বিপ্লবের পুত অগ্নিমন্ত্রে সে মাস্টারদার কাছে দীক্ষিত। আর বৃটিশের দালাল নেত্রসেনের স্ত্রী কতদিনই না গোপনে এই বিপ্লবীদের নানা রকম রান্নাকরা খাবার গিয়ে গিয়ে খাইয়ে এসেছে! দুর্ভাগ্য এই সেবাপরায়না মহিলার এক অসতর্ক আনন্দের মুহূর্তে মাস্টারদাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে যায়।

ধূর্ত নেত্রসেনের চালাকি এই সরলমতি বধূ বুঝতে পারেনি।

নেত্রসেন এই বিপ্লবীদের ভাল-মন্দ খাওয়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে. খুশীতে যেন তার স্ত্রী আটখানা। 'দলের মধ্যে মাস্টারদা আছেন'—সুতরাং ভাল ভাল জিনিস বাজার করে আনার ফাই ফরমাস করে দিল।

এই খবরটির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হ'বার জন্যই নেত্রসেনের এই প্রস্তাব। ব্যস্, আর যায় কোথায়! বাজার করাব অছিলায় বেরিয়ে একেবারে সোজা গোয়েন্দা দপ্তর। পুরস্কারের পাকা ব্যবস্থা করে সে ফিরলো।

সন্ধ্যা নেমেছে। গ্রামের ছায়া ছায়া অন্ধকার ক্রমশঃ জমাট বাঁধছে। অন্ধকার বাড়ছে-রাতও গভীর হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া শেষে মাস্টারদারা বিশ্রাম করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা অন্যত্র আজ চলে যাবেন। নিজেবা প্রায় প্রস্তুত হয়ে আছেন।

হঠাৎ বাইরে প্রহরারত ব্রজেন সেনের চোখে পড়লো তাদেব বাড়ী থেকে একটি লোকের হাতে সিগন্যালের ভঙ্গীতে একটি হ্যারিকেন ক্রমান্বয়ে দুলছে।

তার মন অশুভ আশংকায় দুলে উঠলো। আলো হাতে যে সিগন্যাল দিচ্ছিল সে আর কেউ নয়—বিশ্বাসঘাতক নেত্রসেন। ব্রজেন ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাস্টারদাদের সতর্ক করে দিল। আর দেরী নয়—এক্ষুনি পালিয়ে যেতে হ'বে।

ইতিমধ্যে পুলিশ রাত্রির অন্ধকারে কর্ডন করে ফেলেছে।

মাস্টারদা সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিছনের দরজা দিয়ে। পুলিশের দৃষ্টিপথ ঘুরিয়ে দেবার জন্য তিনি যে দিকের পথ ধরছেন তার অন্যদিক থেকে গুলীবর্ষণ করে দিলেন কয়েক রাউণ্ড। পুলিশের মনোযোগ সেইদিকেই গেল ঠিক।

পুলিশের 'রকেট' বোমায় ঘটনাস্থল আলোয় আলোয় একাকার। মাস্টারদারা বাড়ীর পশ্চিমদিকের বাঁশবনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চললেন। একজন সঙ্গী অন্ধকারে খানায় পড়ে গেলে শব্দ হ'ল। শুকনো বাঁশপাতা পায়ের তলায় মর্মর ধ্বনি তুলেছে। পুলিশ সতর্ক হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ মিলিটারী রাইফেল থেকে illumination rocket ছোঁড়া হ'লো। আলোর ফুলঝুরি নিয়ে উপর থেকে সেই রকেট নামতে লাগলো।

দু'পক্ষেই গুলী বিনিময় হয়েছে কয়েক রাউণ্ড। আহত হয়েছে বিশ্বস্ত একজন সঙ্গী—ব্রজেন সেন। পুলিশ ব্রজেনকে গ্রেপ্তার করলো।

মাস্টারদা রিভলবার থেকে গুলী ছুঁড়লেন একজন গুর্খা প্রহরীকে লক্ষ্য করে। দুর্ভাগ্য সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'লো। পালাবার শেষ মুহূর্তে একটা গাছের আড়াল থেকে গুর্খা প্রহরী বেরিয়ে এসে মাস্টারদাকে জাপটে ধরে ফেললো।

দুর্বল ক্ষীণ স্বাস্থ্য মাস্টারদা। ধস্তাধস্তি করে পারলেন না নিজেকে মুক্ত করতে।

মাস্টারদা ধরা পড়লেন।

জাতির কুলাঙ্গার নেত্রসেনের চক্রান্ত সফল হ'লো। টাকার লোভে এই মহাবিপ্লবী নায়ককে সে তুলে দিলো বিদেশী শাসকদের হাতে। তাকে নিন্দার ভাষা আমাদের নেই। প্রায়শ্চিত্তের শত পূজায় ও এই মহাপাপীর কলঙ্ক মোচন হ'বে না। দেশবাসীর ক্ষমাহীন ক্রোধ শত অভিশাপের পুঞ্জীভূত-ভারবোঝা প্রতিনিয়তই তার উপর বর্ষিত হ'বে।

ক্ষমা সে পায়নি। দশহাজার টাকা পাবার অদম্য আকাঙ্খায়

সে ভরপুর। পুরস্কার সে পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে পুরস্কার বিপ্লবীদের হাতে। দেশদ্রোহীতার সমুচিত পুরস্কার!

একদিন। সেদিন বিচারের দিন। বিশ্বাসহন্তা নেত্রসেনের বিচার। দেশবাসীর হাতে তার বিচার!!

রাত প্রায় সাড়ে-নটা। সেন মশাই নানারকম ব্যঞ্জন পাতে নিয়ে আয়েস করে খেতে বসেছে! মনে কতই না স্ফূর্তি—দশহাজার টাকা দুয়েকদিনের মধ্যে এসে গেল বলে!

সে জানেনা বিচারের শেষ রায় নিয়ে তারই কয়েক গজের মধ্যে বিচারক অপেক্ষা করছে।

বাজার থেকে বেছে বেছে আনা বড় বড় কই মাছের একটি তুলে সবে মাছের মাথায় কামড় বসিয়েছে, আর তৎক্ষণাৎ এককোপেই তার নিজের মাথাটিও ঘাড় থেকে নেমে গেল। থালায় মাছের মাথার পাশে তার রক্তাক্ত মুণ্ডটিও গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

প্রতিশোধের এই গৌরবের যিনি অধিকারী তাঁকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না—তাঁকে আমাদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ আশীর্বাদ তিনি যুগ যুগ পেয়ে আসবেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেশদ্রোহীর এই চরম বিচারের দিনটি রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

মাস্টারদাকে ও ব্রজেন সেনকে গ্রেপ্তারের পর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। দীর্ঘ তিন মাইল গ্রাম পথের উঁচু-নিচু পথ দিয়ে তাঁদের লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হ'তে লাগলো। একজন অফিসার অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে মাস্টারদার নাকে সজোরে এক ঘুষি চালিয়ে দিল।

রক্তের ধারা বইতে লাগল তাঁর নাক দিয়ে। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তিনি দীর্ঘপথ চলতে অসমর্থ হয়ে মাঝে মাঝে বসে পড়তে লাগলেন। কিন্তু অত্যাচারীদের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক

হ'লো না—তাঁকে টানতে টানতে গলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। হাত-পা ছিঁড়ে গেল। জামা-কাপড় ছিঁড়ে শতচ্ছিন্ন।

মাস্টারদাদের গ্রেপ্তারের খবর ঝড়ের গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ঘরে ঘবে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। দলে দলে লোক পথে নেমে পড়লো শুধু একটি বারের চোখের দেখা দেখবার জন্য। তাদের হৃদয়—দেবতাকে বেদনার্ত হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য।

পটীয়ার ডাক-বাংলোর মিলিটারী ক্যাম্পে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া একটি ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে। বাইবে রাইফেলধারী মিলিটারীব সতর্ক প্রহরা বসানো হয়েছে। চট্টগ্রামের এই 'বীর সিংহ'-কে বিশ্বাস নেই। কোন এক অমিত ক্ষমতার যাদুবলে হয়ত উধাও হয়ে যেতে পারেন।

এমনি সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে অমব কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে বলেছেনঃ ' ··· কোন বিস্মৃতি অতীতে তোমার জন্যই তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে কারসাধ্য! এই যে অগনিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।

কাতারে কাতারে লোক পটীয়ারী ঐ ডাক-বাংলোয় এসে হাজির। উৎসুক অশ্রুসজল চক্ষে তারা তাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একী অবস্থা তাদের পরম দেবতার! প্রায় বিবস্ত্র, সর্বাঙ্গে নির্যাতনের অসংখ্য ছাপ অসংখ্য ক্ষত! তবু তিনি অগ্নি-দীপ্ত ও গম্ভীর! কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো জনতা।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই মহান নেতার প্রতি বর্বর সরকারের এই নির্মমতা সভ্যজাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কিত রূপ। বন্দী অবস্থায়ও

তাঁর রেহাই নেই। পুলিশ সুপার এসে তাঁকে আরও বেত্রাঘাত করলো। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করতে কলম বার বার থেমে যায়। দুঃসহ দুঃখে হাত অবশ হয়ে আসে। কী নিষ্ঠুর! কী নির্মম!!

বন্দী সূর্য্য সেন ও ব্রজেন সেনকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করা হ'লো। সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করা হ'লো জেলখানাকে। জেলের এক নির্জন কুঠরীতে অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় তাঁকে রাখা হ'লো। কোন বই, সংবাদ পত্র, কাগজ-কলম-পেন্সিল কিছুই তাঁকে দেওয়া হ'তো না। দিনের মধ্যে একবার কয়েদী মেথরের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়। নির্জন কুঠরীর ভিতরে খোলা পায়খানা পরিস্কার করতে যখন মেথর আসতো তখনও সশস্ত্র প্রহরী তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। কোন কথা বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। কেবল বোবা ভাষায় নীরব দৃষ্টি বিনিময় হ'তো দু'জনের মধ্যে।

নোংরা ছোট্টঘরের মধ্যে মাস্টারদার দুঃসহ একঘেয়ে জীবন গড়িয়ে চলতে লাগলো নির্জন কারাকক্ষে বসে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার কদর্য্য—কর্দমের কথা ভাবছেন—ভাবছেন, ভাবে, আদর্শে ও কর্মে দীপ্যমান দুরন্ত দুর্জয় সংকল্পের উল্কাপিণ্ড সেই সব তরুণ প্রাণের কথা! জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কেউ কেউ দেশমাতৃকার পূজা করে গেছে, কেউ কেউ জেলের লৌহ কপাটের অন্তরালে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। আর যারা এখনও বৃটিশের লোলুপ দৃষ্টির বাইরে; তারা অনিশ্চিত দুঃখ দুশ্চিন্তার উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে চলেছে। ...

মাস্টারদা ধরা পড়ার পর দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে তরুণ কর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। আনোয়ারা থানায় গহিরা গ্রামের এক আশ্রয় কেন্দ্রে তখন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, মনোরঞ্জন দাস ও মনোরঞ্জন দে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১৮ই মে (১৯৩৩ সাল) ভোরবেলা পুলিশ মিলিটারী এই কেন্দ্রটি ঘিরে ফেলে। তারপরের ঘটনা কল্পনাদত্তের ডায়েরী থেকে পড়ে শোনাচ্ছি:

"........ভোরবেলা একটু দেরীতেই ঘুম ভঙ্গলো। তাড়াতাড়ি বাইরের কাজ সেরে ঘরে ঢুকতেই একটি আর্তনাদের শব্দ শুনলাম —পুলিশ-মিলিটারী এসেছে। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালানো যায়, তা'ছাড়া পুলিশ ব্যূহ ভেদ করেও দুয়েকবার পালিয়েছি। কিন্তু দিনের বেলায় পালিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা জেনেও শুধু শুধু ধরা দেবনা এইভাবে বেরিয়ে যাব ঠিক করলাম। দু' একজন মারা গেলেও অন্ততঃ দু' জন বেরিয়ে যেতে পারবো এ দুরাশা আমাদের ছিল। সামনে আমি ছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বুকের দিকে এক হাত দূরে রাইফেল ধরে এক সৈন্য দাঁড়ালো। পলায়ণের চেষ্টা বৃথা হ'বে দেখে আমরা ঢুকে পড়লাম একটি খালি কোঠা ঘরে॥

ঘরের ভিতর থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম বাইরে ভীতার্থ মেয়ে ছেলে পুরুষের চীৎকার ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি।.... এবার আমরা একযোগে রিভলবার থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলাম। দেওয়ালের আড়াল থেকে লক্ষ্য করে গুলী করে আমাদের উপায় ছিলনা। ১২ রাউণ্ড গুলীর পর আর গুলী ব্যবহার করা গেল না। আমাদের তৈরী গুলী আর পরীক্ষা করার সময় পাইনি।

অন্যদিকে সৈন্য-বাহিনী বেপরোয়া গুলী চালাতে লাগল। একটি গুলী এসে লাগল বাড়ীর মালিক পূর্ণ তালুকদারের বুকে। ছোটভাই নিশি তালুকদার যখন তাঁর দাদাকে ধরতে গেলেন, তিনিও বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অসহায়ের মত ঘরে বসে অন্যদের মৃত্যু দেখার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার এবং এই খোলা গুলীর মধ্যে পালাবার আর একবার সুযোগ নেওয়া যাক, নতুবা মৃত্যু হোক্—এই ভেবে যেই দরজার দিকে এগিয়েছি, জানালার পাশ দিয়ে একটি গুলী এসে আমার হাতের পাশ দিয়ে খোকার (মনোরঞ্জন দাস) বুকে গিয়ে লাগল। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আমাদের জন্য অযথা আর মৃত্যু

ঘটতে দেবনা—এই স্থির করে আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।

কম্যাণ্ডার যখন আমাদের উঠানের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখলাম রক্তে মাখামাখি অনেক দেহ পড়ে আছে। আহতের সংখ্যাও কম নয়। প্রতিরোধের জন্য যারা এসেছিল তাদের উপর নির্মমভাবে হিংস্র পশুর দল প্রতিশোধ নিল। কিন্তু ভাববার মত মানসিক অবস্থা ছিল না, শুধু মনে হ'তে লাগল, নিরীহ মানুষের এই আত্মত্যাগের সার্থকতা আসবে কি ?"

এই বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের পরও চট্টগ্রামের উপর অত্যাচারের যে নির্মম রোলার চালানো হয়েছিল তা' অবর্ণনীয়। দেবমন্দির থেকে বিবাহবাসর, সম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি ইত্যাদির দ্বারা জনজীবনে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলো। রাতভোর, কখনও দিনভোর —দিনের পর দিন চললো কারফ্যু। সামরিক নির্যাতনে মানুষের নাভিশ্বাস উঠতে লাগলো।

তথাকথিত দাঙ্গার তদন্ত করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত পরে কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় যা' বলেছিলেন, তা' অনুধাবন করলে বৃটিশ সরকারের নগ্ন বীভৎসরূপ উৎঘাটিত হয়ে পড়বে।

তিনি বলেছিলেন :

"I have personally inspected the places where these occured. I have visited the houses which have been destroyed. I have visited a printing press which has been broken to pieces, I am sorry to say, by some non-official Europeans.

(This press belonged to the the Chittagong printing and Publishing House Limited from which the daily 'Panchajanya' is published.)

Houses have been destroyed and burnt in the

middle of day, not by Mohammedans, not by paid hooligans but by the so called protectors of the peace, the police—the British officers and the Gurkhas. Therefore, it does not to my mind, require any investigation. One has to merely go and witness the havoc, the destruction of houses in the town and in the villages. One need not do anything but merely look at the severe injuries which still remain on the bodies of persons on whom these injuries were inflicted"

মাস্টারদাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসার কাজে হাত দিয়েছে সুখেন্দু দত্ত, অমূল্য বিশ্বাস প্রমুখ কর্মীবৃন্দ। এই মহান নেতার মুক্তির জন্য জেলের অভ্যন্তরস্থ কয়েকজন সরকারী কর্মীও সম্ভাব্য যাবতীয় সহযোগিতা করে চললো। তাদের মাধ্যমে জেলের প্রধান ফটকের, মাস্টারদার কক্ষের ডুপ্লিকেট চাবিও বিপ্লবী কর্মীদের হাতে এসে গেছে। জেলের ভিতর পাচার হয়ে গেছে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, ডিনামাইট। ঝাড়ুদারের মাধ্যমে মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ চলছে অত্যন্ত সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে।

কারা প্রাচীরের অদূরেই লালদীঘি। দীঘির পশ্চিম পাড়েই একটি পানের দোকান। দোকানের কর্মী পান্নাসেন বিপ্লবীদলের সভ্য। জেলের নিকটবর্তী এই ঘাঁটি থেকেই জেলের অভ্যন্তরে সংবাদ আদন-প্রদান চলছে।

সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। জেল ভেঙ্গে মাস্টারদাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসার সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ। মাস্টারদা সুযোগের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

শহরে তখন 'কারফু' চলছে। স্বাভাবিক দিনেই মানুষ অত্যাচারী

পুলিশ-মিলিটারীর ভয়ে বিনা প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে বড় একটা বের হয় না।

'কারফ্যু'-র দিন। সন্ধ্যাবেলা। রাস্তাঘাটে লোক নেই। ঘরের মধ্যে টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলছে। মানুষের উৎকণ্ঠা ভরা মন। বাইরে অন্ধকারেব কড়া শাসন।

জেলগেটের কাছে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতর থেকে একজন ওয়াডার ছদ্মবেশে বাইরে বেরিয়ে এল। তু'জনে রাস্তার আবছা অন্ধকারে দ্রুত হেঁটে চললো লালদীঘিব দিকে।

একজন গোয়েন্দা অফিসার ঠিক ঐ সময় গাড়ী নিয়ে ঐ পথে আসছিল। 'কারফ্যু'-র রাতে তু'ইজন পথচারীকে চলতে দেখে তার সন্দেহ জাগে এদের তখন গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে গোয়েন্দা অফিসার সদলবলে অগ্রসর হ'তে থাকে।

অফিসারটি লালদীঘিতে এসে যথা সময়ে শৈলেশ রায় ও জেলেব ওর্য়াডারকে গ্রেপ্তার করে। যাবতীয় কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র তল্লাসী কবে পুলিশ উদ্ধার কবে।

ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। তুর্ভাগ্যের স্রোতে সমস্ত প্রচেষ্টা নিমেষে বিলীন হয়ে গেল। চললো নানা স্থানে আরোও ব্যাপক তল্লাসী ও গ্রেপ্তার। জেলের চারিদিকে তীব্র সার্চ লাইটের আলোয় কড়া মিলিটারী প্রহরা বসল।

ষড়যন্ত্রের গতি রুদ্ধ হ'ল। ইতিহাসের চাকা গেল ঘুরে। জেলের বাইরে ও ভিতরে মুক্তি অথবা মৃত্যুর জেহাদ ঘোষিত হ'লো। সরকার যত অত্যাচার চালায় দেশপ্রেমী যুবকেবা আরও তত মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ঘটতে লাগল বিভিন্ন স্থানে একের পর এক সংঘর্ষ। রক্তের ঋণ রক্তে শোধ।

ঘটনাচক্রে তুর্ধর্ষ বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে চললো তার উপর নির্মম অত্যাচাব।

তখন মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচারের

নামে অপূর্ব প্রহসন চলছে। সেই স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের বিচারক ছিলেন এই তিনজন :

১। মিঃ ম্যাকসার্পি, বাখরগঞ্জের দায়রা জর্জ
২। মিঃ রজনী ঘোষ, সিলেটের এ্যাডিশনাল দায়রা জর্জ
৩। মিঃ খোন্দকার আলী তোয়েব, চট্টগ্রাম জেলার বি, ডিভিশন এস, ডি, ও।

এই ট্রাইবুন্যালের অধীনে প্রায় একবছর বিচারের নামে প্রহসন চালে। জেলের মধ্যেই একটি ঘরে এই গোপন বিচারের ব্যবস্থা হয়। বিচারের কি রায় হ'বে তা' অনুমান করতে কারও কষ্ট হয়নি। মাস্টারদার মুক্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, ফাঁসি অবধারিত। আইনের ন্যায় বিচারে মাস্টারদাকে ফাঁসি দেওয়ার সপক্ষে সরকারের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই এবং নেই বলেই ন্যায় নীতিকে লঙ্ঘন করে এই মহান দেশপ্রেমিকের মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করেছিল।

বিচারে কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির হুকুম হ'লো মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর।

কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে দুই তেজস্বী বিপ্লবী ফাঁসির দিন গুণছেন। চোখে-মুখে তাঁদের এতটুকু ভয়, এতটুকু বেদনার ছাপ নেই। নৈরাশ্যে প্রাণশক্তির এতটুকু ক্ষয় নেই। দীপ্ত, প্রশান্ত, সৌম্য তাঁরা।

মাস্টারদা ফাঁসির দিনের আগের কয়েকটি দিন লেখা ও ধর্ম-পুস্তক পাঠের মধ্যে কাটিয়েছেন। গোপনে পাঠিয়েছেন সহকর্মীদের কাছে নানা নির্দেশ, উপদেশ। তখনও সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি অদম্য আকাংখা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'বিজয়া' তিনি জেলে শুরু করেছিলেন কিন্তু তা' অর্ধ-সমাপ্ত থেকে যায়। তিনি সেখানে লিখেছিলেন যে, অনেক সাথীর

জীবন স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁরই নির্দেশে বিসর্জিত হয়েছে। কিন্তু তবু বহু-ঈপ্সিত মুক্তি আসেনি। তিনি বিজয়ার আর এক অংশে লিখেছেন—'ছয় মাসের সযত্ন আয়োজনের পর ১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রামে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করল। প্রত্যেক নেতা ত'াতে যোগদান করেছে'—এই সময় তাঁর মনের মধ্যে অতীতের স্মৃতিভরা দিনগুলো এসে ভীড় করছিল। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে এই আত্মসমালোচনা, এই ভাবাবেগের এক প্লাবন আমরা দেখতে পাই।

ছোট বড় প্রতিটি ঘটনার উপর তিনি যেন শুধু দক্ষহাতে ভাষার তুলি বুলিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন-স্মৃতি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি—ইতিহাস ও সাহিত্যের এক মহা মূল্যবান দলিল চিবতরে হারিয়ে গেল।

সুলেখক মাস্টারদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেব খুব ভক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে বিপ্লবী নিরঞ্জন সেন এক জায়গায় লিখেছিলেন ঃ

"মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে বলতে গর্বিত হয়ে উঠতেন। আমাদের জাতীয় জীবনের কত বড় সম্পদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তাঁর সজাগ মন ববীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কত যে খোরাক পেয়েছে।.........মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে মাস্টারদা কবিগুরুর কবিতা আওড়াতেন।... আমি কবিতায় বড় বেশী গা মাখাতে চাইতাম না। মাস্টারদা সেই সব জেনে শুনেই আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন—কবিতাকে ভালবাসলে তুমি অবিপ্লবী হয়ে যাবে না, বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওতপ্রোতভাবে জড়ানো...... ..।"

মাস্টারদা প্রায়ই আবৃত্তি করতেন এই কবিতাটি :

".........এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।" .....

সমগ্র জাতিকে সুপ্তি থেকে ভয় থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য কি ঐকান্তিক তাঁর আকুতি! জাতির জাগরণের সুকঠিন চিন্তা মুক্তিকামী এই বিদ্রোহী নায়কের সুনবীন ধ্যানে ভরা।

যুগ যুগ ধরে মদমত্ত বিদেশী শাসকের নির্মম অত্যাচারে জাতিব দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত। স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের দু'হাত জনতার খুনে লালে লাল। দুঃসহ বেদনা ও আর্তেব ক্রন্দন তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। ইংরেজের শাসন ও পীড়নের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত ডাক দিয়ে গেছেন।

বিষাদে ভরা চট্টগ্রাম জেলের প্রতিটি কয়েদীকক্ষ। বিষাদে ভরা সারা চট্টগ্রাম। ফাঁসির দিনটির জন্য মাস্টারদাও তারকেশ্বর দস্তিদার অপেক্ষা করছেন। ফাঁসির তারিখটি সম্বন্ধে খুব গোপনীয়তা বক্ষা কবার চেষ্টা হয় কিন্তু জেলেব কয়েদীদের মধ্যে এ গোপনীয়তা ধরা পড়ে যায়। কারণ জেলে যখনই কোন ফাঁসির সিদ্ধান্ত হয় তখন ঐ ব্যাপারে কতগুলো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়। যাদের ফাঁসি হ'বে, তাদের ওজনেব নকল মানুষ বা ইটপাথরের ভর্তি বস্তা নূতন কেনা শক্ত দড়িতে তা' ঝুলিয়ে বারবাব দডির শক্তি পরীক্ষা করা হয়। ফাঁসির সাতদিন আগে থেকে এই প্রস্তুতি চলতে থাকলে সন্দেহ ক্রমে জেলের মধ্যে এই সংবাদ ছড়িয়ে যায়, যে, এত আয়োজন এত সতর্ক ব্যবস্থা যাঁদের জন্য তাঁরা হ'লেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার।

জগতের আলো চিরদিনের জন্য তাঁদের চোখ থেকে নিভে যেতে আর বেশী দেরী নেই। তাদের চোখে ঘুম নেই। কখন রাত্রির অন্ধকারে তাদের প্রিয়নেতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মেবে ফেলে এই দুশ্চিন্তায়। জেলের সাধারণ কয়েদীরা, কারারক্ষীরা ডাক্তার ইত্যাদি কর্মচারীরা এই মহান নেতাকে পরম শ্রদ্ধা করতো। তারাও ফাঁসির তারিখ রাজনৈতিক বন্দীদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু

তাঁকে মুক্ত করে আনার আর কোন প্রচেষ্টাই সম্ভব নয়। ব্যথা-বেদনাহত হৃদয়ে সেই শেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ফাঁসির তারিখটি মাস্টারদাও জানতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য! মনে এতটুকু দুঃখ এতটুকু দুর্বলতা স্থান পায়নি। সেই মিষ্টি হাসিটি তখনও মুখে লেগে আছে।

অদ্ভুত অদম্য শক্তির প্রাচুর্যে ভরা এই পুরুষ। জীবনের সেই শুভক্ষণটির জন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করছেন। অপার্থিব আনন্দে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি গুন্ গুন্ করে গেয়ে উঠলেন:

'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে
যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমাব চরণ দোলা—
লাগিয়ে দিয়ে—'।

অসীম মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে জীবনে বহুবার ফিরে এসেছেন—ব্যাকুল হৃদয়ে সেই মহা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য এখন তিনি অধীর।

অসম্ভব সহনশীলতা তাঁর চরিত্রে দেখেছি। নিগ্রহ, নিপীড়ন তাঁকে আরও করেছে অগ্নিদীপ্ত ও দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়। হিজলী জেলে বন্দীদের উপর গুলী চললে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি প্রচাব পত্রে এই কথা প্রচার করেছিলেন—

'A single drop of blood will be avenged with a deluge of blood-shed in return.'

রক্তের বদলা রক্ত। রক্তের ঋণ কখনও ব্যর্থ হয় না। তাঁর জীবনই ছিল সংগ্রামে ভরা। সংগ্রামই তাঁর জীবন।

১৩৩৪ সাল, ১২ই জানুয়ারী। স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি শোকদীপ্ত দিন। বাইরে ঘন নিকষকালো অন্ধকাব। নিস্তব্ধ নিঝুম। মৃত্যুব পবোয়ানা হাতে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মাস্টারদা তন্দ্রাচ্ছন্ন। মৃত্যুার জন্য মানুষের স্বাভাবিক চিরন্তন ভয় দুশ্চিন্তাও তাঁব সুস্থ মনেব নিশ্চিন্ত ঘুমকে কেড়ে নিতে পারেনি।

অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী অনুপম বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত চরিত্রেব এই মহামানবকে দেখে তাই বুঝি মুগ্ধ হয়ে ক্যাপ্টেনের অলক্ষ্যে পটিয়া থানার একজন গোয়েন্দা অফিসার বলেছিল—

'Surja Babu, we have many things to learn from you. You are great.'

সহসা কারাকক্ষের গেট খুলে গেল। রাত প্রায় দু'টো। কয়েকজন অফিসার হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে গেল দু'টো কক্ষের দিকে। দু'টিতে দুই বন্দী ঘুমন্ত। একজন মাস্টারদা, অন্যজন তারকেশ্বর দস্তিদার।

হিংস্র পশুর দল সমস্ত শালীনতা ফাঁসির সমস্ত বৈধ নিয়ম-কানুন পায়ের তলায় লুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অন্যান্য কয়েদীরা চীৎকার করে এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ জানালো সমস্ত জেলখানা এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি একের পর এক পড়তে লাগলো। অসহায় দুটি মানুষের উপর নর-পশুবা হিংসার তাণ্ডবে মেতেছে।

দুই বীর দেশপ্রেমিকের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝবতে লাগলো। তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জেলখানার রাজনৈতিক বন্দী ও কয়েদীদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এক অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরতে লাগলো জেলখানার কর্মীরা যারা মাস্টারদাকে

গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতো। নিরুপায় দর্শক হয়ে তাদের এই সকরুণ অপমানজনক দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। লজ্জায় ক্ষোভে ঘৃণায় তারা যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

মুমূর্ষু দুটি দেহকে সশস্ত্র প্রহরীরা টেনে নিয়ে গেল ফাঁসি-মঞ্চে। মধ্যরাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে ফাঁসির ব্যবস্থা। রাজনৈতিক বন্দীরা অস্থির হয়ে উঠলো। মুহূর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও 'মাস্টারদা জিন্দাবাদ'- ধ্বনিতে সমস্ত জেলখানা কেঁপে উঠলো। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'মাস্টারদা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে কয়েদীরা নিস্ফল আক্রোশে গবাদে মাথা ঠুকতে লাগলো।

তাদেব সেই কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য চললো লাঠি-চার্জ কিন্তু আজ তারা দুর্বার মরিয়া। কাব সাধ্য সে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে। পাগলের মত অস্থির হয়ে তারা গবাদ ভেঙ্গে ছুটে বেবিয়ে আসতে চাইছে। বাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে পড়েছে। এই মর্মস্পর্শী নিষ্ঠুরতায় আকাশ-বাতাস সমস্ত নিসর্গ-প্রকৃতিও যেন ভাষাহীন, মৌন। শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতেব লড়াইয়ে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে আমরণ সংগ্রাম বেছে নিয়েছিলেন, সেই দেশ বরেণ্য দেশপ্রাণ সন্তানের এই অন্যায় মৃত্যুদণ্ড এক ঘৃণ্য মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত। বিদেশী শত্রুর এই জঘণ্য চক্রান্তের ক্ষমা নেই।

ফাঁসির মঞ্চের লিভার টেনে দেওয়া হ'লো। জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে গৌরবদীপ্ত হাসির প্রশান্তিতে দুই মহাবীর মৃত্যু-কূপে ঝুলে পড়লেন। তারকেশ্বর অমর রহো! মাস্টারদা জিন্দাবাদ! শোকার্ত হৃদয়ের অসংখ্য ধ্বনি-চীৎকারে জেলের অভ্যন্তর যেন ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়তে লাগলো। 'বন্দেমাবতম্' 'মাস্টারদা জিন্দাবাদ'— সেলে সেলে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনি ওঠে। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি, অদূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্তব্ধশাখা-প্রশাখায় ধ্বনিতে-প্রতিধ্বণিত হয়ে ওঠে কয়েক শত বন্দীর তূর্য্য-নিনাদে।

মৃত্যুর শীতল স্পর্শ তাঁর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। সার্থক জনম তাঁর, সার্থক মরণ। সূর্য্য অস্ত গেল কিন্তু তাঁর গভীর নিষ্ঠাও অপরিসীম আত্মত্যাগের অমর জ্যোতিঃ চির-ভাস্বর, অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যু হ'তে পারেনা—তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, অমব শহীদ!

'Freedom is not given, it is taken.
Freedom never could be a gift,
because every gift carries its
obligations, its ties.........'

ফাঁসির দু'দিন পর মাস্টারদার সহোদর শ্রীযুক্ত কমল সেন মহাশয় জানতে পারেন, তাঁর ভারত-খ্যাত বিপ্লবী বড় ভাইয়ের ফাঁসি হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত কমল সেন চট্টগ্রাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁর দাদার মৃতদেহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চাইলে তাঁকে বলা হয় যে, ১২ই জানুয়ারী তাঁর দাদার ফাঁসি হয়ে গেছে।

মৃতদেহ সৎকার করা হয়নি। কিন্তু তাঁর পুণ্য মরদেহকে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ পশুর দল কি করেছে আজও তা' সঠিক জানা

যায়নি। অনুমানে কেউ কেউ বলেন, মাস্টারদার মরদেহ ভারী পাথর বেঁধে কর্ণফুলী নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কারও বা মতে তাঁর দেহ শাসকবর্গের জিঘাংসাকে আরও নগণ্যভাবে চরিতার্থ করবার জন্য জন্তু জানোয়ার দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে।

মাস্টারদার ফাঁসির দিনটিতে বর্বর শাসকবর্গের এতই আনন্দ হয় যে, শাসন-যন্ত্রের প্রতিটি বড় বড় অফিসার এই নারকীয় মহোৎসবে হাজির ছিল।

বজ্রাহতের মত শুনলো চট্টগ্রামবাসী মাস্টারদার ফাঁসির সংবাদ। শোকের কালো ছায়া নেমে এলো ঘরে ঘরে। সেদিনের তাদের সেই বিক্ষুব্ধ মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রতিটি মানুষের চোখে ঝরতে লাগল এক অস্ফুট অসহনীয় বেদনার অশ্রুজল।

দুনিয়ায় সভ্য ও ভদ্র বলে যারা গর্ব করে নিজেদের পরিচয় দেয়, সেই ইংরেজ সরকার মাস্টারদার মৃত্যু-সংবাদটি তাঁর নিকট আত্মীয়ের নিকট পৌঁছে দেবার মানবিক কর্তব্য বোধটুকু পর্য্যন্ত বিস্মৃত হ'লো। এই দেশপ্রেমিক বিপ্লবীনেতার সমাধিস্থল একদিন সারা দেশের মানুষের কাছে এক পরম শ্রদ্ধা ও গৌরবের পীঠস্থান হিসাবে প্রতিভাত হয়, এই আশঙ্কায় মৃতদেহ লুকিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়।

আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি। তাই যদি তখনকার দিনের সরকারী দলিলাদি পরীক্ষা করা হয়, তা'হলে এই দেশপ্রেমিক নেতার দেহ সংকারের স্থান অনুসন্ধান করে বের করা যায় এবং সেই স্থানে উপযুক্ত স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করে জাতীয় দায়িত্ব পালন আমরা করতে পারি।

ফাঁসির পূর্বদিন মাস্টারদা জেলের অন্য ওয়ার্ডে তাঁর সাথীদের কাছে গোপনে এক বাণী পাঠান। তাঁর সেই মহা মূল্যবান অন্তিম বাণীটি বঙ্গানুবাদ-সহ এখানে উদ্ধৃত করছি:

Ideal and Unity is my farewell message. Rope

is hanging over my head. Death is knocking at my door. My mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana', this is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all ! My dear brothers and sisters, break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what is my dream, a golden dream—a dream of free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it ! Throughout my life most passionately and untiringly, I have pursued it like a lunatic. I know not how far I proceeded towards the fulfilment of my dream. I know not where I am compelled to stop my pursuit to-day. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day. Onwards my comrades, onward—never fall back. The day of bondage is disappearing and the dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you !

Never forget the 18th of April 1930, the day of Easter Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jallalabad, Julda, Chandannagar and Dhalghat. Write in red letters

in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the alter of India's freedom.

My earnest appeal to you—there should be no division in our organisation. My blessings to you all, inside and outside the jail. Fare you well.

Chittagong Jail,
11th Jan, 1934.
at 7 P. M.

Long live Revolution!
Bandemataram!

[বঙ্গানুবাদ]

আদর্শ এবং ঐক্য আমার বিদায় বাণী। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর দোদুল্যমান। মৃত্যু আমার দুয়ারে করাঘাত করছে। মন আমার ছুটে চলেছে অসীমের দিকে। এইতো 'সাধনার' উপযুক্ত সময়, মৃত্যুকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করার প্রস্তুতির এইতো সময় এবং হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনের এইতো সময়।

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি—বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের এক ঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙ্গে দাও, তোমরা আমাকে উৎসাহ দান করো। এই আনন্দ ঘন গম্ভীর পবিত্র মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে যাবো? শুধু একটি জিনিস, তা' হ'লো আমার স্বপ্ন, একটি সোণালী স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কি পবিত্র ছিল সেই মুহূর্তটি, যেদিন আমি প্রথম তা' দেখেছিলাম। আজীবন গভীর মমতায় ও ক্লান্তিহীন ক্ষ্যাপামি নিয়ে সেই স্বপ্নকে বুকের উত্তাপে লালন পালন করেছি। আমি জানিনা সেই স্বপ্নের পরিপূর্ণতার দিকে কতদূর অগ্রসর হয়েছি। জানিনা আমি, আজ কোথায় তাকে আমায় থামিয়ে দিতে হচ্ছে। অভীষ্টলাভের পূর্বে যদি মৃত্যুর হিম-শীতল কর তোমাকে স্পর্শ করে

তবে তোমার সেই দায়িত্বভার তোমার অনুগামীদের হাতে তুলে দিও যেমন আজ আমি তোমাদের দিচ্ছি। প্রিয় সাথী বন্ধুরা, এগিয়ে যাও, এগিয়ে চলো—কখনো পিছিয়ে যেওনা। দাসত্বের দিন শেষ হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতার নবারুণ উদ্ভাসিত। জাগো, কর্মের সাধনা কর। কখনও হতাশ হয়ো না। সাফল্য সুনিশ্চিত। ভগবান তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল—চট্টগ্রাম ইষ্টার-বিদ্রোহের এই দিনটির কথা কখনও ভুলো না। স্মৃতি-বাসরে চির অম্লান করে রেখো জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর ও ধলঘাটের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীনতার মৃত্যু-যজ্ঞের বেদীমূলে যে সব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম স্মরণের মন্দিরে রক্তের অক্ষরে লিখে রাখো।

আমার একান্ত আবেদন তোমাদের কাছে—আমাদের সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে। যারা-তোমরা কারাগারের ভিতর ও বাইরে রয়েছো তাদের সকলকে আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানাই। বিদায় বন্ধু, বিদায়।

চট্টগ্রাম জেল, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।
১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ বন্দেমাতরম্!
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা।

জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি শুধু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। পরাধীন দেশ জননীর পায়ের শৃঙ্খল মোচনের জন্য আজীবন বিপ্লবের সাধনা করে গেছেন। মৃত্যুর উপর দাঁড়িয়ে কর্মের সাধনা। তাঁর স্বপ্ন, ধ্যান, জ্ঞান ও ধারণা শুধু দু'টি শব্দের জন্য—স্বাধীন ভারত। আমাদের ভারত।

তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন একটি ভাঁওতা মাত্র—তা' মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বেরই প্রতীক।

সুতরাং এই বিদেশী শত্রুর সঙ্গে কোন আপোষ নয়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তাই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার জন্য কংগ্রেসের আপোষকামী মনোভাবের পথ ত্যাগ করে তাই শসস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

পথ তিনি ভুল করেননি। বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা তিনি বিশ্বাস করতেন না—যেমন বিশ্বাস করতেন না আমাদের নেতাজী। অস্ত্রের আঘাতে তিনি সাম্রাজ্যবাদী উন্মত্ত জিঘাংসুদের ক্ষমতা চূর্ণ করে দিয়েছিলেন, টেনে নামিয়ে এনেছিলেন ইউনিয়ন জ্যাক্। উড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকারের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। চট্টগ্রামের সেই মুক্তি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাঁর সেই ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের মধ্যে মুক্তির এক দুর্বার প্রেরণা বয়ে এনে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, মাস্টারদার দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ চিন্তা, নিষ্ঠা, অদম্য সাহস ও সংগঠন প্রতিভা সেই অমানিশার যুগে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তির ঈপ্সিত স্বাদ এনে দিয়েছিল জাতির জীবনে। মুক্তি সংগ্রামের আকাশে চিরভাস্বর নক্ষত্র তিনি।

মহানায়ক সূর্য্যসেন ছিলেন যুগ-প্রতিনিধি—জনগনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামের দৃষ্টান্ত দেশের যুবশক্তিকে আত্মপ্রত্যয় ও মৃত্যু-ভয়হীন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তাঁর চরিত্র ছিল বজ্রের মতন দৃঢ় আবার কুসুমের মত কোমল। এই পরস্পর বিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষের হৃদয়কে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতো। অসাধারণ রাজনৈতিক নেতা তিনি। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। যেমন দেখেছি তাঁর মধ্যে অদম্য সাহস, সংকল্পে অবিচল নিষ্ঠা, বিপ্লবী কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, তেমনি স্বল্পভাষী

নির্বিরোধ এই শান্তস্বভাবের মানুষটির ছিল সহযোদ্ধাদের জন্য গভীর স্নেহপ্রীতি—ভালবাসা ও মমত্ববোধ।

মুক্তি-যজ্ঞের বিশুদ্ধ পূজারী এই মহামানব পরাধীন ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও মর্মবেদনা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই জীবনের সর্বস্বত্যাগ করে ভারত-মাতার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য আত্মভোলা হয়ে ছুটে এসেছিলেন। দেশ জননীর এতবড় সাধক ছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন দীপ্তকণ্ঠে—'My dream, a golden dream—a dream of Free India Throughout my life most passionately and untiringly. I have pursued like a lunatic.'

বিপ্লবী মণিদত্তকে তাঁর নিজের মৃত্যু কিভাবে হওয়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে গভীব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন—'আত্মহত্যা, আত্মসমর্পণ নয় honging with bold statement Escape করার সম্ভাবনা থাকলে নিশ্চয় গুলী ছুঁড়ে পথ করে নেওয়ার চেষ্টা করবো। সামনা সামনি গুলী—বিনিময়ে আমাকে হত্যার সুযোগ আমি দেব না। এইভাবে বৃটিশের বেতনভুক্ পুলিশের হাতে গুলী খেয়ে মরার চেয়ে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জয়গান করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এতে যদিও সহ্য করতে হয় শারীরিক ও মানসিক তীব্র নিপীড়ন, তবু যাওয়ার আগে শুনিয়ে যাওয়া যায় বিপ্লবের মর্মবাণী, ছড়িয়ে দেওয়া যায় অন্তরের আগুন, দেশের লোকেরা পায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা আর শাসকদের হয় রাজ্য হারাবার ভয়ে মানসিক যন্ত্রণা।'

'খণ্ড যুদ্ধে মত্ত হওয়ার চেয়ে কোর্টে Bold Statement দিয়ে ফাঁসি বরণ করে নেওয়াই আমার কাম্য। এতে অনেক উদ্দেশ্য সাধন হ'বে। ইংরেজের যে বিচারালয়ে এরা বিচারের

প্রহসন করে থাকে, সেই বিচারালয়কে ব্যবহার করা হ'বে। বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ প্রচারের স্থান হিসাবে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গেলে বিচারের প্রহসন শুরু হয়। তা'তে সেই সুযোগ মেলে না। মৃত্যুর আগে আর একটা আঘাত করে যাওয়াই সংগ্রামীদের কর্তব্য। এই আঘাত ওদের সহ্য করতে হ'বে অথচ প্রত্যাঘাত করার সুযোগ থাকবে না। এর ফল হয় সুদূর প্রসারী ফাঁসির মঞ্চের যাত্রী একজন বিপ্লবী বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে দেশবাসীর কাছে ও বিদেশী শাসকদের মুখের উপর বলে য়েতে পারে, আমরা কি করতে চেয়েছিলাম ও কেন করতে চেয়েছিলাম।'

মাস্টারদা হেসে বলেছিলেন—'ফাঁসিতে তো ওরা ঝুলাবেই, তবে এই উপরি পাওনাটা ছাড়ব কেন?'

শেষের এই উক্তিটির মধ্যে তাঁর—কৌতুক প্রিয় মনটি ধরা পড়ে। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন কৌতুক পছন্দ করতেন এবং নিজে নানা কৌতুককর ঘটনা ও গল্প দিয়ে সহযোদ্ধাদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে দিতেন। সংযত আদর্শবাদী দার্শনিক বিপ্লবী এই অমল চরিত্রের মানুষটির আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার।

চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় এবং ভীরুতার অপবাদগ্রস্ত বাঙালীর জাতীয় জীবনে সাহস ও শৌর্য্যের এক অমূল্য নিদর্শন।

ক্ষুদ্র কোন একটি জেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান যে সারা ভারতবর্ষের বিপ্লব নিয়ে আসবে, একথা মাস্টারদা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন, ক্ষুদ্র একটি দীপশিখা যেমন অনেক দূর পর্য্যন্ত অন্ধকার দূর করতে পারে, তেমনিই বিপ্লবের একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তার ফল হ'বে সুদূর প্রসারী।

প্রকৃত পক্ষে, বিদ্রোহীদের বৃটিশ সিংহের ক্ষমতাকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করার সাহস ভারতবাসীর প্রাণে নূতন

শক্তির অভয়মন্ত্র দান করেছিল। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী পর্য্যায়ে জনতার বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলোতে।

চির বিদ্রোহী সূর্য্য সেনের স্বল্পজীবনের ইতিহাসে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিই বড়। আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ প্রীতিতে ঘেরা জীবন উপভোগের তৃষ্ণা, গৃহের প্রতি আকর্ষণ, কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছুই ছিল না। ব্যক্তিকে তিনি বৃহতের মধ্যে বিশালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আর সেইখানেই তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের সার্থকতা। তাই তাঁর জীবনালোচনা করতে গেলে চট্টগ্রামের তথা সমগ্র বাংলাদেশের অগ্নিযুগের পর্য্যালোচনা এসে পড়ে। তাঁর কর্ম-জীবনের অলৌকিক কাহিনী নূতন করে বর্ণনা করার কোন অবকাশ নেই চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিটি ঘটনার ও কৃতিত্বের মধ্যেই তাঁর জীবনের জীবন্ত সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মাস্টারদার কর্ম-জীবনের কাহিনী এক ও অভিন্ন। মাস্টারদাকে বুঝতে হোলে জানতে হোলে আমাদের চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাসের প্রতিটি পাতা ওলটাতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর জীবনকে টেনে আনা যাবে না।

তিনি মহান্ নেতা কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের প্রকাশ দেখা যায়নি কোনদিন কোন বক্তৃতা বা জন সমাবেশের কোন ভাষণের মধ্যে। প্রচারিত কোন রচনায় আমরা তাঁর স্বদেশপ্রেমের বা কর্মনীতির প্রকাশ দেখিনি। নেপথ্যে তাঁর কর্মপ্রস্তুতি। শুধুমাত্র কর্মীদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অদৃশ্য ফল্গুধারার মত নীরব সঞ্চারী ভাব প্রেরণা, যা' তখনকার দিনের তরুণ-তরুণীদের বার বার ঘর-ছাড়া করেছে, দেশমাতার মুক্তিযজ্ঞে মৃত্যুর মুখে আত্মহুতি দিতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

এই স্বল্পভাষী খর্বকায় অতি-সাধারণ মৃদু চরিত্রের মানুষটিকে দেখে কখনও মনে হয় না যে, এঁরই মধ্যে বিপ্লবের বজ্রানল চিরদীপ্যমান। অনেক সময় সাধারণের ভীড়ে মিশে থাকলে তাঁকে বিশেষ বা বিশিষ্ট বলে কেউ মনে করতে পারতো না। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এই অতি-সাধারণ বহিঃ-প্রকাশ অনেকবারই তাঁকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কতবার গোপন ঘাঁটি আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তিনি কোমরে কাস্তে-গোঁজা, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, ময়লা গামছা কাঁধে-ফেলা চাষীর বেশে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সাম্পানে (ছুই দেওয়া নৌকা) কর্ণফুলী পার হ'বেন। মাঝি বিপ্লবীদলের সমর্থক। হঠাৎ দেখা গেল পিছন পিছন পুলিশের মোটর লঞ্চ ছুটে আসছে। মুহূর্তেই দেখা যায়, মাঝি সাম্পানের আরোহীতে পরিবর্তিত হয়েছে, আর আরোহী নিপুণ হাতে সাম্পান চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

লুঙ্গি পরিহিত কোমরে চওড়া বর্মী-কোর্ট, বিড়ি দেশালাই গোঁজা। কে বলবে ইনিই মহানায়ক সূর্য্যসেন?

পুলিশ চ্যালেঞ্জ করে।

মাঝি সূর্য্য সেনের নাম শুনেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে।

পুলিশ হতাশ হয়ে শেষে চলে যায়।

আশ্রয়স্থল ঘেরাও হয়েছে, কিন্তু যার জন্য এত চেষ্টা, তিনি ময়লা গামছা পরে ঘাস কিংবা বিচালির বোঝা মাথায় নিয়ে হয়তো তার মধ্যে মূল্যবান কাগজপত্র (বা রিভলবারও) আছে, বাড়ীর চাকরের বেশে বেরিয়ে গেলেন। পুলিশ ধারণাও করতে পারে না এত সাধারণ ছদ্মবেশে তিনি আত্মগোপন করে যেতে পারেন।

এক বিধবা ভদ্র মহিলার বাড়ীতে—বিপ্লবীদের ঘাঁটি ছিল। একদিন গভীর রাত্রে মাস্টারদা কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে বেরোচ্ছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে পথে পুলিশের সামনে পড়ে গেলেন। কি করা যায়? মুখ কাচুমাচু করে এমন ভাব দেখালেন যেন ঐ বিধবাটি চরিত্রহীনা এবং তাঁরা মন্দ অভিপ্রায়ে তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন, পুলিশ কয়েকটা চড় চাপড় মেরে পাড়ায় মেয়েদের বাড়ীতে বদ উদ্দেশ্যে না যাওয়ার জন্য সাবধান করে ছেড়ে দিল।

তখন জীবিত অথবা মৃত সূর্য্য সেনের মাথার জন্য দশহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত আছে।

স্বৈরাচারের মুখের ওপর বিপ্লবী-কৌশলের কি পরিহাস!

অতবড় বিপ্লবী নেতা, না জানি কত তেজস্বী, বলশালী তিনি! তিনি কি সাধারণ লোক! শক্তিধর যিনি তাঁর দৈহিক গঠন-কল্পনা ও সেইভাবে করে নিত। এই জন্যই পুলিশ বার বার ঠকতে।

আসলে সমস্ত শক্তির উৎস ছিল তাঁর ইস্পাতদৃঢ় আবার কুসুম-কোমল স্পর্শকাতর মন। একথা বুঝবার মত ক্ষমতা আর যারই থাক, বৃটিশ আমলাতন্ত্রের ছিল না।

যাঁর অঙ্গুলি হেলনে দলে দলে তরুণ-তরুণী হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁকেই আবার দেখা যেতো প্রতিটি অভিযানে (action) শত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি কর্মীদের সাথে দেখা করে আশীর্ব্বাদ করতেন; যারা ফিরতো না, তাদের জন্য পুত্রশোকাতুরা জননীর মত তিনি বেদনানুভব করতেন। দলের কর্মীদের তিনি মায়ের স্নেহ, পিতার শাসন ও সেনানীর নির্দেশ দিয়ে পালন করতেন। এইখানেই মাস্টারদার বিশেষত্ব, চারিত্রিক স্বতন্ত্রতা।

দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, যখনই ধরা পড়ে নির্যাতিত হ'বে, তারা যেন সব কিছুর জন্যই সূর্য্য সেনকে দায়ী করে এজাহার দেয়। দেশের অন্য অনেক নেতাদের সঙ্গে এখানেই তাঁর বিশেষ পার্থক্য।

দেশের প্রতি ধূলিকণার জন্য ছিল তাঁর অসীম মমতা আর অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীর জন্য ছিল তাঁর সেই পরিমাণে ঘৃণা। তাঁর মনের দুটি কোণে কোমলতা ও দৃঢ়তা উদ্ভাসিত।

বিনিময়ে দেশ তাঁকে কি দিয়েছে? যিনি দেশের আপামর জনসাধারণকে নিজের সমস্ত জীবন, মননশক্তি দান করেছিলেন, সে দেশ তাঁকে কি দিয়েছে?

দেশ তাঁকে দিয়েছে তার যৌবন, তার যুবশক্তি আর দেশবাসীরা দিয়েছে—তাজা রক্ত।

তাঁর শেষ দিনগুলো ভরে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গীতার অধ্যায় বিশেষের অনুচ্চ আবৃত্তিতে। রামায়ণ ছাড়া কোন বই-ই তাঁকে পড়তে দেওয়া হয়নি। কিন্তু রামায়ণ কি কম? রামায়ণ ভারতবর্ষের আত্মাস্বরূপ। হয়তো রামায়ণের সত্য ও ত্যাগের বাণী তাঁর নিজের জীবনের অর্থ এবং মৃত্যুর পরিণতিকে সহজ করে দিয়েছিল।

একটি মহান্ মানবাত্মার সকরুণভাবে মহাপ্রস্থান—অগ্নিযুগের একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মহামরণ!

"অন্যায় করার চাইতে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরও গুরুতর অপরাধ।...... ভুলে যেওনা যে, অন্যায় এবং দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো, জীবনকে পরিপুর্ণভাবে পেতে হ'লে জীবনের বিনিময়েই তা' পেতে হ'বে। মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম।"

—এই মর্মবাণী মাস্টারদার সংগ্রামী জীবনে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত। অন্যায় এবং ঔদ্ধত্যকে তিনি মুখ বুজে সহ্য করেননি—সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে বার বার রুখে দাঁড়িয়েছেন। শাসকের বিরুদ্ধে তাই বার বার তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল গর্জে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে মুক্তি পথের অগ্রদূত এই মহাবিপ্লবী জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। শুধু স্বাধীন নয়, স্বাধীনতার শৈশব এবং কৈশোরও অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে।

শত শহীদের রক্তে-রাঙা বেদীর উপর আমরা স্বাধীনতার ত্রিরঙা পতাকা ওড়াচ্ছি। আমরা সেই সব শহীদের উত্তর পুরুষেরা—যাদের শরীর থেকে এখনও রক্তের দাগ মুছে যায়নি তারা কি একবারও ভেবেছি দেশের, মুক্তি সম্পর্কে, দেশের মানুষের আর্থিক এবং আত্মিক বন্ধন মোচন সম্পর্কে তাঁদের উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত স্বপ্ন এতটুকুও সফল হয়েছে কি না? তাঁরা তো শোষণমুক্ত বঞ্চনাহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন কি আজও পূর্ণ হয়েছে?

অক্টোপাসের মত শোষণের অত্যাচারের নাগপাশ সমগ্র সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে মোচড় দিচ্ছে আজও। সর্বগ্রাসী বঞ্চনা জন জীবনকে দুঃসহ নরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তো আজও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনকুবের হাতে বন্দী এই স্বাধীনতার জন্যই কি যুগ যুগ ধরে দেশের মুক্তিকামী শহীদেরা তাঁদের রক্ত ঢেলেছিলেন? এই স্বাধীনতার জন্যই কি তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছিলেন?

একবারও কি আমাদের মনে হয় আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা—বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রনাথ, সুরেন ব্যানার্জি, ভকৎ সিং, সূর্য্য সেন, সুভাষ বসু, ক্ষুদিরাম এবং আরও অনেক দেশপ্রেমিকের স্বপ্নের কাছাকাছি যেতে পেরেছি কি না? আমরা ক্ষমতার এবং স্বার্থের কাঙালী ভোজে মশগুল।

কিন্তু গণচেতনার সুপ্তসিংহ জেগে উঠলে কোন নেশা-ই তাকে ঘুম পাড়াতে পারবে না। আজদেশে সেই চেতনার চিহ্ন পরিস্ফুট আজ আবার ইতিহাসেই শিক্ষা গ্রহণের দিন এসেছে। এই দিনে আবার সূর্য্য সেনের মত বীর শহীদদের কাহিনী জাতীয় জীবনে বিশেষ ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসবে।

সূর্য্য সেন নেই। কিন্তু তাঁর অ-মৃত আত্মা, যা' ভারতবর্ষের শাশ্বত বিদ্রোহের আদর্শের মধ্যে অবিনশ্বর। সে আত্মার বিনাশ

নেই। ভারতবর্ষের গণ-মানসে আজও সে আত্মা চির বিরাজমান, চির দীপ্যমান।

হে অগ্নি-ঋষি সর্বত্যাগী রুদ্রসন্ন্যাসী! রাজ-বিদ্রোহী হে বীর মহাসৈনিক !! তোমায় প্রণাম !!!

'যাঁহার অমর স্থান প্রেমের
আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয়,
মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটি থেকে
নিল যাঁরে হরি
দেশের হৃদয় তাঁরে
রাখিয়াছে বরি।'

জালালাবাদের স্মরণীয় ও সফল সংগ্রামে যে সকল বিপ্লবীযোদ্ধা ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারী সৈন্যকে সম্মুখযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে, তাদের নামের পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

নাম	বয়স	জন্মস্থান
১) সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন	৩৫	নোয়াপাড়া, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।
২) নির্মল সেন	৩৩	কোয়েপাড়া, প্রধান তিনজন নেতার অন্যতম।
৩) অম্বিকা চক্রবর্তী	৩৩	দেওয়ানপুর, রাউজান থানা, বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এক মোটর দুর্ঘ-নায় মারা যান।
৪) গণেশ ঘোষ	২৫	যশোহর পৈতৃক বাড়ী। কিন্তু চট্টগ্রামে বড় হয়েছেন। পিতা প্রথমে রেলে চাকুরী করতেন। ১৯২২ এর এ, বি, আর এর ধর্মঘটে যোগ দেন। পরে সদর ঘাটে "স্বদেশী বস্ত্রালয়" নামে কাপড়ের দোকান খোলেন। ঐ বাড়ী-তেই পুলিশ পরে "সাবলিজেশন্" লিষ্ট পায়। তিনি মোট ২৭বৎসর জেল খেটে ছিলেন। পঃ বঃ বিধান সভার তিনবার ও ভারতীয় পার্লামেন্টের একবার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।
৫) অনন্ত সিংহ	২৪	কয়েক পুরুষ আগে উত্তর ভারত থেকে তাঁদের পরিবার চট্টগ্রামে আসেন এবং

নাম	বয়স	জন্মস্থান
		এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। শহরে বাসা ছিল তামা-কুমণ্ডীতে। বর্তমানে তাঁর পিতার নামে ঐ গলির নাম 'গোলাপ সিংহ লেন।' আন্দামানে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগের পর ১৯৪৬ সালে মুক্তিলাভ করেন। তিনি অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (১ম/২য় খণ্ড) এবং 'মহানায়ক সূর্য্য সেন' পুস্তকগুলি রচনা করেন।
৬) লোকনাথ বল	২৩	ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম। কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার হয়েছিলেন।
৭) লাল মোহন সেন	২১	সন্দ্বীপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১৯৪৬ এ নিহত।
৮) অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার	১৯	ধলঘাট, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
৯) হিমাংশু সেন	১৫	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, শহরে চন্দনপুরায় থাকতেন।
১০) উপেন ভট্টাচার্য্য	৩৫	বেতাগী, রাঙ্গুনীয়া থানা, চট্টগ্রাম।
১১) মধু দত্ত	২৬	বিদগ্রাম, বোয়াল থানা, চট্টগ্রাম।
১২) নরেশ রায়	২০	ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র।
১৩) বিধু ভট্টাচার্য্য	২০	ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র।
১৪) হেমেন্দু দস্তিদার	১৫	ধলঘাট পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

নাম	বয়স	জন্মস্থান
১৫) শৈলেশ্বর চক্রবর্তী	২০	কোয়েপাড়া, কক্সবাজারে আইনজীবী পিতার কাছে থাকতেন।
১৬) নির্মল লালা	১৪	সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী, বাড়ী হাওলা (বোয়াল খালি থানা) আত্মীয়ের সঙ্গে কক্সবাজার থাকতো এবং সেই সময় ঐখানে সপ্তম শ্রেণীতে পড়তো। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সে খুব বেশী জোর করায় এত ছোট হওয়া সত্বেও সূর্য্যসেন তাকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেন।
১৭) দেব প্রসাদ গুপ্ত	১৮	প্যারেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নেতা রাজেশ্বর গুপ্তের পৌত্র। বর্তমান যে ব্রাহ্মণমন্দিরটি আছে তার পিছনে টিলার উপরে তাদের সুন্দর বাড়ী। এরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসে এবং দেবপ্রসাদের পিতার জন্ম চট্টগ্রামেই।
১৮) আনন্দ গুপ্ত	১৬	দেবপ্রসাদের ছোট সহোদর ভাই, চন্দন নগরে গুলী বিদ্ধ হয়ে ধৃত হন। আন্দামানে কারাদণ্ড ভোগের পর ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। ১৯৪৮ সালে 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহ' এবং 'মাস্টারদা' নামে দু'খানা পুস্তক রচনা করেন।
১৯) মনীন্দ্র গুহ	২০	ভাটিয়াইন, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

নাম	বয়স	জন্মস্থান
২০) সহায় রামদাস	১৭	রাণাঘাট, রহমতগঞ্জে কাকা কো-অপারেটিভ্ রেজিষ্টারের বাসায় থাকতো।
২১) প্রভাস বল	১৮	ধোরলা, বোয়ালখালি থানা।
২২) ফণীন্দ্র নন্দী	১৭	দক্ষিণ-ভূর্ষী, পটিয়া থানা।
২৩) রজত সেন	১৬	কোয়েপাড়া, চট্টগ্রাম।
২৪) ত্রিপুরা সেন	১৬	ঢাকা, চট্টগ্রামে পিতা চাকুরী করতেন।
২৫) দ্বিজেন্দ্র দস্তিদার	১৮	পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা, চট্টগ্রাম।
২৬) বিধু সেন	১৯	পৈতৃক বাড়ী শাকপুরা, জন্ম ও কর্মস্থল কক্সবাজার। বহুবার জেল খাটেন। হিজলী ও দেওলী জেলে আটক থাকার পর ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করেন।
২৭) মনোরঞ্জন সেন		
২৮) কালীপদ চক্রবর্তী	১৯	সারোয়াতলী, বোয়ালখালি থানা। মোট ২৮ বৎসব কারাদণ্ড ভোগ করেন। বর্তমানে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে আছেন।
২৯) শশাঙ্ক দত্ত	১৮	পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।
৩০) নারায়ণ সেন	১৮	ঢাকা, পিতার সঙ্গে দেওয়ানবাজার যোগেশবাবুর পুকুর পাড়ে (বর্তমানে নন্দীলেন) থাকত। অস্ত্রগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে পলাতক, পুরস্কার ঘোষণা, ধরা পড়ে নাই এবং সেই সময়ের কিছু

নাম	বয়স	জন্মস্থান
		পর থেকে অন্য নাম গ্রহণ করে স্কুলে শিক্ষকতা করছিল বলে জানা যায়।
৩১) স্বদেশ রায়	২০	ঢাকা বা ত্রিপুরা। পল্টনের (সার্কিট হাউস যেখানে আছে) দক্ষিণে বড় রাস্তার পাশে তার চাকুরে আত্মীয়ের সঙ্গে থাকত। ১৯২৫ ইং চট্টগ্রাম কলেজিয়েট্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়ছিল।
৩২) সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী	২০	দুর্গাপুর, নীরেশ্বরী থানা।
৩৩) সুকুমার ভৌমিক	২০	নীরেশ্বরী থানা।
৩৪) সুরেশ দেব	১৭	ঢাকা বক্সীহাটে মুদীর দোকানে পিতার সঙ্গে থাকতো।
৩৫) সুবোধ চৌধুরী	১৮	পৈতৃক বাড়ী বর্দ্ধমান। চট্টগ্রামে চাকুরে পিতার সঙ্গে থাকতো।
৩৬) অমরেন্দ্র নন্দী	১৭	দক্ষিণভূর্ষী, পটিয়া থানা।
৩৭) বিনোদ চৌধুরী	১৯	উত্তরভূর্ষী, বোয়ালখালী থানা। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে আছেন।
৩৮) মহেন্দ্র চৌধুরী	১৯	মোহরা, পাঁচালাইশ থানা।
৩৯) নিতাই ঘোষ	১৭	পৈতৃক বাড়ী যশোহর, রেলের চাকুরে পিতার সঙ্গে পাহাড়তলী রেল কোয়া-

নাম	বয়স	জন্মস্থান
		টার্স থেকে পড়তো।
৪০) সুধাংশু বোস	১৭	পরৈকোড়া, শহরেরই চট্টগ্রামের সর্ব-প্রথম প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা "বোস বাদ্রার্স" এর অন্যতম মালিকের পুত্র। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ব্রহ্মদেশে পলা-তক থেকে নিজ বাড়িতে আসার পর পুলিশ গ্রেপ্তার করে কিন্তু পরে বিনা-সর্তে মুক্তি পায়।
৪১) মতি কানুনগো	১৯	শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা।
৪২) জিতেন দাসগুপ্ত	২০	গৈরলা, পটিয়া থানা।
৪৩) পুলিন ঘোষ	১৯	গোসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা।
৪৪) রণবীর দাশগুপ্ত	১৬	পরৈকোড়া, শহরেই প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত জয়ন্ত কবিরাজের বাসা আন্দর কিল্লায় থেকে পড়ত।
৪৫) দীপ্তি মেধা চৌধুরী	১৮	শাকপুরা, বোয়ালখালী থানা।
৪৬) বিনোদ দত্ত	১৮	মঠপাড়া, পটিয়া থানা, ১০ বৎসর আত্মগোপন করে থাকার পর ১৯৪০ সালে ধৃত হয়ে ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।
৪৭) হরিপদ মহাজন	১৭	বীনাজুরি, রাউজান থানা।
৪৮) সুবোধ রায়	১৭	নোয়াপাড়া।
৪৯) বনবিহারী দত্ত	১৮	খরন্দ্বীপ, বোয়ালখালী থানা।

নাম	বয়স	জন্মস্থান
৫০) ফকির সেন	১৭	ফতেয়াবাদ, হাটাজারী থানা।
৫১) শান্তি নাগ	১৬	ত্রিপুরা জেলা, বক্সীহাটে পিতার মুদী দোকানে থেকে পড়তো।
৫২) সরোজ গুহ	১৯	শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা।
৫৩) ভবতোষ ভট্টাচার্য্য	১৮	আনোয়ারা, সদর ঘাট কালী বাড়ীর সেবায়েতের পুত্র, ঐখানে থেকে পড়তো
৫৪) হরি গোপাল বল (টেগরা)	১৬	ধোরলা, বোয়ালখালী থানা।
৫৫) কালী কিঙ্কর দে	২০	গোসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা।
৫৬) ক্ষীরোদ ব্যানার্জ্জী	১৭	ঢাকা, পাহাড়তলী রেলওয়ে কোয়া-টার্সে থেকে পড়তো।
৫৭) সীতারাম বিশ্বাস	১৮	সারোয়াতলী, বোয়ালখালী থানা। (তারিণী মুখার্জ্জি হত্যামামলায় যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়, ১৯৩১ এ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে—তার ছোট ভাই)।
৫৮) বীরেন দে	১৭	গুয়াতলী, পটিয়া থানা।
৫৯) অশ্বিনী রায়	১৮	কানুনগোপাড়া, বোয়ালখালী থানা।
৬০) নিরঞ্জন রায়	২০	পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা।
৬১) শঙ্কর	১৬	দুর্গাপুর, নীরেশ্বরী থানা।
৬২) ননী দেব	১৮	ত্রিপুরা, চট্টগ্রামে বক্সীহাটে পরিবারের দোকানে থাকতো।
৬৩) কৃষ্ণ চৌধুরী	১৭	কেলীশহর, পটিয়া থানা।

পুরস্কার ঘোষণা

পুলিশ-বিভাগ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৬ই মে, ১৯৩০ সালে যে সকল বিপ্লবীযোদ্ধার সন্ধান লাভের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের নাম ও নির্দ্ধারিত পুরস্কারের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হ'লো :

নাম	পুরস্কারের পরিমাণ
১) সূর্য সেন	প্রথমে ৫,০০০৲ পরে ১০,০০০৲
২) অনন্ত লাল সিংহ	৫,০০০৲
৩) নির্মল সেন	৫,০০০৲
৪) গণেশ ঘোষ	৫,০০০৲
৫) অম্বিকা চক্রবর্তী	৫,০০০৲
৬) লোকনাথ বল	৫,০০০৲
৭) জীবন লাল ঘোষাল	৫০০৲
৮) আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত	৫০০৲
৯) বীরেন্দ্র চন্দ্র দে	৫০০৲
১০) হরিপদ মহাজন	৫০০৲
১১) বিনোদ দত্ত	৫০০৲
১২) গোপাল বিশ্বাস	৫০০৲
১৩) তারকেশ্বর দস্তিদার	৫০০৲
১৪) ভবতোষ ভট্টাচার্য্য	৫০০৲
১৫) সরোজ গুহ	৫০০৲
১৬) অর্দ্ধেন্দু শেখর দত্ত	৫০০৲
১৭) সুধাংশু বোস	২৫০৲
১৮) নারায়ণ সেন	২৫০৲

॥ অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥

From

Surja Kumar Sen,
Condemned Prisoner
Chittagong Jail.
8. 8. 33.

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার ২৮।৭ তারিখের চিঠি গত ৫ই আগষ্ট পেয়েছি। চিঠির ঠিকানায় c/o Assistant Superintendent of Police লিখেছিলেন। Assistant Superintendent of Police-এর জায়গায় Additional Superintendent of Police হবে। যাক্।

দাদা, আপনার চিঠি পড়ে বুঝলাম কত গভীর, কত মর্ম্মান্তিক দুঃখই আপনি পাচ্ছেন। প্রতি শব্দের মধ্য থেকে কি করুণ কান্নার সুরই ধ্বনিতে হচ্ছে। চিরদিন আমায় অকপটভাবে স্নেহ করে এসেছেন, তার প্রতিদানে কোন্ আনন্দ ত দিতে পারিনি, বরং তার পরিবর্ত্তে নিদারুণ দুঃখই পাচ্ছেন। আমার নিজের জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু আপনারা আজ যে অসহনীয় দুঃখ পাচ্ছেন সে কথা ভেবে আমার মনও যে বিচলিত হচ্ছে। আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিনা। তবে এই কথা বললে বোধ হয় কিছু শান্তি পাবেন যে Judgement যাই হোক তজ্জন্য আমার মনে কোন চিন্তা কিংবা দুঃখ নেই। আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একথা লিখছিনা—এ আমার প্রাণের sincere অভিব্যক্তি। আমি কেমন আছি জানবার জন্য আপনাদের ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। আমার শরীর মন দুইই বেশ ভাল। যখন জেলে এসেছিলাম তার চেয়ে শরীরের ওজন এখন বেড়েছে। মনের অবস্থাও বেশ ভাল আছে। যখন জেলে এসেছিলাম তখন প্রথম প্রথম সারাদিন

একা থাকতে একটু কষ্ট হত। কিন্তু মানুষের মন একা কিছুতেই থাকতে চায়না—সে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নেবেই। আমার মনও ২।৪ দিনের মধ্যেই প্রকৃতির মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নিল। সেই সঙ্গী হচ্ছে Two trees, sky and the moon. আমার ঘরের সামনেই দুটো গাছ দেখা যায়। রোজ ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে সামনের অশ্বথ গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে কত research-ই করতাম। অশ্বথ গাছটার সব পাতাগুলো তখন ঝরে গিয়েছিল, একটু একটু করে নূতন পাতার অঙ্কুর একটু একটু করে পাতাগুলোর বৃদ্ধি। কোমল পাতাগুলোর কোমল রঙ, ক্রমে রঙ বদলে গিয়ে গাঢ় সবুজ রং, বাতাসে পাতাগুলোর নৃত্য—minutely দেখতাম আর এই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ভাবতাম। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাছটির বৃদ্ধ জীর্ণ পাতাগুলোর সঙ্গে অশ্বথ গাছের পাতাগুলোর তুলনা করতাম। এই দেখে দেখে সকালবেলা অনেকক্ষণ কেটে যেত। নীল আকাশে পাখীগুলো কেমন আনন্দে উড়ে-বেড়াচ্ছে দেখে আমিও খুব আনন্দ পেতাম। সন্ধ্যার সময় নির্মল আকাশে চাঁদের দিকে দেখে দেখে খুবই ভাল লাগত যতক্ষণ চাঁদ দেখা যায় ততক্ষণ দেখতাম। যেদিন চাঁদ দেখা যেতনা সেদিন তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতাম। এভাবে পনের দিন কেটে গেল। তখন আপনার প্রেরিত তিনখানা বই -গীতা, মহাভারত এবং চয়নিকা পেলাম। আমার most favourite এই তিনখানা বই তখন আমার additional সঙ্গী হল। প্রকৃতির জিনিষগুলি থেকে এবং এই তিনটি বই থেকে নূতন, মনের খোরাক সংগ্রহ করে মনটাকে ভরিয়ে রাখলাম। সন্ধ্যার সময় খুব আস্তে আস্তে ভগবদ্বিষয়ক ৩।৪টি স্তোত্র পাঠ করে প্রার্থনা করে মনটাকে ভগবানের প্রতি সমর্পিত করতে চেষ্টা করি। এভাবে আমার দিন বেশ ভাল-ভাবেই কেটে যাচ্ছে। যা লিখলাম এর ভিতর একটুও অতিরঞ্জন নেই বরং অনেক কমই লিখা হয়েছে। জেলের ভিতর আমার

শরীর মন ভাল নেই এই মনে করে আপনারা অনর্থক আমার জন্য চিন্তিত হতে পারেন এইজন্যই আমি কেমন আছি; আমার দিন কেমন কাটছে তার একটু সামান্য বর্ণনা দিলাম—খুব সত্য বর্ণনাই দিলাম এই আশায় যে আমার শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতার কথা জেনে আপনি একটু শান্তি পাবেন। দাদা, আমার জন্য কোন চিন্তা করে লাভ নেই। ভগবানের হাতে আমায় দিয়ে দিন্। তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। বৌদি, মেজদি এবং অন্যান্য সবাইকে সান্ত্বনা দেবেন। আপনার শরীর একে'ত খুবই খারাপ তার উপর আবার আমার জন্য চিন্তা করে করে শরীরের অবস্থা এখন কিরূপ হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি। শরীরের প্রতি একটু দৃষ্টি দেবেন এই আমার অনুরোধ। বৌদির শরীরও খুব খারাপ, তার শরীরের জন্য যত্ন নিতে বলবেন। আপনারা শরীরের জন্য মোটেই যত্ন নেন্না এতে আমার দুঃখ হয়। দাদা, আর বিশেষ কিছু আজ লিখব না। আপনার অগাধ স্নেহের স্মৃতি আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই স্মৃতি আমার প্রাণের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। গুরুজনগণকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। কুশলাদি জানিয়ে সুখী করবেন।

ইতি, আপনার স্নেহের সূর্য

8 8. 33

স্নেহময়ী বৌদি,

আমার ভক্তি প্রণতি গ্রহণ করুন। আপনার ২৮শে জুলাই তারিখের চিঠিখানা গত ৫ই আগষ্ট তারিখে পেয়েছি। আপনারা আমার জন্য খুবই চিন্তিত আছেন এবং খুবই দুঃখ পাচ্ছেন সবই বুঝি কিন্তু কি লিখে যে আপনাদের সান্ত্বনা দেব তা কিছুতেই

বুঝতে পাচ্ছিনা। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমি কিছুতেই খুঁজে পাইনা। এ সময় উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে আপনাদিগকে শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। দাদার ২৮শে তারিখের চিঠিখানাও একসঙ্গে পেয়েছি। দাদার চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে আমার প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহের পরিচয়ই পেয়েছি। অতি মর্ম্মান্তিক শোকের চিত্রই চিঠিখানিতে ফুটে উঠেছে। আপনারা সবাই আমায় এত গভীরভাবে স্নেহ করেন অথচ এই অকপট স্নেহের প্রতিদানে আপনাদিগকে যে আমি কিছু দিতে পারি নাই বরং চিরদিন দুঃখই দিয়ে এসেছি, আজ এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে। দাদা, মেজদি, কমল, অজিত, বাদল, প্রভৃতি সবাইর কাছে কয়েক লাইন করে চিঠি আপনার এই চিঠিব সঙ্গে একই খামের মধ্যে লিখে পাঠাচ্ছি, যার যার চিঠি তাকে তাকে দেবেন। আমার মোকদ্দমার Judgement খুব সম্ভবতঃ ২।৩ দিনের মধ্যে দেবে। ফল কি হবে তার একটা মোটামুটি ধারণা বহুদিন আগেই করে রেখেছি এবং ভাল মন্দ সব কিছুব জন্য মনটাকে তৈরী করে নিয়েছি। বৌদি, আপনাকে বিশেষ কিছু বুঝাবার চেষ্টা করব না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি মানুষ কি অমব থাকে? যদি আপনাদের মধ্যে আমাকে আর ফিরে নাও পান, তাতেও দুঃখ কি? আমি তো হাজার চেষ্টা করলেও কিছুতেই চিরদিন আপনাদের মধ্যে থাক্‌তে পারতাম না। ভগবান যে কাউকে মর্ত্ত্যের মাটিতে চিরদিন থাকৃতে দেন না। ভগবানের বিধানের কথা উপলব্ধি করে আপনারা মনকে শান্ত করে ফেলুন—অনর্থক ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় যে কোন লাভ নেই। ভগবানের প্রত্যেক বিধানের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে এই কথাটা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবেন। কত কথাই আজ মনে আসছে, কত কথাই লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু লিখতে পারছি কৈ? আমার নিজের জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। আমার জন্য আপনারা দুঃখ পাচ্ছেন এই চিন্তাই আমায় দুঃখ দিচ্ছে।

যদি আপনাদের মধ্যে আর ফিরে না যাই তবে এই কথা মনে রাখবেন আপনাদের স্নেহের স্মৃতি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকবে। আর বিশেষ কিছু লিখব না। গুরুজনকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। মেজদিকে সান্ত্বনা দিবেন। বাড়ীর যারা লিখতে জানে তাদের প্রত্যেকের একটু একটু চিঠি যদি পারেন আপনার চিঠির সঙ্গে একই খামের মধ্যে পাঠাবেন। আমি ভালই আছি। আপনারা কেমন আছেন জানাবেন।

ইতি, আপনার স্নেহের সূর্য

8. 8. 33

শ্রীচরণকমলেষু,

স্নেহময়ী মেজদি, আমার ভক্তি প্রণতি গ্রহণ কর। তোমার কাছে প্রায় একমাস দেড়মাস আগে বাড়ীর ঠিকানায় একখানা চিঠি দিয়েছিলাম—পেয়েছ কিনা জানিনা। তোমার কাছ থেকে সে চিঠির কোন উত্তর পাইনি। এই চিঠিখানির জবাব দিও। বৌদির চিঠির থেকে প্রায়ই জানতে পাই যে তুমি আমার জন্য চিন্তা করে করে ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে উঠেছ। এ সময়ে তোমায় কি বলে যে সান্ত্বনা দেব জানিনা। তোমার হৃদয় যে আমার প্রতি স্নেহে ভরা। এত গভীর, অকৃত্রিম স্নেহ যেখানে সেখানে যে সান্ত্বনা বাক্যে কোন ফল হবেনা তা জানি। মেজদি, স্নেহময়ী মেজদি আমার, কেন আমায় এত স্নেহ করেছিলে? কেন আমার মত এমন অপাত্রে তোমার সমস্ত স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলে? যদি আমায় এত স্নেহ না করতে তা হলে তো আজ এত মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেতেনা। মেজদি, ভগবানের উপর কি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারনা? ভগবান মঙ্গলময় একথা কি বিশ্বাস করতে

পারনা? যদি পার তবে আমার জন্য কোন দুঃখ পেওনা। ভগবান আমার জন্য যা বিধান করেন তা তোমাদের মনপুতঃ না হলেও তাই মঙ্গলবিধান বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো। তাহলে শান্তি পাবে। মেজদি, অস্থির হয়োনা। মনকে শান্ত করে ফেলতে চেষ্টা কর। তুমি আমায় এত স্নেহ করেছ কিন্তু আমি তার প্রতিদানে তোমায় একটুও আনন্দ দিইনি কেবল চিরদিন দুঃখই দিলাম একথাই আজ বার বার মনে হচ্ছে। যাক, আমি ভাল আছি, আমার জন্য কোন চিন্তা করোনা। বার বার তোমায় অনুরোধ করছি মনকে শান্ত করে ফেলতে চেষ্টা কর। অনর্থক চিন্তা করে যে কোন লাভ নেই। গুরুজনকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিও। তোমাদের সকলের কুশলাদি জানাইও।

ইতি, তোমার স্নেহের সূর্য

8. 8. 33

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের কমল, তোর চিঠি পাইনি আজ অনেক দিন। বৌদির চিঠিতে জানলাম তোর নাকি শরীর ভাল নয়। এখন কেমন আছিস্ জানাবি। আমার case-এর Judgement বোধ হয় ২।৩ দিনের মধ্যে দেবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিস না। শরীরের জন্য যত্ন নিস্। গুরুজনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিস্।

ইতি, শুভাকাঙ্ক্ষী তোর মেজদা শ্রীসূর্য কুমার সেন

8. 9. 33

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। মেজদি, বৌদি এবং অন্যান্য গুরুজনদের আমার ভক্তি প্রণতি জানাইবেন। কমল, অজিত, বাদল এবং অন্যান্য ছোটসকলকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। আপনাদের সকলের কুশলাদি জানিয়ে আমার চিন্তা দূর করবেন। আজ অনেকদিন যাবত আপনাদের কোন চিঠি পাইনি। আমার conviction এর কয়েক দিন আগে আপনার একখানা পোষ্টকার্ড এবং সঙ্গে বৌদির একখানা পোষ্টকার্ড পেয়েছিলাম। তার ২।৪ দিন পরে বাড়ী থেকে অজিত ও রাণীর লিখিত একখানা পোষ্টকার্ড পেয়েছিলাম। এর পর আর কোন চিঠিই পাইনি। আমি গত ৮।৮ তারিখে খামে একখানা চিঠি বৌদির কাছে দিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে আপনি, মেজদি, কমল, অজিত, রাণী, বাদল প্রত্যেকের কাছেই কয়েক লাইন করে লিখেছিলাম। তারপর গত ২৩।৮ তারিখে খামে বৌদির কাছে আর একখানা চিঠি লিখেছি। এর কোন চিঠির জবাব পাইনি। চিঠিগুলি আপনারা পেয়েছেন কি না জানিনা।

দাদা, আমার কাছে চিঠি লিখতে বসলে আপনাদের কান্না আসে তা বুঝি। কিন্তু আপনাদের চিঠি পেলে যে আমি খুব আনন্দ পাই। তাই আপনাদের কাছে বারবার লিখি আমার কাছে ঘন ঘন লিখার জন্য। আমার জন্য আপনারা অসহনীয় দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু কি লিখে যে আপনাদিগকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাইনা। দাদা, আমার এখন যা বয়স এই বয়সেই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তবে এই বয়সে যদি আমাকেও বাবার মত দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয় তাতে বিশেষ দুঃখের কারণ তো কিছুই খুঁজে পাইনা। তবে বাবা ব্যারামে মারা গিয়েছিলেন আর আমি না হয় অন্যভাবে মারা যাব। এইমাত্র তফাৎ। কিন্তু আসল জিনিষটাতে অর্থাৎ মৃত্যুটাতে তো কোন তফাৎ নেই। মানুষ

কতজন কতভাবেই মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যারামে মরাটাই যে বিশেষ লোভনীয় তার তো কোন মানে নেই। মানুষ তো অমর হয়ে সংসারে আসেনা। তাকে যে একদিন না একদিন যেতেই হবে। তবে এই inevitable জিনিষের জন্য দুঃখ করে লাভ কি? ভগবানের কাছ থেকে এসেছি আবার তার আনন্দময় ক্রোড়ে ফিরে যাব এতে দুঃখ নেই বরং আনন্দ আছে। এই আনন্দটুকু realise করতে পারেনা বলেই মানুষ দুঃখ পায়। যাক্ আপনাদের বুঝাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বই আর কিছু নয়। এই ধৃষ্টতার জন্য আমায় ক্ষমা কববেন। মেজদি এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা দেবেন।

আমি ভালই আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। ভগবানকে realise করার চেষ্টা করে করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি আর আনন্দ পাচ্ছি। আমার কাছে ঘন ঘন চিঠি লিখবেন। বৌদিকে লিখতে বলবেন। আপনাদের শরীরের জন্য যত্ন নেবেন। আপনাদের চিঠি পেলে বেশ ভাল লাগে। শীগ্‌গির চিঠির উত্তর দেবেন। আপনারা পুজার ছুটিতে কবে বাড়ী যাবেন জানাবেন।

ইতি, আপনাব স্নেহের সূর্য কুমার সেন

22. 9. 33

স্নেহময়ী মেজদি,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখেব চিঠি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে খামের মধ্যে অজিত রাণী এবং দুই বৌমার চিঠিও পেয়েছি। তোমার দুঃখের কাহিনী লিখেছ। তুমি না লিখলেও তোমার দুঃখের কথা আমার রোজই মনে পড়ে। মার স্নেহ আদর পেয়েছিলাম। মার পরেই তোমার স্থান। মায়ের

মতন স্নেহই তোমার কাছ থেকে চিরদিন পেয়ে এসেছি। পুত্রকন্যা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শান্তি পাবার আশায় আমাদের বাড়ীতে আমাদের কাছেই চলে এসেছিলে এবং হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে দিয়ে আমাদিগকে ভরিয়ে রেখেছিলে। কিন্তু মেজদি, স্নেহময়ী মেজদি আমার, আমি যে তোমায় এতটুকু শান্তিও কোনদিন দিতে পারিনি। কেবল দুঃখই দিয়ে এসেছি, আজও কেবল মর্ম্মান্তিত দুঃখই দিচ্ছি। সেজন্য কোন দুঃখ করোনা। আমার ভগবান আমায় যেভাবে তার কাছে ·· যেন প্রাণভরা আনন্দ দিয়ে আমি যেতে পারি এই আশীর্ব্বাদ আমায় করো। ভগবানের কাছে এই কামনাই আমি রোজ করি। তিনি আমার জন্য যে বিধানই করেন তাই যেন আনন্দভবে মাথা পেতে বরণ করে নিতে পারি। এর চেয়ে বড় কামনা যে আর আমার কিছুই নাই। তুমিও আমায় এই আশীর্ব্বাদই করো।

আজ কদিন ধরে পূজার কথা কেবলই মনে হচ্ছে। বাড়ীতে পূজা হচ্ছে কি না জানিনা কিন্তু পূজার স্মৃতি আমার মনকে ভরিয়ে রেখেছে। পূজার কথা যে বাঙালীর মনে, এ এসে পারেনা। শরতের আকাশ বাতাস যে বাঙালীকে মায়ের আগমনীর শুভসংবাদটুকু দিয়ে দেয়। আনন্দময়ী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ আমার হবেনা। আমি এখান থেকে চিন্ময়ী মায়ের চরণে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলিটুকু অর্পণ করে আমার মনের বাসনা দূর করবো।

আমি ভালই আছি। তোমাদের সকলের কুশল জানিয়ে চিঠি লিখো। গুরুজনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিও। তোমার এই চিঠির সঙ্গে একই খামের মধ্যে অজিত, রাণী, বৌদি, পুষ্প, লিলির কাছেও কয়েক লাইন করে লিখলাম। তোমরা আমার জন্য কোন চিন্তা করো না, ভগবানেরউপর নির্ভর করতে চেষ্টা করো।

ইতি, তোমার স্নেহের সূর্য

পুনঃ—মেজদি, চিঠির মধ্যে আমার জন্য শ্রীশ্রীদুর্গামায়ের আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দিও।

8. 10. 33

স্নেহময়ী বৌদি,

আমার বিজয়ার ভক্তিপ্রণতি গ্রহণ করুন। আপনার ২৪শে তারিখের খামের চিঠিখানি আজ ৩।৪ দিন হল পেয়েছি। চিঠি পড়ে জানলাম আজ অনেকদিন যাবত আমাব কোন চিঠি আপনারা পান নাই। আমি আমার শাস্তি হওয়াব পর আজকের এই চিঠি ছাড়া তিনখানি চিঠি আপনাদের কাছে লিখেছি। শাস্তি হওয়ার ৬/৭ দিন পরে আপনার নামে শহরের ঠিকানায় একখানা, ৫ই সেপ্টেম্বর দাদার নামে শহরেব ঠিকানায় একখানা, ২৩শে সেপ্টেম্বব বাড়ীর ঠিকানায় মেজদির নামে একখানা চিঠি দিয়েছি। মেজদির চিঠিব সেজদি, আপনি, রাণী, পুষ্প, লিলি, অজিত, এই কয়জনের কাছেই কয়েক লাইন করে লিখেছিলাম। আমাব ঐ তিনখানা চিঠি পেয়েছেন কিনা জানাবেন। আপনার চিঠি পড়ে মনে হল ৫ই সেপ্টেম্বরের চিঠি আপনারা পান নাই। ২২শে সেপ্টেম্বরের চিঠি এতদিনে পেয়েছেন কিনা জানিনা। কোন্ কোন্ তাবিখের চিঠি আপনারা পেয়েছেন পরিষ্কার করে লিখবেন। আপনাব চিঠি পড়ে বুঝলাম আপনাবা আমার শাস্তি হওয়ার পব আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিসহ পাঁচখানা চিঠি আমাব কাছে লিখেছেন, তাব মধ্যে আমি মাত্র দুইখানা চিঠি পেয়েছি, তিনখানা চিঠিই পাইনি। বাড়ী থেকে মেজদি, অজিত, রাণী, পুষ্প, লিলি, একসঙ্গে এক খামেব মধ্যে যে চিঠিখানা দিয়েছিল সেই চিঠিখানা এবং তারপর আপনাব পূজার আগের ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিখানা এই দুখানা চিঠি মাত্র আমি পেয়েছি। মাঝখানে তিনখানা চিঠিই না পাওয়ার কোন কারণ বুঝতে পারছি না। আর আমার ৫ই সেপ্টেম্বরের চিঠিখানা পেলেন না কেন তাও বুঝতে পারলাম না। আপনাব চিঠি পড়ে বুঝলাম অনেকদিন আমার চিঠি না পেয়ে আপনারা খুবই অস্থির হয়েছেন। কিন্তু কি করবো। যে কয়খানা চিঠি

লিখবার অনুমতি পেয়েছি সেই কয়খানাই লিখেছি, এর চেয়ে বেশী চিঠি লিখবার অনুমতি যে পাইনা। আর যে কয়খানা লিখেছি তাও তো সব আপনারা পান নাই এবং আপনারা যা লিখেছেন তার অধিকাংশই আমি পাইনি। যাক্ আপনারা আমার চিঠি না পেলে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া তার প্রতীকার প্রার্থনা করিবেন। দরখাস্ত ডাকে পাঠাইবেন। দরখাস্তে আপনারা কয়খানা চিঠি লিখে আমার জবাব পাননি, তা উল্লেখ করবেন। যাক্, আমার চিঠি অনেকদিন পর্য্যন্ত না পেয়ে আপনারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন এই জন্যই আমি কয়খানা চিঠি লিখেছি এবং আপনাদের কয়খানা চিঠি আমি পেয়েছি তা খুব পরিষ্কার করে লিখলাম।

বৌদি, আমার ২২শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আমার কাছে এতদিন চিঠি লেখেননি বলে খুব অভিমান করে আপনার কাছে আমি আপনার উপর আমি রাগ করেছি বলে লিখেছিলাম, তখন আমি জানতাম না যে এতগুলি চিঠি আপনারা আমার কাছে লিখেছেন। কারণ আমি যে তিনখানা চিঠিই পাইনি। আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠি পড়ে আমার অভাব আপনারা কি গভীরভাবে অনুভব করছেন তা বুঝতে পারলাম। আপনার চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে মর্ম্মভেদী কান্নার সুরই ফুটে উঠেছে। আমাকে আপনারা চিরদিনই গভীরভাবে স্নেহ করে এসেছেন। কিন্তু আপনাদের এই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদানে চিরদিন আপনাদিগকে দুঃখই দিলাম। আমার নিজের জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই কিন্তু আমার জন্য আপনারা যে অসহনীয় দুঃখ পাচ্ছেন তা ভেবেই আমার হৃদয় করুণ হয়ে উঠেছে। স্নেহময়ী বৌদি, আমার একান্ত অনুরোধ আমার জন্য দুঃখ করবেন না। ভগবানের উপর নির্ভর করে শান্তি পেতে চেষ্টা করুন ভগবানের উপর যদি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবেন। মেজদিকে এবং বাড়ীর আর সবাইকে

সান্ত্বনা দেবেন। দাদা ও মেজদিকে আমার বিজয়ার প্রণাম এবং কমল, অজিত, লিলি, পুষ্প, মণি, রাণী, বাদল এবং অন্যান্য ছোট সকলকে আমার বিজয়ার স্নেহাশীষ দিবেন। বাড়ীতে এবার পূজা হল কিনা জানাবেন। আমাদের বাড়ীর পূজক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদাকে (শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে) আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবেন। কমল জেল অফিস থেকে প্রভাত গ্রন্থাবলী (১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ) ৪ ভাগ এবং অনুরূপাদেবীর গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ এই পাঁচখানা বই ফেরৎ নিয়ে আপনাকে দিয়েছে কিনা জানাবেন। জেল কর্ত্তৃপক্ষ বললেন যে এই পাঁচখানা বই ফেরং নিয়ে গেছে। এখন নূতন পুরাতন কোন বই আমার জন্য পাঠাবেন না। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করবেন।

ইতি, আপনার স্নেহের শ্রীসূর্য কুমার সেন

N. B.—চিঠিতে পূজার কয়দিন চণ্ডী পড়বার জন্য লিখেছিলেন, আপনার চিঠি পূজার অনেকদিন পরেই পেয়েছি। তবুও পূজার তারিখ আন্দাজ করে চণ্ডীপাঠ করেছিলাম। চণ্ডী এবং গীতা রোজই পড়ি।

স্নেহময়ী বৌদি,

আমার ভক্তিপ্রণতি গ্রহণ করুন। আপনারা পূজার ছুটিতে বাড়ী গেছেন এই মনে করে বাড়ীর ঠিকানায় লিখছি। বৌদি, আপনার উপর আমি সত্যই রাগ করেছি। আমার কাছে এতদিন চিঠি দিচ্ছেন না কেন বলুন দেখি? আপনার কাছে দুখানা এবং দাদার কাছে একখানা চিঠি দিলাম। এই তিনখানা চিঠির একখানার জবাবও পেলাম না। আপনার এবং দাদার চিঠি পেয়েছিলাম আমার মোকদ্দমার রায় দেওয়ার কয়েকদিন আগে। তারপর এই প্রায়

দেড়মাসের মধ্যে আপনার অথবা দাদার একখানা চিঠিও পাইনি। কমলের সঙ্গে গত ৬ই সেপ্টেম্বর দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল ………৬ই সেপ্টেম্বরের ৪।৫ দিন আগে একখানা চিঠি দিয়েছে ………আমি পাইনি। না পাওয়ার কারণ কিছুই বুঝলাম না। যাক্, আমার কাছে আপনারা শীগ্‌গির চিঠি দেবেন। আমার চিঠি লিখবার দিন হয়ত ফুরিয়ে আসছে। বাস্তবিকই যদি দিন ফুরিয়ে যায় তখন তো আর আপনাকে চিঠি লিখবার জন্য সাধব না। কাজেই সময় থাকতে থাকতেই ঘন ঘন চিঠি লিখবেন। তা না হলে আমি রাগ করব। আমার এ পারের যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে বলে আপনাদের উপর রাগ করবার, অভিমান করবার, আবদার করবার অধিকারটুকুও কি আমার নেই? নিশ্চয়ই আছে। বাড়ীতে পূজা হল কিনা জানাবেন। আমার নামে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন।

আমি ভালই আছি। সময় ভালভাবেই কেটে যাচ্ছে। এখন আমার একমাত্র কাজ ভগবানের বিধান আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেওয়ার জন্য নিজেকে তৈয়ের করা। সেই চেষ্টাই করছি। আমার এ পারের পথচলা হয়ত শেষ হয়ে এল, পার হওয়ার আশায় ঘাটে এসে বসে আছি; তারপর ওপারের পথচলা সুরু হবে। এরই জন্য নিজেকে তৈরী করছি।

“দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।”

দাদা এবং অন্যান্য গুরুজনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার স্নেহাশীষ জানাবেন। আপনার এবং বাটীস্থ সকলের শরীর

কেমন আছে জানাবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের সূর্য

পুনঃ—আপনাদের সকলের সঙ্গেই একবার দেখা করবার ইচ্ছা হচ্ছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করবেন।

8th. Nov, 1933

স্নেহময়ী বৌদি,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিন্। আপনারা বাড়ী থেকে গত ৪ঠা অক্টোবর যে চিঠি লিখেছিলেন তারপর এ যাবৎ বাড়ী থেকে অথবা শহর থেকে আপনাদের কারও কোন চিঠি পাইনি। আমি অক্টোবর মাসে আপনাদেব কাছে বাড়ীর ঠিকানায় দুইখানা চিঠি লিখেছি, পেয়েছেন কিনা জানিনা। দাদা, মেজদি এবং অন্যান্য গুরুজনগণকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবেন। কমল, অজিত, গোপাল, মণি, রাণী, বাদল এবং অন্যান্য ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। বৌমাদিগকে আমার স্নেহাশীষ জানাবেন।

বৌদি, আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমার শরীর মন বেশ ভালই আছে, দিন ভালভাবেই কেটে যাচ্ছে। খুব ভোরে উঠে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এবং মনে মনে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত অথবা স্তোত্র পাঠ করি। সকাল বেলায় চণ্ডী ও গীতাপাঠেই কেটে যায়, দুপুরবেলা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে মহাভারত পড়ি। আমি জেলে আসার পর থেকে এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মহাভারত তিনবার শেষ করেছি, এখন চতুর্থবার পড়ছি। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে আমার ঘরটার মধ্যে ঘণ্টাখানেক বেড়াই। সন্ধ্যার আঁধার পৃথিবীতে নেমে আসবার আগেই সন্ধ্যা তারাটি আকাশে দেখা দেয়। রোজ এই গোধূলির তারাটির দিকে চেয়ে থাকি। প্রথম যখন তারাটি ওঠে তখন খুব ছোট বলেই মনে হয়। ধীরে ধীরে

অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারাটি যেন বড় হতে থাকে এবং খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তারাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কোন অসীমের মাঝে ডুবে যাই জানিনা। তারাটির দিকে চেয়ে চেয়ে কিভাবি কিছুই জানিনা কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেন আমি অসীমের সাড়া পাই, তার মধ্যে যেন ভগবানের অস্তিত্বের আভাষ পাই। অনেকক্ষণ তারাটি দেখার পর প্রার্থনা করতে বসি এবং প্রার্থনার শেষে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত মনে মনে আবৃত্তি করে আমার প্রার্থনা শেষ করি। রাত্রে যখন অনন্ত নীলাকাশ চাঁদের আলোয় আলোয় ভরে যায় তখন তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং ভগবানের অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টির মহিমা উলপব্ধি করতে করতে মন আনন্দে ভরে উঠে। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীল আকাশে যখন চাঁদের আলো থাকেনা—তখনও তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই। এসব দেখতে দেখতে কত সুন্দর সুন্দর ভাবই মনে আসে এবং কত বড় কবির লেখা সুন্দর সুন্দর লাইনগুলি মনে পড়ে। বাস্তবিক বৌদি অনন্ত আকাশ, অকূল সমুদ্র প্রভৃতি অসীম জিনিষের দিকে একদৃষ্টে এক মনে তাকালে এ সকল সুন্দর সুন্দর জিনিষের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই আদিহীন, অন্তঃহীন পরমপিতা পরমেশ্বরের কথাই মনে পড়ে। আমার দিন কেমন কাটছে তার আভাষ দিলাম, এ থেকে বুঝতে পাবেন আমি কেমন আছি। আমার মনে কোন দুঃখ নেই, কোন গ্লানি নেই। ভগবানের বিধান হাসিমুখে মাথা পেতে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছি। জেলের মধ্যে প্রায় নয়মাস আছি। এ সময়টুকু কেবল ভগবান মঙ্গলময়—এ কথাটুকু উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেই কাটিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাই বলছি আমার জন্য আপনারা কোন চিন্তা অথবা দুঃখ করবেন না।

আমার কাছে চণ্ডী, গীতা ও মহাভারত এই তিনখানা বই আছে। চয়নিকাখানা অনেকদিন পর্য্যন্ত জেল অফিসে রয়েছে।

কমলকে বলবেন চয়নিকাটি ফেরৎ নিয়ে যেতে। আর ইতিমধ্যে যদি অন্য কোন বই কমল জেল অফিসে দিয়ে যায় সেগুলিও ফেরৎ নিয়ে যেতে বলবেন। আপনার বাটীস্থ সকল কেমন আছেন জানাবেন।

ইতি, আপনার স্নেহের সেজমহাশয়
শ্রীসূর্য কুমার সেন

স্নেহের অজিত,

আমার স্নেহাশীষ নে। তোর কাছে অনেকদিন লিখিনি। এ পৃথিবীর আলো নিভে গিয়ে চির অন্ধকার আমার চোখের উপর নেমে আসবার সময় হল। কোন দুঃখ করিস না। ভগবানের বিধান কখনই অমঙ্গলের জন্য হয়না। আজ যাবার বেলা তোদের সকলের কথা মনে পড়ছে। দাদা, মেজদি, বৌদি, কমল, তুই, গোপাল, মণি, রাণী এই সবাইর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিলাম, কোন উত্তর পাইনি। তোরা দরখাস্ত করেছিস কিনা জানিনা। দরখাস্ত তোদেরই করা উচিত। যাক্ সময় একেবারে কাছিয়ে এল। তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা ভগবান জানেন। যদি দেখা না হয় দুঃখ করিস না। ভগবান আমার জন্য যে বিধান করেছেন তা মাথা পেতে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। গুরুজনকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ জানাস্। সবাইকে সান্ত্বনা দিস্। আমার জন্য কেহ যেন দুঃখ না করে। হয়ত এই আমার শেষ চিঠি। বিদায়বেলায় তোকে আমার আন্তরিক আশীষ জানিয়ে যাচ্ছি।

ইতি—আশীর্ব্বাদক তোর মেজদা
শ্রীসূর্য কুমার সেন

স্নেহের অজিত,

আমার স্নেহাশীষ নে। তোর ৭ই তারিখের চিঠি পেয়েছি। এভাবে মাঝে মাঝে চিঠি দিস্। তোর এবং বাটীস্থ সকলের কুশলাদি জানিয়ে চিঠি লিখিস্। কমলকে বলিস্ উকীল রজনীবাবুর সঙ্গে একত্র হয়ে তাকে যেন বলে আমাদের মোকর্দ্দমার রায়ের নকল শীগ্‌গির আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। রজনীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি রায়ের নকল শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত পাঠালেন না কেন কিছু বুঝতে পারলাম না। রায়ের নকল তাঁর কাছে আছে। শীগ্‌গিব যেন নকলটি রজনীবাবু আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। রায়েব নকল না পড়লে আপীলের ground কি করে তৈয়ের করব এবং উকীলকে ঐ বিষয়ে instruction-ই বা কি করে দেবো? বাড়ীতে পূজো হচ্ছে কিনা জানাইও। আর বিশেষ কি লিখব। আমি ভাল আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করো না। কমলকে বলো জলধর গ্রন্থাবলী অথবা অনুরূপাদেবীর গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ ছাড়া অন্যান্য ভাগ) আমার জন্য জেল অফিসে যদি পাবে দিয়ে যেতে। নূতন বই ছাড়া দিন কাটাতে একটু কষ্ট হয়। যদি নূতন বই দিয়ে যায় তা'হলে প্রভাত গ্রন্থাবলী ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ ভাগ এবং অনুরূপাদেবীর গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ অফিস থেকে যেন নিয়ে যায়। আর যদি নূতন বই দিতে না পারে তা'হলে প্রভাত গ্রন্থাবলী এবং অনুরূপাদেবীর গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ যেন অফিস থেকে ফেরত না নেয়। নূতন বই না এলে পুরানোগুলোই আবার পড়বো।

ইতি—আশীর্ব্বাদক তোমার মেজদা

শ্রীসূর্য কুমার সেন

28. 11. 33

শ্রীচরণকমলেষু,

স্নেহময়ী মেজদি, আমার ভক্তিপ্রণতি জেনো। গত ২৩শে তারিখে দাদার চিঠির সঙ্গে তোমার কাছেও ২।৪ লাইন লিখেছি। আমার পথচলা শেষ হয়ে এল। তোমাদের স্নেহের বন্ধন ছেড়ে ভগবানের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে আমি চলেছি। ভগবান আজ আমায় ডেকেছেন; এভাবে তিনি সবাইকে নিজের কাছে ডেকে নেন। কারও ডাক ত্বদিন আগে আসে, কারও ডাক ত্বদিন পিছে আসে—এই মাত্র তফাৎ। ভগবান শুধু সৃষ্টির কর্তা নন, তিনি ধ্বংসেরও দেবতা। ব্রহ্মরূপে তিনি সৃজন করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি পালন করেন এবং শিবরূপে তিনিই আবার ধ্বংস করেন। এই বিশ্বরাজ্য তাঁর—এই লীলা বই আর কিছু নয়। সংসার পারাবারের তীরে বসে আমাদের নিয়ে তিনি খেলছেন—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন বালির ঘর বেঁধে তার ভিতর পুতুল সাজায়, কত ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দেয়, বাজনা বাজায়, ফূর্তি করে আবার কিছুক্ষণ পরে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে ঘরে চলে যায়। আমরা ভগবানের হাতের ক্রীড়ক মাত্র। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমাদের কিছু করার জো নেই। এতকাল তাঁর ইচ্ছায় চলেছি, আবার তাঁর ইচ্ছায় তাঁর কাছে, ফিরে যাচ্ছি। যা' অবশ্যম্ভাবী, মানুষ জীবজন্তু সবেরই যা' শেষ পরিণাম তার জন্য ত্বঃখ করা শোক করা কখনই উচিত নয়,। মেজদি, মরণ জিনিষটাকে মানুষ খুব ভয়ানক জিনিস বলে মনে করে। এজন্যই মানুষ ত্বঃখ পায়। কিন্তু যে জিনিষটাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না, যে জিনিষটাকে প্রত্যেক মানুষকে একদিন না একদিন আলিঙ্গন করতেই হবে তাকে ভয় করে লাভ কি? তাকে বন্ধুভাবে প্রিয়জনের মত বরণ করে নিতে পারলেই মানুষ শান্তি পায়। কবি লিখেছেন—'জীবন শুধু চেয়ে থাকা, মরণ তাঁরে বুকে পাওয়া।' বাস্তবিক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে

যদি আমার প্রিয়তম দেবতাকে পেতে পারি তবে মরণ আমার পক্ষে লোভনীয় হবে না কেন? ভগবানের ইচ্ছার উপর নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়েছি।

মেজদি, তোমাকে বোঝাবার জন্য এতকথা লিখলাম। আমার কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করো। আমার জন্য কোন দুঃখ করো না। গুরুজনকে প্রণাম ও ছোট-সকলকে আমার আশীষ দিও।

ইতি—তোমার অতি আদরের সূর্য

2. 12. 33

পরম কল্যানীয়বরেষু,

স্নেহের কমল, আমার স্নেহাশীষ নাও। তোমার কাছে খুব কম চিঠিই লিখেছি। যাবার দিন একেবারেই কাছিয়ে এল। কখন কোন্ মুহূর্তে এই জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হয় কিছুই স্থিরতা নেই। তাই শেষ সময়ে তোমার কাছে লিখতে বসলাম। জানিনা আর চিঠি লিখবার সময় হবে কি না। স্নেহের ভাইটি, আমার জন্য দুঃখ করো না। আমার জন্য তুমি যথেষ্ট করেছ, সাধ্যের অতিরিক্ত করেছ। তোমাদের এত অভাব সত্ত্বেও Mr. B. C. Chattrejee-র মত খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার দিয়ে আমার case চালিয়েছ, চাটগাঁয়ও খুব ভাল Lawyer দিয়েই case চালিয়েছ। এর চেয়ে বেশী আর কি করবে? এতেই তোমাদের খুব সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আর দুঃখ কিসের জন্য? আমার জীবন রক্ষা করতে পারলে না এজন্য? মানুষ হাজার চেষ্টা করেও কি মানুষকে অমর করতে পারে? জগতে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ সকল জীবের যা' অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মানুষের কি সাধ্য তার ব্যতিক্রম

ঘটায়। মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা অথচ অন্যের মৃত্যুতে শোক করে। মায়া স্নেহের বন্ধনই মানুষকে এমন অজ্ঞান করে রাখে। যাকে কিছুতেই এড়ানো যাবেনা তাকে ভয় না করে, তার জন্য চিন্তিত না হয়ে তাকে প্রিয়জনের মত আলিঙ্গন করবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই প্রত্যেক মানুষের উচিত। দার্শনিক এবং কবিরা মরণ জিনিসটাকে কত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—"মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।" কবি বলছেন,—'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।' মানুষ এত সুন্দর লেখা পড়েও কি উপলব্ধি করতে পারে না বলেই মৃত্যুকে ভয়ের জিনিস বলে মনে করে? অতি সহজে বুঝতে গেলে আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষের যে জিনিসটাকে নিতেই হবে সেই জিনিসটাকে ভয়ংকর জিনিস মনে করে ভয়ে ভয়ে গ্রহণ না করে বন্ধুর মতন আনন্দের সহিত বরণ করে নেওয়া উচিত। তোমাদিগকে আর বেশী কি বুঝাব। চেষ্টা করলে চিন্তা করলে নিজেই সব বুঝে শান্তি পাবে। ভগবান আমার জন্য যা' দিয়েছেন তা' আমি তাঁর আশীর্ব্বাদ বলে বরণ করে নিচ্ছি। মেজদিকে এবং আর সবাইকে সান্ত্বনা দিও। মেজদি আমার জন্য খুবই অস্থির হয়েছেন, তাঁকে একটু বুঝিও। দাদা, মেজদি, বৌদি এবং অন্যান্য গুরুজনদের আমার ভক্তিপ্রণতি দিও। অজিত, গোপাল, মণি, রাণী, বাদল, বৌমারা এবং অন্যান্য ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিও। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইও।

ইতি—আশীর্ব্বাদক তোমার মেজদা

শ্রীসূর্য কুমার সেন

দীর্ঘ এগারো মাস চট্টগ্রাম জেলের বিশেষ সুরক্ষিত অবরোধের মধ্যে অতিবাহিত হয়। চিঠিগুলো তাঁর এই সময়েই লেখা। স্থানাভাবে অনেক চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না।

সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে এই চিঠিগুলোতে এমন কিছু পাওয়া যাবে না। যা' দিয়ে এই মহান বিপ্লবীর চরিত্রের বিরাটত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এ'তে প্রতিফলিত হয়েছে মাস্টারদার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাস এবং সার্বজনীন ভালবাসা, যা' তাঁর মনকে পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধনের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে।

দাদা এবং বৌদির প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীদের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ, পরিবার ও পরিজনের প্রতি তাঁর অশেষ মমতা—চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে বাঁধা আছে। এত মমতাশীল মানুষটি কি করে ঘর ছেড়ে বঞ্ঝাসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে। আসলে তিনি পরিজনদের ভালবাসতেন বলেই দেশের আপামর লোককে ভালবাসতে পেরেছিলেন। পরিজন ও প্রতিবেশী যে অভিন্ন।

চিঠিগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মনের সরস অভিব্যক্তি। জীবনে হার তিনি মানেননি। জীবন ভোর তিনি চেয়েছেন "তোমার ইচ্ছাই হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে", মরণেও চেয়েছেন—সেই ইচ্ছারই জয়; মরণ তাই তাঁর কাছে 'শ্যাম সমান।'

বিসর্জনের বাঁশী বেজে উঠেছে, সময় শেষ বারের মত তাঁর মনের দুয়ারে এসে করাঘাত করেছে, পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছেন শেষবারের মত, অনুভব করে নিচ্ছেন রূপসী ধরিত্রীর রূপ, রস, গন্ধ।

উনচল্লিশ বৎসরের জীবন; যৌবন যায় যায় করেও থমকে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। সে জীবনে কত অতৃপ্ত আকাঙ্খা, কত অস্পষ্ট স্বপ্নের স্মৃতিচারণ। কত অনারব্ধ কর্মের হাতছানি আর

কৃত কর্মের হিসেব নিকেশ!

জেলের পাঁচিলের ওপারে সেলের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো নীল আকাশ দেখা যায়। হয়তো বা একবিন্দু মেঘের আনাগোনা। মহাকালের দর্পণে নিজেরই জীবনের প্রতিবিম্ব যেন! বাইরের জগতে বসন্ত আসে। গাছে গাছে নব-পল্লব সজ্জা।

পৃথিবীর প্রেমে পাগল উদাসী বিপ্লবী সূর্য্য সেন চিঠি লিখছেন—

"নীল আকাশের বিরাট চালচিত্রের নীচে কচি কচি ডাল সবুজ পাতায় ভরে গেল। আকাশ কী নীল আর পাতাগুলো কী ঘন সবুজ! মুহূর্তে জীবনের আবির্ভাব দেখছি। জীবন অনির্বাণ অমর।"

কিন্তু তাঁর নিজের জীবন? সে জীবনে তিনি শুনেছেন—One clear call:

"For 'tis from out our bourne of time and place
The flood may bear me far,
I hope to see my Pilot face to face
when I have crost the bar."

তাই তিনি চিঠিতে লিখলেন—

"এতদিন নদীকূলে
যাহা নিয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে
এবার আমারে লহ করুণা করে।"



'বন্য হিংস্র জন্তুর চাইতেও
অত্যাচারী শাসক বেশী ভয়ংকর'

—কনফুসিয়াস